তস্কর

তস্কর

ভগীরথ মিশ্র

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬১

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

পিতা, প্রয়াত

রাধাশ্যাম মিশ্রর

স্মৃতির উদ্দেশে

তস্কর

॥ এক ॥

আশ্বিনের শেষ।

গভীর নিশিরাতে বাণেশ্বর ঘোষের শোবার ঘরের জানালার পাশটিতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো গোক্ষুর ভক্তা। সারা গা ভিজে গিয়েছে ঘামে। মাথার কালো গামছাও ভিজে গিয়েছে ওষে। পায়ের হাঁটু অবধি লাল ধুলো লেপটানো। ভয়, ক্লান্তি ও উত্তেজনায় গায়ের তাবত রোম শজারুর মতো খাড়া। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়।

সাবেক আমলের দোতলা কোঠা বাড়ি। মেটাল গ্রামটির মধ্যিখানে। ব্রিটিশ আমলের টিনের ছাউনি। 'রানী মার্কা' টিন। এখনো অটুট। বাণেশ্বর ঘোষ একতলাতেই শোয়। ছেলে থাকে বউ-বাচ্চা নিয়ে দোতলায়। ছেলে বলতে, ছোট ছেলে চপলাকান্ত। বি-এ পাশ করে আজ পাঁচ বছর বেকার। বাণেশ্বর জানে, যা বিদ্যে, তাতে করে ওকে জন্মেও মাস্টারি পেতে হবে নি। কিন্তু বাণেশ্বর ঘোষ স্বয়ং ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট থাকাতে ব্যাপারটা অন্য রকম। কোন গতিকে একটি সুযোগ পাইলেই কে আটকায় ব্যাটার চাকরি! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা! শুধু একটুখানি সুযোগ। সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র। বাণেশ্বর তার মধ্যে ছুঁচ হয়্যা ঢুকিয়া ফাল হয়্যা বারিয়াবে। তল্লাটের তাবত মানুষ বিশ্বাস করে সেটা। চপলাকান্ত এখন গাঁয়ের সমবায় সমিতির ম্যানেজার। বড় ছেলে শশিকান্ত থাকে নারানগড়ে। সেখানে ঘোষেদের বিশাল ধানকুটাই কল। কাপড়ের দোকান। রেজিস্ট্রি অফিসের পাশে হলুদ রঙের দোতলা পাকা বাড়ি। বউ-ছেলে নিয়ে সেখানেই থাকে শশিকান্ত। বাপের ব্যবসাপাতি দেখাশোনা করে। একটু নিরীহ গোছের সে। ঠাকুদ্দা দুয়ারী ঘোষের রক্ত তার শরীরে কিঞ্চিত কম।

ঘরের ভেতর থেকে নাক ডাকার বিকট আওয়াজ ভেসে আসছিল। গোক্ষুর জানে, এ বাণেশ্বরের নাক। ডাকছে যেন ধানকুটাই কল। নিঝুম রাতে একনাগাড়ে শুনলে গা ছমছম করে। হাঁফাচ্ছিল গোক্ষুর ভক্তা। বুকখানা তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল খেলনা বাঁদরের মতো। মুহূর্তকাল থাড়া থেকে গোক্ষুর মৃদু স্বরে ডাক দেয়, ঘোষদা, ঘোষদা হে—।

ধানকুটাই কলখানা থেমে যায় আচমকা। কেবল ইঞ্জিন বন্ধ হবার আগে

চাকার ঘসটানি চলে আরো কিছুক্ষণ। ফোঁস-ফোঁস করে দম দেওয়া-নেওয়া করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ।

গোক্ষুর ফের ডাক পাড়ে, 'ঘোষদা— !'

'কে? কে রে?' আচমকা বিছানার ওপর তড়াক করে উঠে বসে বাণেশ্বর ঘোষ।

'চেঁচাও নি। মুই গোখরা।' চাপা গলায় বলে গোক্ষুর ভক্তা।

আবার খানিকক্ষণ ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ। একসময় মড়মড় করে কঁকিয়ে ওঠে পালঙ্ক। আগের দিনের কাঁঠাল কাঠের চিজ। নইলে বাণেশ্বরের আড়াই মণি বপুর ওজন সইতো নি। জানালা নিঃশব্দে খুলে যায়। একটা কালো বেড়াল জানলার শিক গলে টুক করে লাফিয়ে পড়ে বাইরে। ক্ষয়া-ব্যাটারির টর্চের একচিলতে ঘসা আলো এসে পড়ে গোক্ষুরের মুখের ওপর। একটু বাদে সদর দরজা খুলে যায়। গোক্ষুর ভক্তা সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে ভিতর বাগে।

দরজায় সাবধানে ছিটকিনি তুলে দেয় বাণেশ্বর। লম্ফ জ্বালে। মৃদু আলোর সুমুখে এসে দাঁড়ায় গোক্ষুর। কালো গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মোছে। হাঁটু অবধি ওষে ভেজা। পুরু লাল ধুলোর ওপর ঘাসের বীজ আর ধানের ফুল মাখানো। পায়ের পাতায় পুরু কাদার আস্তরণ। ঐ অবস্থায় মেঝের ওপর ধপ করে থাবড়ে বসে। পিঠখানা এলিয়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে। সারা মুখে সীমাহীন উৎকণ্ঠা আর অবসাদ।

দরজাটায় ভালো করে হুড়কো এঁটে দিয়ে আসে বাণেশ্বর ঘোষ। পালঙ্কের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে। হাই তুলতে তুলতে বলে, 'দেখি, কি আনছু।'

গোক্ষুর ট্যাঁকের ভেতর থেকে অতি সাবধানে বের করে আনে একটি কালো ন্যাকড়ার পুঁটলি। এগিয়ে দেয় বাণেশ্বরের দিকে।

পুঁটলিখানা হাতে নিয়েও চুপচাপ বসে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। মাথার সাদা চুলে হাত বোলাতে থাকে নিঃশব্দে। ষাট বছর বয়েস বাণেশ্বরের। গোলগাল, থলথলে শরীর। দাঁত পড়েনি একটাও। ইদানীং দীক্ষা নিয়েছে। অষ্টাঙ্গে রসকলি আঁকে। কপালে এখনো রসকলির আভাস দেখতে পাচ্ছিল গোক্ষুর। আশ্বিনের শেষ রাতে অল্প শীত পড়েছে। চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় বাণেশ্বর। কোলের ওপর ন্যাকড়ার পুঁটলিখানা বিছিয়ে ক্ষীণ টর্চের আলো ফেলে। নিকষ অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা চিজগুলো, সহসা আলোর ছোঁয়া পেয়ে নিমেষে জেগে ওঠে। যেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বাণেশ্বরের চোখের সুমুখে। বাণেশ্বরের ঘুমে ও সুগারে ফোলা চোখ দুটো জোঁকের মতো লেপটে বসে যেতে থাকে ওগুলোর গায়ে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে বুক। সামলে নেয় বহুকষ্টে। এ বড় কঠিন মুহূর্ত। এই মুহূর্তে উত্তেজনা প্রকাশ করা একেবারেই শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার। আত্মহত্যায় সামিল। পুঁটলি থেকে বহু মেহনতে চোখ দুটোকে উপড়ে তোলে বাণেশ্বর।

যথাসম্ভব নিস্পৃহ গলায় বলে, 'ব্যস্ ? এই ?'

গোক্ষুরের ঠোঁট জোড়া ঈষৎ ফাঁক হলো। একটা অসহায় গোছের হাসি হাসবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো সে। তাতে করে ওর ঠেলে ওঠা চোয়াড়ে চোয়াল দুটো টানটান হলো। বললো, 'বুড়িটা বড্ড সতর্। বড় বাস্কোটার পাশে যাবার আগেই উঠিয়া বুস্‌ল বিছ্‌নায়।'

মনে মনে ভেংচি কেটে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ ! মুখে কোনও প্রতিফলন হয় না তার। ঠাণ্ডা চোখে গোক্ষুরকে কয়েক পলক দেখে। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে দু'চোখ মুদে বসে থাকে শিব ঠাকুরের মতো। এক টুকরো কাঠের মতো নিস্পন্দ।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়ছিল গোক্ষুর। মনটা বার বার পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছিল নিজের ঘরের পানে। সেখানে যে এতক্ষণে কি ঘটছে, ভগবানকে মালুম ! এই ভাবনাটা এতক্ষণ ছিল না। কাজে-কর্মে, উত্তেজনায় চাপা ছিল মনের মধ্যে। বাণেশ্বর ঘোষের নিরাপদ আশ্রয়ে, আলোর সুমুখে নিজেকে ফিরে পেয়ে আবার ভাবনাটা ভেসে উঠলো ভুস করে। এক-রাশ আশঙ্কা লাউডগা সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে লাগলো বুক বেয়ে। বউয়ের চোখ দুটো ভেসে উঠলো সুমুখে। মরা মাছের মতো নিষ্পলক চোখ। ঐ এক জোড়া চোখ দিয়ে মেয়েটা তার শরীরের তাবত যন্ত্রণা উগরে দিতে চেয়েছে আজ সারাটা দিন। একসময় চোখদুটোও বুঝি যন্ত্রণা বইবার ক্ষমতা হারিয়েছে। তখন কেবল ফ্যাল ফ্যাল চাউনি। ফাঁকা ফাঁকা। চোখ দুটিকে ঐ অবস্থায় দেখে সন্ধ্যা-রাতে ঘর থেকে বেরিয়েছিল গোক্ষুর। হারি পিসির ওপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে। তারপর আর জানে না কিছু।

গলাটা অল্প ঝেড়ে নিয়ে গোক্ষুর বললো, 'টুকে জলদি কর, ঘোষদা। ঘরে বড় বিপদ।'

দু'চোখ কুঁচকে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ, 'বিপদ ?'

'হুঁ গো।' প্রায় কঁকিয়ে ওঠে গোক্ষুর, 'বউটার বেদ্‌না উঠছে পরশু সকাল থিকে। আছাড়িপিছাড়ি খাইথ্‌লে সন্ধ্যা-তক্ক। তারপর ত' মুই বারিয়া আইলি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো বাণেশ্বর ঘোষ। যেন আরো নিশ্চিন্ত মনেই দেখতে লাগলো চিজগুলো। সারা মুখ জুড়ে বিরক্তির ছায়া। আজ শুতে এমনিতেই রাত হয়েছিল। মাড়োতলায় বিচার বসেছিল দেশ-মহারাজের। শুকর দলুইয়ের বউয়ের সঙ্গে ক্ষীণ পয়ড়ার লটর-পটরের কেস। আর, ভাগবত দাসের মিষ্টি-চুরির বিচার। বিচারের পরে হলো রাত-পাহারার মিটিং। এই সব সাত-সতের করে ফিরতে রাত হলো। থানার বড়বাবু খাওয়া-দাওয়া করলেন বাণেশ্বরের বাড়িতে। তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন সাতভায়া তারা মাথার ওপর। বিছানায় শুয়ে চোখ দুটো লেগেছে কি লাগেনি, এ শালা এসে হাজির।

ঘরের মধ্যে একটা অবিরাম কর্-র্-র্, কর্-র্-র্ আওয়াজ। কুট্ কুট্

করে কাটছে কিছু। প্রথম আওয়াজটা আসছে পালঙ্কের গা থেকে। দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু একঘেয়ে, এই শব্দটাতে বড় অস্বস্তি লাগে গোক্ষুরের।

মুখ গোঁজ করে বাণেশ্বর ঘোষ বললো, 'এইটুকু চিজের তরে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়া দিলু?'

গোক্ষুরের দু'চোখ অবোলা গরুর মতো করুণ হয়ে আসে। ভেজা গলায় বলে, 'কি করি ঘোষদা, তুমিও তাগাদা দিছ্‌ল বার বার। মোরও আইজ জব্বর ঠ্যাকা। নাইলে—।'

বাণেশ্বর ঘোষের মনটা বাজে না সে কথায়। বলে, 'কিন্তু ঐ টুক্ চিজের তরে কি দিই বল্ তো তোকে?' বলতে বলতে আলতো হাই তোলে বাণেশ্বর। বালিশের তলা থেকে জপের মালাটা বের করে বাগিয়ে ধরে ডান হাতে।

গোক্ষুরের মুখে কথা সরে না। বাণেশ্বর ঘোষের দিকে ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে থাকে সে। রায়ের পূর্ব মুহূর্তে কাঠগড়ার আসামীর মতো। এই মানুষটিকে যতই নির্বিকার দেখাবে, ভেতরে ভেতরে ততখানি ভয়াল হয়ে উঠবে সে। গোক্ষুর জানে।

মিনমিনে গলায় গোক্ষুর বলে, 'দও টুকে বিবেচনা করিয়া। ঘরেও বিপদ। সেটাও মাথায় রাখ।'

বাণেশ্বরের চোখ-মুখের কোনও পরিবর্তন হলো না। জিনিসগুলোকে বাঁ-হাতে বার দুই নাড়াচাড়া করে বললো, 'শতখানেক টাকা লিয়া যা।'

ভীষণ চমকে ওঠে গোক্ষুর ভক্তা, 'বল কী ঘোষদা! অন্তত পক্ষে সাড়ে সাত-আট ভরি সোনা। তাছাড়া, দলে ভূষণা, লালা, পদ্মা—সাকুল্যে চারজন। বিচারি লোক তুমি। টুকে বিচার করিয়া কথা কও।'

মুখখানাকে পেঁচার মতো করে বসেছিল বাণেশ্বর ঘোষ। তাই দেখে গোক্ষুর ফের বলতে থাকে, 'আইজ বড় ধকল গেছে ঘোষদা। চমক-চমক মন লিয়া কাজ সারতে হৈল ত'। মনটা পড়িয়াছিল ঘরের ঢেঁকিশালে। ধরা পড়িয়া যাবার ষোল আনা জো ছিল আইজ।'

বাণেশ্বর ঘোষ একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চিজগুলোর দিকে। চোখ তার বারবার বিঁধে যাচ্ছিল হারছড়াটার দিকে। বিছে হার। বেশ ভারি সারি। ওজন কম করেও আড়াই ভরি। সাবেক দিনের চিজ তো। ভেতরে ফাঁক-ফোকর নেই। এ শালা হয়েছে এক ফাঁক-ফোকরের যুগ। সব কিছুই ভিতর ফাঁপা। বাইরের থেকে ফোলা ফোলা লাগে। যত না সোনা, তার দশগুণ খাদ। আসল মানুষ, আসল চিজ, মেলাই দায়। সব কিছুই দো-আঁশলা। পুটুঁলির একেরে তলায় একজোড়া বকুল-ফুল। ঠিক মধ্যিখানে তারার মতো পাথর বসানো। ভারি ভালো লাগলো বাণেশ্বরের। মালতী, মা-মনসা গাঁয়ের গুণা কামারের মেয়ে। মেয়ে তো নয়, শাঁসে জলে পুরুষ্টু নারকোলটি। ফুল জোড়াটি দেখতে দেখতে সহসা মালতীর কথা মনে আসে। মালতী এখন নিশি কামারের বৌ। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। নিশি শালা দিনরাত

গনগনে আগুনের সামনে বসে লোহা পেটে। গভীর রাতে সিঁদ-কাঠি বানায়। আর ঘরে আগুনের খাপরাটি হয়্যা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে যুবতী বৌটা। বাণেশ্বরের দিদির 'গঙ্গাজল' ছিল মালতীর মা। সেই সুবাদে আনাগোনা ছিল বাণেশ্বরের বাখুলে। হাসপাতালে ছ'মাস নরক যন্ত্রণা ভোগ করে অকালে বিদায় নিল গুণা কামার। শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিল বাণেশ্বর। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আকুল কেঁদেছিল লোকটা। মালতীকে টুকচার দেখো। ও যেন ভাসিয়া না যায়। বাণেশ্বর ঘোষ ষোল আনা আশ্বাস দিয়েছিল। অকে লিয়া ভাইবোনি। অর সব ভার আমার।

নিশি কামারের প্রথম বৌটা ছিল জন্ম রোগা। একটি মাত্তর মেয়ে বিইয়েছিল সাকুল্যে। আচমকা মরে গেল। নিশি মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে কোটালচকে।

মেয়ের বিয়ের পর হাত-পা ঝাড়া হয়ে গেল নিশি কামার। খালি দিনরাত লোহা পেটে আর গাঁজা খায়। দেখে-শুনে মালতীকেই সাজিয়ে গুজিয়ে নিশির ঘরে থাপুনা করলো বাণেশ্বর। হাজার হোক, দিদির গঙ্গাজলের মেয়ে। মৃত্যুশয্যায় ওর বাপকে কথা দিয়েছে বাণেশ্বর। সে কি অতই অমানুষ যে, মৃত্যুপথযাত্রীকে দেওয়া বচনটুকু রক্ষা করবে না? আর, নিশি কামার, তার অত অনুগত জন, তার একটা বউ রইবে নি? এই বইসে তাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া দিবে কে?

অনেকদিন মেয়েটাকে কিছু দেওয়া থোওয়া হয়নি। মায়ামানুষের পিরীত হলো হাইব্রিড ধানের পারা। খেপে খেপে সার-জল না জোগালে ভালো ফলন দেয় না। ছোট্ট ফুলজোড়াটা ভাবি মানাবে মালতীর কানে। মুখ ঘুরালে-ফিরালে ঝিলিক তুলবে।

আদাড়ে শেয়াল ডাকছে। শেষ প্রহরের ডাক। শ্মশানের শিমুল গাছের চুড়োয় কান্না জুড়েছে শকুনের দল। হিমেল বাতাস দরজা-জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকছে ঘরে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে গোক্ষুরের। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

'যাস্ শালা! তুই কি রাত ভোর করিয়া দিবি নাকি রে? বল্ কিছো।' সহসা মালা থামিয়ে তাড়া লাগালো বাণেশ্বর ঘোষ, 'মোর আবার রাতটি পুহালেই মেদনিপুর যাইতে হবে। ভাইয়ের খুনের কেসের দিন আছে।'

ঘোষের কথায় গোক্ষুর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো সহসা। মনটা এতক্ষণ বসেছিল বউয়ের পাশটিতে। নড়ে চড়ে বসলো গোক্ষুর।

চোখে-মুখে অসহায় আকুতি ফুটিয়ে বললো, 'মোর কথাটা টুকে রাখো ঘোষদা। বউটাকে হয়তো বেলদার হাসপাতালে দিতে হবে কাল ভোরেই। তার খচ্চাটা আন্তত দাও।'

'বলে, কি না কি!' একেবারে ক্ষেপে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'বলে, নিজের বউয়ের কানি জুটৌন, স্যাঙাতের বউকে পাছা পাড়! নিজের বউকে

হাসপাতালে প্রসব করাইতে পাঠাইনি একটা দিনের তরে !' কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরায় বাণেশ্বর, 'ভিটা বন্ধক দিয়া টাকা লিছু আইজ দুবছর। শোধ দিবার নামটি ধরু নি। নিয়মমত, কর্জের ওয়াশীল বাবদ কিছো কাটিয়া রাখিয়া বাকিটা তোকে দিবা উচিত।'

গোক্ষুর নাচার হয়ে বসে থাকে। আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। একটু বাদে বলে, 'তুমাকে জীবনে কম মাল দিই নি ঘোষদা। আইজ বিপদে পড়িয়া মিনতি কচ্ছি—।'

সেটা অবিশ্যি অস্বীকার করার জো নেই। এ পর্যন্ত বহু মাল গোক্ষুর ভক্তার হাত ঘুরে বাণেশ্বর ঘোষের সিন্দুকে সেঁধিয়েছে। গোক্ষুরের বাপ ক্ষীরোদ ভক্তাও আজীবন বাণেশ্বরের সিন্দুকে মাল ঢুকিয়ে গেছে। গোক্ষুর শালা ছিঁচকা চোর, আর ক্ষীরোদ ছিল ডাকাত। বলতে গেলে, ওদের জন্যই আজ বাণেশ্বর ঘোষের এই বাড়-বাড়ন্ত।

থানার বড়বাবুর আগমন হেতু বেশি রাতে গুরুপাক ভোজন। ঘুমও হয়নি ভালো। বেশ অম্বল হয়েছে বুকে।

একটা লম্বা ঢেকুর তুলে মুখ বিকৃত করলো বাণেশ্বর ঘোষ। বললো, 'আর তিরিশটা টাকা লিয়া যা। কথা বাড়াইস না। এমনিতেই যা ক্ষতি হবার হয়্যা গেল মোর। কাঞ্চন-বুড়ির না হোক পনদরো-বিশ ভরি সোনা ছিল। তা বাদে, পুরানো দিনের রুপার টাকা। পাক্কা খবর। তুই শালা, শুধু-মুদু ছ্যারকা গুয়ে লাঠি মারলি। আর এ বচ্ছরের মধ্যে বুড়ির বাখুলে ঢুকতে পারবি ? সতরু হয়্যাবে নি শালী ?'

একনাগাড়ে গজ গজ করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। জপের থলির মধ্যে আঙুল নাচানোর লয় দ্রুত হয়।

লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায় গোক্ষুর ভক্তা। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'বউয়ের ভাবনায়—।'

'চোপ্, শালা মেনি-মুয়া।' চাপা গলায় খেঁকিয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'অত যেদি বউ অন্ত প্রাণ, ত বউকে বগলে গুঁজিয়া বুসিয়া র' ঘরে। মোর কত ক্ষতিটা আইজ কল্লি, সেটা খিয়াল আছে ?'

চুপটি করে বসে থাকে গোক্ষুর ভক্তা। নিঃশব্দে হজম করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষের ভর্ৎসনা। ঘরের ভেতরটা নিঝুঝুম হয়ে আসে। লম্ফের মৃদু আলো দুজনের মাঝখানে তির তির করে নাচতে থাকে। শুধু দুজনের কালো ছায়া দুটো দেওয়াল বেয়ে ছাদের কাছাকাছি পেঁছে মিশে যায় পরস্পরের সঙ্গে।

সহসা বাণেশ্বরের উঠোনে কার পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ ! পর মুহূর্তে গলা খাঁকারি। চমকে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ। সর্ব ইন্দ্রিয়ে সতর্কতার ঘণ্টা বেজে যায়। খাট থেকে মাথা নুইয়ে চকিতে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় লম্ফটা। নিঃশ্বাস চেপে কাঠ হয়ে বসে থাকে দুজনে।

॥ দুই ॥

দেশ-মহারাজের বিচার সভায় বাণেশ্বর ঘোষই মধ্যমণি। দলের থানা কমিটির সে প্রেসিডেণ্টও বটে। বাপ দুয়ারী ঘোষ ছিল এ তল্লাটের ঝানু বিচারি। তার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। পঞ্চাং, অষ্টাং ইত্যাদিতেও ডাক পড়তো তার। দুয়ারী ঘোষের ছিল কুশের ডগার মতো ধারালো বুদ্ধি। 'ইতি' না বলতেই সে 'গজ' বুঝে ফেলতো। সারা নারাণগড় থানায় সে ছিল তার দলের এক নম্বর ব্যক্তি। খোদ অতুল্য ঘোষের সঙ্গে ছিল তার তুই-তুকারির সম্পর্ক। তো, তার বেটা বাণেশ্বর ঘোষ। বাপকা বেটা। তবে দেশ-মহারাজের আসনে বসে বেশ জমিয়ে বিচার-পঞ্চাত করার দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পর পর দুটো যুক্তফ্রণ্টই দেশ-গাঁয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। সেই যে হরেকিণ্টো কোঙার মেদনপুর শহরে মিটিং করে সব্বাইকে লাঠি-সড়কির ডগায় বেনাম জমিনের দখল নিতে বললো, দেশ-গাঁয়ের অধঃপতন শুরু হলো তখন থেকেই। হরেকিণ্টো কোঙার অ্যাদ্দিন বেঁচে থাকলে গাঁ-ঘরের ভদ্দরজনদের হাতে ভিখের ঝুলি ধরিয়ে ছাড়তো। অন্যরাই বা কম কিসে! কম জ্বালিয়েছে সাতষট্টি থেকে একাত্তর? শালা, নিজের ঘরে চোরটি সেজে বসে থাকা। সন্ধ্যাটি হলেই দরজায় খিল। আর, বিচার-আচার? ফি-সন্ধ্যায় বিচার বসতো প্রদ্যোৎ ভঞ্জর উঠোনে। প্রদ্যোৎ ভঞ্জই এলাকার এক নম্বরের ন্যাতা তখন। আর নিতাই-মাস্টার ছিল তার সাগরেদ। ছোকরা বয়সে বালক-সংগীতের দল গড়েছিল নিতাই। গলাটি খাসা ছিল তার। ওর কাছে তালিম পেয়ে বাচ্চাগুলো তৈরী হয়েছিল দারুণ। দলটা চলছিল ভালোই। বাচ্চাগুলো কালে কালে ধেড়ে হলো। ভেঙে গেল দল। নিতাই ঢুকলো খালিনার বোসদের আদ্যাশক্তি অপেরায়'। হারমোনিয়াম বাজতো। সুরও দিতো পালার গানে।

বেশ ছিল লোকটা। বারো মাস তিরিশ দিন দলের সঙ্গে ঘুরতো আঘাটায় বেঘাটায়। আচমকা দল-টল ছেড়ে সে নাম লেখালো পার্টিতে। এমনই দুর্মতি! বিচার-পঞ্চাতে নিতাই বড় একটা থাকতো না। তার দৃষ্টি ছিল এলাকার তাবত জোতদারদের বেনাম জমিনের ওপর। তল্লাটের চুয়াড়-সাঁতালদের জড়ো করে বেনাম জমি দখল করতো লাল-ঝাণ্ডা পুঁতে। সে নাকি হয়ে উঠেছিল গরীবদের 'মা-বাপ'। তো, প্রদ্যোৎ ভঞ্জর বিচার সভায় রোজ সন্ধ্যায় ডাকা হতো এলাকার একজন কি দু'জন সম্ভ্রান্ত মানুষকে। নামেই বিচার। আসলে, চলে মানী লোকের মান হরণের ব্যবস্থা। সুদ খাটাও ক্যানে? বন্ধক রাখ ক্যানে? দেশের ধান চড়া দামে বাইরে বিক ক্যানে? এসব কথা শুনে লোকে হাসবে না কাঁদবে, বল দেখি! আরে, দেশ-গাঁয়ের চিরকালের ধারাই যে ঐ। তাই সুদ খাটাই, বন্ধক রাখি, ধান বিকি। মোর

বাপ-ঠাকুন্দা চোদ্দ পুরুষ অনাদিকাল থেকে এসব করে আসছে। এটাই সমাজের রীতি। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে বাপ-বাপান্ত, গালাগাল। কথায় বলে, ছোটলোকের মুখ। সে মুখ একবার খুলেছে। বেশিক্ষণ শোনা দুষ্কর। আরে, থাম্ বাপ সকল। আর বাপ-চোদ্দ পুরুষ লিস নি। কি চাচ্ছ, বল্। হৈ-হৈ করে ওঠে বিচারকের দল। টিপছাপ ফেরত দাও। বন্ধকী-দলিল ফেরত দাও। ন্যায্য দামে গাঁয়ের লোককে ধান দাও। লচেত তুমাকেও মাড়োতলার কড়িকাঠে টাঙিয়া দুবো। তুমি যমনটি কথায় কথায় টাঙাতে মোদের। মানহি বাপ। তোদের কথাই থাক্। জান-মান লিয়া কুনো গতিকে বাঁচিয়া রইলে, মোর বাপের নাম! ভাগ্যে বাহাত্তরে জিতলো দল, ভাগ্যে জরুরী অবস্থাটা আইল দেশে। লচেত আদ্দিনে গাঁ-ঘরের সব ভদ্দর-সজ্জনদের মড়া চিরে ঘাস গজাইতো। অবাক কাণ্ড, সিংহের মতন কেশর দুলিয়ে যারা হম্বিতম্বি করছিল, জরুরী অবস্থা জারি হতেই, পুলিশ দু'চার বার ভিড়কা-ভিড়কি করতেই, যে যার মুষার মতন গর্তে সেঁধিয়াল-অ। প্রদ্যোৎ ভঞ্জ সক্কলের আগে। কোথায় গেল সেই গণ-আদালত, কোথায় গেল সেই তর্জন-গর্জন, জোর-জুলুম! দেশে-গাঁয়ে আবার ফিরে এলো সেই পুরনো দিন। সুদ-বন্ধকী ফের শুরু হলো। চৈতন্য সাহা ফের আড়তের কাটা টাঙালো নারাণ গড়ের বাজারে। সাবেকী দিনের বিচার-পঞ্চাত, দেশ-সমাজ—আবার ঠাঁই নিলো গাঁ-ঘরে। ভদ্দর-সজ্জনেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এখন সব কিছুই ঠাণ্ডা। কেবল ঐ কোটালচকের নিতাই-মাস্টারটা টিমটিম করে জ্বলছে। তা বলে শালাকে গাঁয়ে বাস কবতে দেয় নি বাণেশ্বর ঘোষ। পুরোপুরি গাঁ-ছাড়া করেছে ওকে। থানায় ওর নামে এক ডজন কেস ঝুলছে। পুলিশ আঁতি-পাঁতি খুজছে শালাকে। একটিবার বাগে পেলেই গাছায় হুড়কা ঢুকাবে। কম করেও দশটি বছর জেলের ভাত ওর বাঁধা। কঠিন কঠিন কেস সব। খুন, রাহাজানি, দাঙ্গা, ঘরে-আগুন,—সব। এলাকা ছেড়েছে বটে, তবুও ভয় ঘোচেনা বাণেশ্বরের। তক্কে তক্কে রয়েছে সে। একটিবার হদিশ পেলেই, থানায় পাঠাবে খবর। শালা যাবে কোথায়? আজ হোক, কাল হোক, ধরা ওকে পড়তেই হবে। চতুর্দিকে বাণেশ্বর ঘোষের লোক শিকারী বেড়ালের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। বিশেষ করে ন্যাকা-সুধীর নেমে পড়েছে পুরো দামে। গোয়েন্দাগিরিতে তার তুল্য লোক আর ভূ-ভারতে নেই।

আজ মাড়োতলায় দু'টো কেসের বিচার ছিল। এক, দুর্গা পুজোর সময় ভাঁড়ারঘর থেকে ভাগবত দাস চুরি করেছিল এক ঝুড়ি মিঠাই। দুই, শুকর দলুইয়ের বউয়ের সঙ্গে ফণি পয়ড়ার লটর পটর। বিচার দুটো জলদি নিষ্পত্তি করবার দরকার ছিল। কারণ, সন্ধ্যেয় থানার বড়বাবু আসবেন। মেট্যাল গ্রামে আর-জি-পার্টি থেকেও কাজ করছে না। চুরি-চামারি বাড়ছে দিন দিন। ঐ নিয়ে আলোচনা হবে বিচারের পর। দলের থানা কমিটির প্রেসিডেন্ট বাণেশ্বর ঘোষ। তার গ্রামেই যদি চুরি-চামারি না কমাতে পারে পুলিশ, মুখে

চুন-কালি পড়বে না? বাগেশ্বর ঘোষ তাড়া লাগায়, 'জলদি শুরু কর হে। বড়বাবুর আইস্‌বার টাইম হয়্যাল।'

ভাগবত দাস বসেছিল জমায়েতের একেবারে পিছনে। সামনে এনে বসানো হলো তাকে। বিচার শুরু হলো।

গেল দুর্গা পূজায় দেশের পক্ষে পূজা-ঘরের ভাঁড়ারি ছিল ভূষণ বাগ। ভাগবত দাস ছিল অ্যাসিস্টেন্ট। কোন্ ফাঁকে ভূষণের চোখ এড়িয়ে এক ঝুড়ি মিষ্টি চাদর-ঢাকা দিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। ধরা তো পড়তো না। ওর বাচ্চাটাই ধরিয়ে দিল। সহসা মায়ের হাতে মিঠাইয়ের ঝুড়ি দেখে বাচ্চার লালা ঝরে মুখে। বাধ্য হয়ে একটা মিঠাই ওর হাতে ধরিয়ে দেয় ভাগবতের বউ। বাচ্চা বেরিয়েই দৌড় মারে কুয়াতলার দিকে। সেখানে সমবয়সীদের আড্ডা। তারা জিভে জল ঝরাতে ঝরাতে দেখতে থাকে ওর মিঠাই খাওয়া। যে যার মায়ের কাছে গিয়ে মিঠাইয়ের তরে বায়না ধরে। ধীরে ধীরে কথাটা চাউর হয় পাড়ায়। এবং কালক্রমে তা মথুর পাখিরার কানে আসে।

মথুর পাখিরা গেল বছরের আগে অবধি ছিল ভাঁড়ারিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট। দু'কুড়ি শালপাতা আর এক ডজন হ্যাজাকের 'মেনথেল' ঝেঁপে দেবার অপরাধে সে পদচ্যুত হয়েছে। তার বদলে ঐ পদে এসেছে ভাগবত দাস। পাক্কা এক হপ্তা সারা গ্রামব্যাপী মথুর পাখিরার এই 'গু-খাবা' কাজের জন্য ধিক্কার জানিয়েছিল ভাগবত দাস। পাশাপাশি নিজের জীবনের অসংখ্য সততার ভাণ্ডার থেকে উদাহরণ যোগ্য দু'দশটি মণি-মুক্তা খুঁটে এনে উপহার দিয়েছিল। পরিশেষে, এক হপ্তা বাদে, বিচারের আসরে, 'দ্যাব্‌তার ধন যে চুরি করে, সে বেজম্মার হাত কাটিয়া লিবা হউ' ধ্বনি তুলেছিল। এত সবের সুবাদে মথুর পাখিরার পদটি জুটেছিল ভাগবতের কপালে। এক বছরও টিকলো না। কারণ, ঐ ভাগবতের ব্যাটার মিঠাই খাওয়ার ব্যাপারটা, পাড়াময় রটতে রটতে এক সময় মথুর পাখিরার বউয়ের কানে আসে। বউয়ের মুখে ঘটনাটি শোনা অবধি চঞ্চল হয়ে ওঠে মথুর পাখিরার মন। তার ডান-চোখ নাচতে থাকে। গেলবার বিচারের থানে পয়লা চটকায় মুখ খুলে ছিল ভাগবত দাসই, মনে পড়ে যায় সেই স্মৃতি। শেষমেষ ঠাকুরের থানেনু জিনিস চুরি করলু? তোর কপালে দড়ি জুটেনিরে? মর, মর, মরিয়া যা। অতই যেদি লোভ ত' দশজনের কাছে চুকু ক্যানে? কথাগুলো মনে হলে এখনো ব্রহ্ম রন্ধ্র জ্বলতে থাকে। মথুর পাখিরা খুলে যাওয়া কাছা বাগাতে বাগাতেই ঝাপটে হাঁটা দেয়, মাড়োতলায় খবরটা দিতে।

মাড়োতলা তখন লোকজনে ঠাসা। এমন মুখরোচক খবরকে মাটিতে পড়তে দিলো না কেউ। ভাগবত দাসকে ডাকা হলো বাবুভায়াদের সম্মুখে। জিগানো হলো কথাটা। প্রথমে রাজনৈতিক নেতার আদলে একটি লম্বা ভাষণ ঝাড়লো ভাগবত দাস। জীবনে, আর যাই হোক, তাকে যে কেউ কোন দিন চুরির অপবাদ দিতে পারে নি, অমন হীন-ঔরসে যে তার জনম্ হয় নি, তা হরেক তথ্য ও উদাহরণ সহযোগে প্রাঞ্জল করলো সে। যে পড়া-মুয়া অমন

অপবাদ দেয়, তার মুহে পোক্ পড়বে, জিভ খসিয়াবে,---এমন অভিসম্পাতও দিল। এবং ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারলে সারা গাঁ নাক ঘসটাবে, এমন প্রতিশ্রুতিও দিল। অবশেষে, এক সময় কাঁদতে শুরু করলো। সে কান্না উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। এবং ঐ অবস্থায় সে বাণেশ্বর ঘোষের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে, 'ও ঘোষের পো, মোর গলায় পা তুলিয়া দউন গো—, বলে বার বার মিনতি জানাতে লাগলো। কারণ এমন হীন অপবাদ শোনার পর তার আর বেঁচে থাকবার তিলমাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু ঐ ছিচ-কাঁদুনিতে ভোলে না বাণেশ্বর ঘোষ তথা দেশ-মহারাজ। দাশ-পাড়ার অন্তত ডজন খানেক বাচ্চা ও বউ ঝি সাক্ষ্য দিয়ে বসে যে, তারা ভাগবত দাসের ছোট ছেলে প্যাঁকাকে একটা আস্ত মিষ্টি খেতে দেখেছে। একসময় প্যাঁকা নিজেই তা কবুল করে বসে। তখন ভাগবত দাস মহা-বিক্রমে বলতে থাকে যে, সে নন্দ রক্ষিতের দোকান থেকে দস্তুর মতো নগদ দাম দিয়েই কিনে নিয়ে গিয়েছিল মিষ্টি। শোনা মাত্রই দেশ-মহারাজ তো খাপ্পা। নন্দ রক্ষিতকে ডাকা হোলো বিচারের থানে। নন্দর ঘর পারিজাতপুরে। তিন-পুরুষের হালুইকর তারা। ফি-বছর পুজোর ক'দিন মেট্যালের মাড়োতলায় এসে দোকান পাতে।

'তুমার সাহস ত' কম নয় হে! দেশ-মহারাজ বাঘের ঝাপট নেয় নন্দর ওপর, 'পুজো-কমিটি ভোগ কিনবার আগে, তুমি কুন্ আক্কেলে পাবলিককে ভোগ বিক-অ? আগে মানুষ খাবে, তার বাদে দ্যাব্‌তা খাবে?'

'আগে-ভাগে মানুষের মুখে গিয়া সব ভোগই আঁইঠা।' রায় দিয়ে বসে শ্যাম চক্কোত্তি। লধা মজায় বলে বামুনদের আসনে তার ঠাঁই নেই বহুদিন। উঁচু জাতের লোকজন তাকে পুজো-আচ্চাতে ডাকে না। শ্রাদ্ধঘরে-টরে ফলার টলারে ডাকলেও অল্প ব্যবধান রেখে পাত পাড়ে ওর জন্য। সুযোগটি পাওয়া মাত্র মোক্ষম নিদানটি দিয়ে বসে সে। এমন নিদানের পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। চাপা ব্যঙ্গ। ভাবটা হলো, দেখি এবার তোদের উঁচু জাতের ঠাকুর কি করিয়া খায়। কি ভাষ্ দেয় তোদের উঁচু জাতের পুরোহিত!

নন্দ রক্ষিত আকাশ থেকে পড়ে। দেশ-মহারাজকে ভোগের মিষ্টি বেচার আগে পাবলিককে বেচেছে সে? হুস্ করে জ্বলে ওঠে নন্দ। বলে, 'দেখ ভাগবত, দিনভর আগুনশালে কাজ আমার। মাথা গরম। কি কত্তে কি করিয়া ফেলবো, তখন দোষ দিব নি মোকে।

নন্দ রক্ষিতের রুদ্র রূপ দেখে কিঞ্চিত ভয় পায় বুঝি ভাগবত দাস।

বলে, 'তুমার পাশ কিনি নি হে। তুমার জোগাড়দারই বিকছে মোকে। তুমি তখন বোধ লেয় লাইতে গিসলে।'

দেশ-মহারাজ নিশ্চিন্তে বসে থাকে পায়ের ওপর পা তুলে। ওদের আর কিছুই করণীয় নেই এখন। মামলা বুঝে নিয়েছে দু'পক্ষ। নিজের স্বার্থেই লড়ে যাবে ওরা। যতক্ষণ না নিষ্পত্তি হয়। দেশ-মহারাজ শেষ অবধি জরিমানা পাবেই। হয় ভাগবত দাসের থেকে, নয় নন্দ রক্ষিতের থেকে।

নন্দ রক্ষিতের চেলা বাদল এসে দু'দণ্ড জেরা করেই প্রমাণ করে দেয় যে,

সে কাউকেই মিষ্টি বেচে নি। যে সময়ের কথা ভাগবত দাস বলছে, তখন মিষ্টি পাকই হয় নি। বেসন-চিনি এসেই পৌঁছয় নি নারানগড়ের বাজার থেকে। অনেকেই স্মৃতি থেকে সাক্ষ্য দেয় যে, বাদলের কথাই ঠিক। অবশেষে দেশ-মহারাজ যখন ভাগবতকে মায়ের থান স্পর্শ করে বলতে বলে, তখন সে অনেক ধানাই-পানাই করে, এক সময় সটান লুটিয়ে পড়ে বাণেশ্বর ঘোষের পায়ের তলায়।

'ছ্যা, ছ্যা, ছ্যাহ্— ।' বাণেশ্বর ঘোষের সারা মুখে অপরিসীম ঘেন্না, 'এক্কেরে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভরিয়া গেল হে দেশটা! সামনের দিকে টুকচার নুইলেই পিছন থিকে আ্যাঁড়-কুষাটি কাটিয়া ল্যায়! ধর্ম-কর্ম, পাপ-পুণ্যবোধ সব চলিয়াল-অ দেশ্‌নু! মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছো রইল নি! ছ্যা-ছ্যা— ।'

কিন্তু এই মুহূর্তে সারা মেটাল গাঁ পূজার উৎসবে মেতেছে। কাজেই বিচার স্থগিত রাখা হলো।

সেই বিচারই আজ বসেছে।

আজ আর নতুন করে কিছুই করণীয় ছিল না। ভাগবত দাসকে মাড়ো-তলার কড়ি-কাঠে বার দুই টাঙানো হলো। ত্রাহি ত্রাহি রব তুললো সে। বাণেশ্বর ঘোষকে বার বার 'বাপ' বলে ডাকতে লাগলো। তুমি মোর বাপ গো। ছাড়িয়া দও এবারের মতন।

'শালা, মুই তোর বাপ?' বয়েসকাল অবধি ফুলে ফুলে মধু খাওয়া বাণেশ্বর ঘোষ সহসা কেন জানি ক্ষেপে যায় দ্বিগুণ, 'টাঙিয়া রাখ্ শালাকে। মু' দিয়া রক্ত উঠিয়া মরু। মুই অর বাপ?' রাগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে সে।

অবশেষে পাঁচশো-এক টাকা জরিমানা করা হলো ভাগবত দাসকে। খেরো-খাতায় দেশ-মহারাজের সিদ্ধান্ত, ভাগবত দাসের স্বীকারোক্তি ইত্যাদি লিখিয়ে, টিপসই নিয়ে, রেহাই দেওয়া হলো ওকে। আমি শ্রীভাগবত দাস, পিতা শ্রীকান্ত দাস— ।

'শ্রীকান্ত লয় হে। লিখিয়া দও ক্ষীরোদ ভক্তা।'

'কে? কে কইল কথাটা?' দেশ-মহারাজের চূড়ামণিরা মুখ ফিরে তল্লাশ করে।

পেছন থেকে কথাটা ছুঁড়েছে মথুর পাখিরা। বলেই মুহূর্তে নামিয়ে নিয়েছে মুখ।

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। ক্ষীরোদ ভক্তাই বটে! অমন চোর-চূড়ামণির পুত্র নাইলে শত জনের সমুখ থিকে এক ঝুড়ি মিষ্টি পাচার করতে পারতো নি।

'এ শালার হাতে সিঁদ-কাঠি পড়লে এলাকা জ্বলিয়াবে হে— ।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে জমায়েতের পেছনে চলে যায় ভাগবত দাস। সামনে আসে শুকর দলুই আর ফণি পয়ড়া।

এ কেসটা অতি সোজা। শুকর দলুইয়ের বউ আর ফণি পয়ড়ার মধ্যে অবৈধ প্রেম। হাঁড়ির একটা ভাত টিপেই বাণেশ্বর ঘোষ বুঝে ফেলেছিল,

ব্যাপারটায় মেম্বারের পুরোপুরি সায় আছে। মিয়া-বিবি রাজি, তো ক্যা করেগা কাজী! এ হলো শাস্ত্রের বচন। শুকুরাটা বোকার ডিম। তাই ঘরের কেলেংকারী বাইরে এনেছে। অথচ এসব জিনিস বিচারের থানে হাজির করলে, তাকে হাল্কাভাবে নেওয়াও চলে না। সমাজ-সংসার অধঃপাতে যাবে তাহলে। গাঁ-ঘরে আজকাল এই ধরনের অপকর্ম বাড়ছে। শৃঙ্খলা রাখাই দায়। যে যার নিজের শিং-এ মাটি খুঁড়তে চায়। দেশ-মহারাজের বিচার-আচার তো এমনিতেই লয় পেতে বসেছে। এখন থেকে রাশ না ধরলে শেষ অবধি আর সামলানো যাবে না। এক জোয়ারেই ভেসে যাবে সবকিছু। তার ওপর আজ শুকুর দলুই এসেছিল বাণেশ্বরের দুয়োরে। যৎপরোনাস্তি কাঁদাকাটা করলো। বিদায়ের কালে ট্যাঁক থেকে বের করে কিছু পূজা চড়িয়ে গেল বাণেশ্বরের শ্রীচরণে। জয় বাবা বাণেশ্বর—পাতাল-ফোঁড়—মাহাদেব—পূজা লাগে বাবা—। বাণেশ্বর ঘোষ আশ্বস্ত করেছে শুকুরাকে।

সেই কারণেই শুকুর দলুইয়ের বউয়ের 'ঢ্যামনা'টাকে একটু বেশি মাত্রায় রগড়াতে হলো বিচারের স্থলে। জরিমানা হলো দু'শো-এক এবং দেশ-মাহারাজকে মাংস-ভাত।

বিচার শেষ হতে না হতেই বড়বাবু পৌঁছে গেলেন। আজ বাণেশ্বর ঘোষের বাড়ীতে বড়বাবু খেয়ে যাবেন রাতে। সকাল থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে তার আয়োজন চালিয়েছে বাণেশ্বর। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য এবং সর্বোপরি যৎপরোনাস্তি পেয়।

পৌঁছোনোমাত্রই বড়বাবু শুধোলেন, 'আচ্ছা, বংশী ভঞ্জ বাড়ীতে আছে?'

কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না তা। বাণেশ্বর বলে, 'ঘরে সে খুবই কম থাকে স্যার। দিন কয় আগে, বোধ করি গয়া না পুরী লিয়া গেল জনা কয় বুড়া-বুড়ীকে। ফিরেছে কি—?'

বড়বাবু বললেন, 'ওকে একটু খবর দেবেন তো। জরুরী দরকার। খানিকটা পুরনো মধু জোগাড় করে দেবে বলেছিল—।'

সাবেক আমলের ভারি চেয়ারে গা এলিয়ে বসেন বড়বাবু। শুরু হয় রাত-পাহারার বৈঠক।

বিকেলে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশে এখনো মেঘ রয়েছে। হিমেল হাওয়া বইছে অল্প অল্প। তাতে আবহাওয়ায় গুমোট ভাবটা কেটেছে।

প্রথমেই বাণেশ্বর ঘোষ দেশ-গাঁয়ে চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি ও তজ্জনিত সংকট সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলো। 'মাঠের পাকা ধান দু'দিন বাদে খামারে আইসবে। এখনই সতর না হইলে গিরস্থের সর্বনাশ হয়্যাবে। রাতের আঁধারে সর্বস্ব লিয়াবে শালারা।'

ডিহিপার লোধাপাড়া নিয়ে মেটাল গাঁয়ে প্রায় শ'দুই ঘরের বাস। তার মধ্যে বাণেশ্বর ঘোষ একজনই। সুদেব মিদ্যা, কুলদা ডাক্তারের মতো দু'তিন ঘরও কম যায় না। আরো আছে জনা দশ-বারো, যাদের ঘরে ধান-চাল, বাসন-

কোনন কিছু সোনা-দানাও মিলবে। বাকি সবাই ভাগ-চাষী, ছোট-চাষী, মুনিষ-মাইন্দার। খাটে-বাটে। খেয়ে, না খেয়ে থাকে। খাটা-বাটা না পেলে পেটে ভিজে গামছা জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আর আছে বিশ-তিরিশ ঘর লোধা, তাদের অবস্থা আর কহতব্য নয়।

মানুষগুলো নিঃশব্দে বসে ঢুলছিল। কেউ কেউ দিনভর কারো ক্ষেতে খামারে খাটা-বাটা করেছে জন্তুর মতো। কারো কপালে কাজ জোটেনি, তাই খাদ্যও জোটেনি সারা দিন। এখন অসাড় শরীর নেতিয়ে পড়ছে ওপড়ানো লতার মতো। শরীর আর বইছে না এখন। চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। কিন্তু যত কষ্টই হোক, বসে থাকতেই হবে। এ হলো চুরি-চামারি বন্ধ করবার মিটিং। এ মিটিং-এ গর-হাজির হলে বাবুরা তার উল্টো অর্থ করবেন। বিশেষ করে লোধা পাড়ার কেউ গর-হাজির থাকলে তো কথাই নেই। এমনি-তেই লোধাদের ওপর বাবুভায়াদের অষ্টপ্রহর সন্দেহ। কাজেই অর্ধেক অঙ্গ কাটা গেলেও, বাকি অর্ধেকটাকে টেনে টেনে হাজির হতে হবে চুরি-রোধের মিটিং-এ। ঘুমে শরীর নেতিয়ে পড়লেও, দু'চোখ খুলে রাখতে হবে। একটু ঢুলতে দেখলেই বাবুরা বাঁকা চোখে তাকাবেন, 'কি রে, সন্ধ্যাবেলা ঘুমাচ্ছু ক্যানে? রাতে উজাগর চলছে, নাকি?' ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

বাণেশ্বর ঘোষ আরো স্পষ্ট কথার মানুষ। শুকনো কাঠের মতো খটখটে গলায় বলে, 'উজাগর চলুক, ক্ষতি নাই। কিন্তু একটিবার ধরা পড়লে, হাত-পা কাটিয়া ছাড়িয়া দুবো। খিয়াল থাকে যেন কথাটা। চোর যদি সাপ হয় তো, বাণেশ্বর ঘোষ লেউলুটি।'

দু'চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাণেশ্বর ঘোষের ভরাট গলার বক্তৃতা শুনছিল লোকগুলো। এখনই সতরু না হইলে সর্বনাশ হয়্যাবে হে। মানুষগুলো ভেবে পায় না তাদের কি সর্বনাশ হতে পারে!

'চোর আইলে মোদের অ্যাঁড়কুষাগুলা ছাড়া আর কিচ্ছোটি পাবে নি ক' ঘরে। কথাটা বারংবার মনে এলেও মুখ ফুটে বলতে পারলো না কেউ। বরং এক-আধজন মিনমিনে গলায় বললো, 'সেটা ঠিক। চুরি-চামারি বাড়লে সারা গাঁ'র বদলাম।'

বাণেশ্বর ঘোষের পর বক্তৃতা দিল ওর ব্যাটা চপলাকান্ত। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে—কবিগুরু বলিয়া গ্যাছন্। চোর চুরি করিয়া অন্যায় করে। আমরা যদি সইয়া যাই, তবে আমরা আরো বেশি অন্যায় করবো। চপলাকান্তর হাত আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ। অন্যায় সইবো নি। যে কোনও মূল্যে রুখবো।

'মোর ছোট ছেলে।' বাণেশ্বর তেলতেলে হাসে, 'বি-এ পাশ করিয়া বুসিয়া আছে।'

বড়বাবু লেকনজর ছুঁড়লেন চপলাকান্তর দিকে, 'বড্ড রোগা। স্বাস্থ্য ভালো হলে দেখা যেতো, কোথাও—কিছু—।'

'কেরানীর পদ-টদও তো থাকে পুলিশ দপ্তরে—।' গদগদ হাসে বাণেশ্বর।

শেষ অবধি বড়বাবুর নির্দেশে চপলাকান্তকে লিডার করে আর-জি-পার্টি। ফি-রাতে বিশ ঘর থেকে বিশ জন। যে পারবে, নিজে যাবে। নইলে লোক জোগাবে মাইনে দিয়ে। ছাড়াছাড়ি নেই কারো। গরীব-গুরবো লোকগুলো সার কথাটা বুঝে ফেলেছে ততক্ষণে। বাবু-ভায়ারা যে-যার লোক লাগাবে মাইনে দিয়ে। নিজেরা মজাসে ঘুম লাগাবে ঘরের খিলটি তুলে। আর গরীব মুনিষ-মাইন্দাররা দিনভর জন্তুর মতো খাটাখাটা করে রাতভর বড়লোকদের সম্পত্তি পাহারা দেবে। পরের দিন ফের খাটতে যাবে উজাগর শরীর নিয়ে। বড়বাবুকে সামনে রেখে ভালো এক খ্যাঁচা-কল বানালো বাণেশ্বর ঘোষ।

সবই বুঝতে পারে লোকগুলো। কিন্তু মুখে হৈ-হৈ করে ওঠে, 'ঠিক বলছ ঘোষের পো। কাক্কো ছাড়াছাড়ি নাই।'

সবশেষে বড়বাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঠিকমত কাজ করলে, মেট্যাল-ডিহি-পার আর-জি-পার্টি'কে তিনি টর্চ আর বল্লম দেবেন।

বৈঠক ভেঙে গেল রাত ন'টা নাগাদ। গরীব মানুষগুলো অবোলা পশুর মত চুলতে চুলতে বাড়িব পথ ধরলো। গোক্ষুর ভক্তা যাবার কালে বাণেশ্বর ঘোষের চোখের ওপর চোখ রাখলো পলকের তরে। বাণেশ্বরের চোখের সামনে ঝাঁ-করে ভেসে উঠলো কাঞ্চনবুড়ির মুখখানা।

বড়বাবু বললেন, 'ন'টা বাজে। আমি একটুখানি ঘুরে আসি।'

'কুন দিকে যাবেন?' বাণেশ্বর ঘোষ শুধোয়।

'এই, একটুখানি পেট্রোল মেরে আসি কোটালচক-ফুলগেড়্যার দিকটাতে। হাজার হোক, থানার ও-সি মাঝে মাঝে গাঁয়ে ঢুকলে গ্রামবাসীর সাহস বাড়ে। আমি দশটার মধ্যেই ফিরবো।' যাবার সময় বড়বাবু নীচু গলায় শুধোল, ও শালার খবর-টবর কিছু পেলেন?'

'কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে, বিপ্লবী, নেতা, নেতাই মাস্টার।'

'পাই নি। তবে ভাববেন না। পেয়ে যাবো। লোক লাগিয়ে রেখেছি। সন্ধান পেলেই জানাবো।'

'হ্যাঁ। ভালো করে লোক লাগান। ঐ একটাই ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে। ওকে না ধরা অবধি স্বস্তি নেই। ওপর-ওয়ালার কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে! বাকিগুলো সব ঢোঁড়া সাপ। চরে খাক। ভয় করি নে।' চলে যান বড়বাবু।

বাণেশ্বর ঘোষ মুচকি হাসে। কত যে পেট্রোল মারবে তা আমার জানা আছে। কোটালচকে পান্ডাদের ঘরে আর ফুলগেড়্যা ভুঞ্যা-বাখুলে তোলা আদায় করতে চললে তুমি!

বাড়ির পথে পা বাড়ায় বাণেশ্বর ঘোষ।

সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়—এই হলো বাণেশ্বর ঘোষ। মাড়ো-তলা থেকে ফেরার পথে এক ফাঁকে ভাগবত দাস আর ফণি পয়ড়াকে আশ্বস্ত করে সে। 'চুরি করু, ড্যামনামি করু, দেশের লোক তো, না-কি? দেশ

থিকে দূরে করিয়া দিতে ত' পারবো নি। গলায় পা তুলিয়া দিতেও পারবো নি। দোষ করলে সাজাও দিতে হবে। আবার, সংকটকালে পাশটিতে গিয়া দাঁড়িইতেও হবে। তবেই না দেশ, তবেই না সমাজ। কাল সন্ধ্যায় জমিন-জায়গার দলিলগুলো লিয়া আয়। দেখি কতটা কি করা যায়। দেশ-মহারাজের ধার্য জরিমানা, সে তো দিতেই হবে। দেরি করলে ফের রোষ বাড়িয়াবে দেশ-মহারাজের। ফণি, তুমার সে পাম্প মেসিনটা আছে, না বিকিয়া দিছ? আগের দিনের বিলাতি ইঞ্জিন, এখন তক্ক গর্জন কী তার! অটা হইলে আর জমিনের দলিল লিয়া আসতে হবে নি তুমাকে।'

হিম পড়ছে আকাশ থেকে। শনশনিয়ে হাওয়া বইছে। পাতলা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তারাগুলো। সহসা মালতীর মুখখানি মনে পড়ে যায়। এ হলো মালতীকে আদর করবার তুল্য রাত। কিন্তু মেয়েটা ভারি গোল বাধাচ্ছে ইদানীং।

তিন

টাকা ক'টি ট্যাঁকে গুঁজে বাণেশ্বর ঘোষের উঠোনে নাবল গোক্ষুর। উঠোনে পায়ের শব্দ আর গলা খাঁকারি শুনে ওরা নিশ্চুপ মেরে বসেছিল অনেকক্ষণ। একটু বাদে শব্দটা আর শোনা গেল না। তবে পায়ের শব্দ, গোক্ষুরের মনে হল, চলে গেল কালী মন্দিরের দিকে। মনের ভুল-টুল হতে পারে। খাট থেকে নেমে সন্তর্পণে জানালার একটা পাল্লা খুলেছিল বাণেশ্বর। চোখ চারিয়েছিল উঠোনময়। কিছুই দেখা যায় না। গোক্ষুরও এগিয়ে গিয়ে কান এড়েছিল। না, কোনও শব্দই তো নেই। কুত্তা-টুত্তা হবে বোধ লেয়। জানালার পাল্লাখানা ফের নিঃশব্দে বন্ধ করে বাণেশ্বর। টর্চের ক্ষীণ বাতি জ্বালিয়ে হাত ঢোকায় বালিশের তলায়। পনের খানা দশটাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয় গোক্ষুরের দিকে।

বলে, 'ভাগ জলদি, গতিক সুবিধার নয়। শালা, তোর পিছে বোধ লেয় 'মাছি' লাগছে।'

উঠোনে পা' দিয়েই মুহূর্তকাল দাঁড়ালো গোক্ষুর। কান জোড়াকে সক্রিয় করে শিকার করতে লাগলো চারপাশের শব্দ। মনটা হাজারো 'কু' গায়। কে যে কোন্ কানাচে কী অভিপ্রায়ে লুকিয়ে আছে। ভগবানকে মালুম। এখন গোক্ষুরের সংকটকাল। সংকটকালে এমনিই হয়। আচমকা বিপদ ধেয়ে আসে চারপাশ থেকে। শুকনো ডাঙায় মাথা-চাপড়ি জল।

বাঁদিকে লম্বাটে গোয়ালঘর, ডান দিকে সাবেক আমলের কালী মন্দির, মধ্যিখানে বাখুল। সামনে প্রশস্ত উঠোন, খামার। ঠায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের দিকে কান আড়লো গোক্ষুর। ঐ দিকেই মিলিয়ে গিয়েছিল শব্দটা। এখন চারপাশ শুনশান। শব্দ যা হচ্ছে, সব স্বাভাবিক শব্দ। গোক্ষুরের কানে ওগুলোর অর্থ জলের মতো পরিষ্কার। এই যেমন, খস খস আওয়াজ একটা

আসছে এখন। তবে সেটা আসছে ক্ষীরি-বুড়ির বাত্তিক-বাড়ি থেকে। অর্থাৎ ফণী পরাড়ার রাতচরা বলদটা ঢুকেছে নির্ঘাৎ। ঐ একটা বলদই ক্ষীরি-বুড়ির পুরো বাত্তিক-বাড়িটা নির্মূল করে দিল। মালিক যেমন, তার বলদও তেমনি। নিশি কামারের বাড়ির কপাটে 'কোঁ-চ' করে একটা মৃদু আওয়াজ হলো। অন্যের শুনতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ হলো চোরের কান। কেবল দুটো কান দিয়েই গোক্ষুর অন্ধকারে দেখতে পায় দিনের মতন। দরজা 'কোঁ-চ' করার অর্থ গোক্ষুর বিলক্ষণ বোঝে। তার মানে, নিশি কামারের বউ মালতীর পাশে বাণেশ্বর ঘোষ ছাড়াও এখন যাতায়াত চালাচ্ছে অন্য কেউ। লম্পটরা সবাইয়ের চোখে ধুলো দেবে, এক ঐ চোর ছাড়া। চোরেদের চোখ এড়ানো তাদের পক্ষেও দুষ্কর। তাদের কাছে সবাইয়ের কুষ্ঠী-ঠিকুজি, হাঁড়ির খবর। মাঝে মাঝে বেশ মজা পায় গোক্ষুর। এমন সব আজব কাণ্ড-কারখানা, রাতের আঁধারে। সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না।

আজ, কাঞ্চন বুড়ির বাড়ি থেকে চুরি করে ফেরার সময়, তেমনি এক হাড়-কাঁপানো মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছে গোক্ষুর ভক্তা। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল সে। প্রথমে নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাসই করেনি। কিন্তু ভালো করে দেখে শুনে তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছিল এক লহমায়।

কেলেঘাই নদীটা গভীর খাতে বইছে। দু'ধারে তালগাছ প্রমাণ উঁচু পাড়। দিন-দুপুরে একা একা ঐ নদীর গর্ভে নামলে সাহসী মানুষেরও গা' ছম ছম করে। নদীটা নিঃশব্দে পেরিয়ে গোক্ষুর উঠে এসেছে এ পাড়ে। নারানগড় থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা মেট্যালের দিকে এসেছে, সেটা শেষ হয়ে গেছে নদীর ওপারেই। এপার থেকে ফের শুরু হয়েছে কাঁচা রাস্তা। এই-খানে একটা পুল হবে কেলেঘাইয়ের ওপর, বহুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে। পুল হলে দু'টো রাস্তা যোগ হয়ে যাবে।

কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছিল গোক্ষুর। একদশীর ক্ষয়া চাঁদ উঠেছে মধ্যরাত পেরিয়ে। এক ফালি চাঁদ। হাল্কা কুয়াশায় চাঁদের আলো ঘসা-ঘসা, ঝাপসা। হিম পড়ছে আকাশ থেকে। গোক্ষুর তার কালো রঙের গামছাখানি দিয়ে ঢেকে ফেলেছে সারা মাথা। হিম এবং মানুষের থেকে আত্মরক্ষা। সহসা মানুষ-জনের সামনে পড়ে গেলে গামছা-ঢাকা মুখখানি দেখে চিনতে পারবে না কেউ।

রাস্তার দু'ধারে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ-গাছালি। ওদের ছায়াগুলো লুটিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। ছায়া পড়া জায়গাগুলোতে চাপ-চাপ অন্ধকার। ঐ অন্ধকার অংশগুলোর ওপর দিয়েই গা বাঁচিয়ে হাঁটছে গোক্ষুর। প্রায় সিকি মাইল পথ অতিক্রম করেছে, সহসা সামনে, রাস্তার ধারে, গাছের আড়ালে সাঁত করে সরে গেল এক ছায়ামূর্তি। পলকের তরে ঘটলো ঘটনাটা। অন্য কেউ হলে নজরেই পড়তো না। কিন্তু এ হলো, চোরের ইন্দ্রিয়। সর্বদাই ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সতর্ক। প্রথমটা গোক্ষুর ভক্তার সন্দেহ হলো, সত্যিই কি কেউ সরে গেল গাছের আড়ালে? না কি

দৃষ্টি বিভ্রম? ভয়ের তালে মনের মধ্যে সাত-সতের উব্‌রে-ডুব্‌রে খেলা। রাতের বেলায় প্রায়ই এমন দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। গাছের ছায়া দোল খায় হাল্কা জ্যোৎস্নায়. অনেক সময়ই ভুল-ভাল দেখায়। গাছের ঠুঁটো কুঁজকে বসে থাকা মানুষজন বলে ভুল হয়। এও কি তেমনই কোনও ব্যাপার? রজ্জুতে সর্প-ভ্রম? ততক্ষণে কিন্তু গোক্ষুরের সর্বাঙ্গের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়-গুলো অতি মাত্রায় সজাগ। হাঁটতে হাঁটতে ভালো করে কান পাতলো গোক্ষুর। যে গাছটার আড়ালে ছায়ামূর্তি সাঁত করে লুকিয়ে পড়লো, তার পাশাপাশি চলে এসেছে সে। এখন কানই তাকে আসল খবর দেবে। চোরের চোখ দুটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হলো কান। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে যাতায়াত। গেরস্তের ঘরে সিঁদ কেটে ঢুকেও কাজ সাবাড় করতে হয় নিকষ অন্ধকারের মধ্যে। কানই তখন একমাত্র সহায়। অন্ধকারে কানই সব খবরাখবর জোগাড় করে। অবিরাম শব্দ শিকার করে সাজিয়ে দেয় সামনে। গোক্ষুর কান পাতলো। এবং নিঝঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে সে পেয়ে গেল অব্যর্থ খবর। গাছের আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃশব্দে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। কফ জমে তার নাকের দুটো ছিদ্রই প্রায় বন্ধ। সে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মুখ দিয়েই ছাড়ছে। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করায়, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ উঠছে। সারা শরীর কেঁপে উঠলো গোক্ষুরের। গাছটিকে অতিক্রম করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে।

কে যাচ্ছে অত রাতে? কোথায় যাচ্ছে এমন জনহীন পথে! সে কি গোক্ষুরের শত্রুজাতীয় কেউ? ফাঁদ পেতেছে কি গোক্ষুরের ফেরার পথে? নাকি অন্য কোনও মানুষ, অন্য কোনও মতলবে—। কোঁচড়ে কালো ন্যাকড়ায় বাঁধা কাঞ্চন-বুড়ির সর্বস্ব। ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। পথ বদলে অন্য দিকে চলে যাবার কথাটা মাথায় এলো বারেকের তরে। ততক্ষণে এক তীব্র আশঙ্কা মেশানো কৌতূহলও দানা বেঁধেছে মনে। কে এই ছায়ামূর্তি, কি তার উদ্দেশ্য! ভাবতে ভাবতে এক সময় রাস্তার একেবারে কিনারে চলে এলো গোক্ষুর। ছায়ার সঙ্গে গা মিশিয়ে অন্য একটি গাছের আড়ালে মিশিয়ে দিল শরীর। নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করতে লাগলো ছায়ামূর্তির জন্য।

খানিক বাদে আবার মৃদু পায়ের আওয়াজ। গাছের আড়াল থেকে গোক্ষুর দেখলো, লোকটা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ছায়া-কালো আঁধারে গা বাঁচিয়ে। গোক্ষুর নিঃশ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল, কালো কাপড়ে বারো আনা ঢাকা মুখের মধ্যে জ্বলতে লাগলো গহ্বর-বন্দী একজোড়া চোখ।

এইমাত্র লোকটা অতিক্রম করে গেল গোক্ষুরকে। গাছের গায়ে লেপটে দাঁড়িয়েছিল গোক্ষুর। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিল বড় জোর হাত দু'তিন। দু'টি গাছের ছায়ার মধ্যে এক চিলতে ঘসা জোৎস্না। লোকটি জ্যোৎস্নায় পা রাখা মাত্রই চিনতে পারলো গোক্ষুর। নিতাই মাস্টার!

গোক্ষুরের সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলো। প্রায় বছর দু'তিন হলো, নিতাই মাস্টার এ তল্লাট-ছাড়া। ছেড়েছে বলেই বেঁচে গেছে। নইলে অ্যাদ্দিনে পুলিশ ওকে কালাপানি পার করে দিতো। নিদেন বাণেশ্বর ঘোষ লোক লাগিয়ে নিকেশ করে দিতো ওকে। এ ক'বছর কোনও খোঁজই ছিল না। ওর বউ আর একটিমাত্তর ছেলের ওপর প্রথমে শারীরিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক অবরোধ, এখন চলে মানসিক জুলুম। নিজের ঘরে চোরটি হয়ে থাকে বেচারিরা। ছেলেটা মেট্যাল স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। কুলদা ডাক্তারের মত সম্পন্ন বাড়ির ছেলেগুলো সর্বদাই ওর পেছনে লাগে। যেন দিনের বেলায় বেরিয়ে পড়া পেঁচা। কেমন যে আছে এখন, দুটি প্রাণী, কি করে যে চলছে তাদের, গোক্ষুর কিচ্ছু জানে না। সবাই শুধু বলে, পুলিশের ভয়ে মাস্টারটা গাঁ-ছাড়া হয়্যাল। বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গেছে, ভগবানকে মালুম।

গোক্ষুরও রাতে ভিতে ঘোরে আদাড়ে-বাদাড়ে, কত দূর-দুরান্তে যায় কাজের তাগিদে। কোনদিন নিতাই মাস্টারকে চোখে পড়ে নি তার। পাঁচজনে পাঁচকথা রটাতো। নিতাই মাস্টার নাকি পালিয়ে গেছে বাংলা মুলুক ছেড়ে। পুলিশ নাকি বর্ধমান জেলায় ধরেছে ওকে। ধরেই ফাটকে পুরেছে। কেউ বলে, গোপালীর জঙ্গলে পুলিশের সাথে এন্‌কাউণ্টারে মারা গেছে নাকি। বউটা যত শোনে, ততই কাঁদে। চোখের জলে ভেসে যায় বুক। নিতাই মাস্টারের খোঁজ আর মেলে নি।

আজ অ্যাদ্দিন বাদে আচমকা নিতাই মাস্টারকে এমনভাবে আবিষ্কার করে গোক্ষুরের উত্তেজনা কমছে না কিছুতেই। থানার দারোগা আর বাণেশ্বর ঘোষ যে ওকে আঁতিপাতি খুঁজছে, তা তো গোক্ষুরের জানাই। খবরটা বাণেশ্বর ঘোষকে জানালে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই ভাবতে ভাবতে ফের পা' চালালো গোক্ষুর। নিতাই মাস্টার তখন পুরোপুরি অদৃশ্য।

বাণেশ্বর ঘোষের উঠোন থেকে বেরিয়ে এসেই গোক্ষুরের মনে পড়লো, নিতাই মাস্টারের কথাটা বলা হলো না। আসলে বউয়ের চিন্তাটা ক্রমাগত কামড়াচ্ছিল বুকে। তার ওপর টাকা-পয়সা নিয়ে এমন দর কষাকষি করতে হলো, খবরটা দেবার ফুরসতই পেলো না গোক্ষুর। আর একটুখানি বসতে পারলে হয়তো বলা যেতো। কিন্তু ঐ যে, উঠোনে কার পায়ের আওয়াজ। মনটাকে চঞ্চল করে দিলে ওটাই। বাণেশ্বর ঘোষও তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিল দেড়শোটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে। মাত্তর দেড়শো টাকা! কি হবে এতে করে! লালাদের নিয়ে মোট চার ভাগ। মুল কারিগর হিসেবে গোক্ষুর পাবে ষাট, বাকি তিনজন তিরিশ করে। ষাটটি টাকা নিয়ে কি করবে গোক্ষুর? বউটাকে যদি সত্যি সত্যিই বেলদা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় তো ষাট টাকা ধুঁয়ো দিতেও কুলোবে না। সত্যি, লোকটার বিবেচনা নাই একতিল। জীবন হাতে লিয়া, কতখানি পথ উজিয়া গিয়া, কত কষ্টে নামিইলি কাজটা। কতখানি সোনা লিয়া আইসিয়া তুলিয়া দিলি লোকটার হাতে। লদর পদর বউটার অবস্থার কথাটা শুনিয়াও টুকচার ঘাই মারলো নি মনে। এরা মানুষ, না

পিচাশ ! দয়া-মমতার লেশ নাই এদের ! মোদের রাত উজাগরের টাকায় দুনিয়াদার হয়্যা বুসিয়া আছে, আর মোদের বিপদ-আপদে এদের পাশ তিল-মাত্র আশা নাই হে ! গোক্ষুরের ভীষণ কান্না পাচ্ছিল । বুক চাপড়ে কাঁদতে সাধ জাগছিল তার । বউটার মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারংবার । একটা চণ্ডাল-রাগ বাঁশ-মুগরা সাপের মতন পাক খেতে খেতে উঠছিল মগজের দিকে । সাপটা বেরিয়ে পড়তে চাইছিল হিসহিসিয়ে । ফণা ধরতে চাইছিল বাণেশ্বরের দিকে । আজীবনকাল প্রাণটি তুচ্ছ করে যা এনেছে, সব তুলে দিয়েছে লোকটার হাতে, এই তার প্রতিদান ? পার্টি আইসিয়া ঠিকই কর্চ্ছিল । ঝাণ্ডা পুঁতিয়া দিছিল সব ক'টি বেনাম জমিনে । মাছ ধরিয়া লিছিল সব ক'টি বেনাম পুকুরে । সিন্দুক ভর্তি টিপছাপ, বন্ধকী মাল সব আদায় করিয়া লিছুল লাঠির আগায় । সর্বদা ধমক দিয়া রাখছিল । কথায় কথায় মুনিষ বন্ধ । বেশ কর্চ্ছিল । যমন ঠাগুরের তেমিন পুজো, মনসা ঠাকুরকে উখুড়া ভুজা । যার যেমন ওষোধ । এদের ওষোধ ওগ্‌লাই । জব্দ ছিল এরা, যদ্দিন ছিল পার্টির শাসন । গোক্ষুর অবশ্যি তেমন করে ভেড়েনি কোনদিন পার্টিতে । নিতাই মাস্টার কতদিন মিটিং করেছে ডিহিপার পাড়ায় । লোক পাঠিয়েছে গোক্ষুরকে ডাকতে । গোক্ষুর কোনদিন এড়িয়ে গেছে কোনও অছিলায়, কোনদিন গেছেও বা । নিতাই মাস্টার অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছে গোক্ষুরকে । চুপটি করে শুনেছে গোক্ষুর । কিন্তু তেমন করে বাজে নি । আজ মনে হচ্ছে ঠিকই বলতো নিতাই মাস্টার । সার কথাটাই বলতো সে । এরা জোঁকের জাত । গরীবের রক্তে পুষ্ট । ঠিক কথা, একেবারে ঠিক কথা । গোক্ষুর নিজেকে দিয়ে আজীবন বুঝেছে সেটা । আজ একেবারে চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল । নিতাই মাস্টারের ওপর বড় রাগ বাণেশ্বর ঘোষের । নিতাই মাস্টারই ত' জব্দটি করেছিল ওকে । যদ্দিন ছিল, মাথাটি তুলতে দেয় নি । আজ তার শোধ নিতে চায় বাণেশ্বর ঘোষ । চারপাশে লোক লাগিয়েছে নিতাই মাস্টারের সন্ধানে ।

মনে হচ্ছে মেট্যাল গাঁয়েই ঢুকেছে নিতাই মাস্টার । সেঁধাতে পারে গাঁয়েরই কারো বাড়িতে, কিংবা ডিহিপার পাড়ায় । কোটালচকে নিজের ঘরেও গিয়ে ঢুকতে পারে । নিজের বউ ছেলেকে দেখতে কার না সাধ হয় ! ছেলে-বউকে ছেড়ে কতদিন বাইরে বাইরে থাকতে পারে একটা মানুষ ! এখুনি উদ্যোগ নিলে আজ রাতেই ধরা পড়ে যেতে পারে নিতাই মাস্টার । বাণেশ্বর ঘোষের একটা বহুদিনের সাধ পূরণ হতে পারে । কিন্তু বাণেশ্বর ঘোষের ওপর আজ বেজায় চটে রয়েছে গোক্ষুর । পিছু ফিরতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে । হাঁটতে লাগলো সামনে । আজ থিকে আর শালার কোনও উপকার নয় । শালা কশাই, চামার, জোঁক !

গাঁয়ের পথে পা নামিয়েই আগের চিন্তাটা ফিরে এলো মগজে । মনের মধ্যে কাঁটাটা খচখচ করতে থাকে সমানে । কে এসেছিল ঘোষের উঠোনে ? কে ? কি উদ্দেশ্য ? সহসা মাথার মধ্যে ঝাঁ করে এসে যায় ভাবনাটা ।

নিতাই মাস্টার নয়তো ? মনসা প্জোয় সাপ মরে না, লাঠি ধর। নিতাই মাস্টারের বচন। ঐ আদর্শে বিশ্বাসী সে।

বাণেশ্বর ঘোষকে উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে নিতাই মাস্টারও সক্রিয় নয় তো ভেতরে ভেতরে ? ভয়ে ভয়ে ফের কান আড়লো গোক্ষুর। উপস্থিত কোনও শব্দ পাচ্ছে না। হাঁটাটা সহসা বাড়িয়ে দিল সে।

শেষ রাতের হিমেল হাওয়া বইছে। গাঢ় হিম ঝরে পড়ছে মাথার ওপর। হাঁটতে হাঁটতে বউয়ের কথাটা ভাবছিল গোক্ষুর। সারা পথ বুঁদ হয়েছিল ঐ ভাবনায়। প্রসবটা কি হারি পিসি করাতে পেরেছে শেষমেষ ? যদি পারে তো উত্তম। নচেত গরুর গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে বেলদার হাসপাতালে। আঁধার পথে ছুটতে ছুটতে সম্ভাব্য খরচের একটা হিসেব কষতে থাকে গোক্ষুর। গাড়ি ভাড়া পড়বে বারো টাকা। হাসপাতালের আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ফল-ফুলারি ওষুধ-বিষুধ, একে দু'টাকা, তাকে পাঁচ-সিকা-ষাটটি টাকা ধোঁওয়া হয়ে উড়ে যাবে নিমেষে। ভাবতে ভাবতে মনটা তেতো হয়ে আসে গোক্ষুরের। বাণেশ্বর ঘোষের আক্কেল দেখ ! এ যুগে একটা পাঁঠী প্রসব করাইতেও বিশ টাকা খচ্চা হয়্যা যায়, এখন ষাটটি টাকায় কুন্ গাড়ুটি বুজাই ?

সকাল থেকে হারি পিসিকে কতই না অনুনয় করেছে গোক্ষুর। 'পিসি গো তুমিই ভস্সা।'

হারি পিসি খালি ভয় দেখায়, 'গতিক ভালো নয় বাপ। মনে লেয়, বাচ্চা উল্টা দিকে আছে। তুই বউকে হাসপিতালে লিয়া যা।'

'হাসপিতালে ! কি কও ?' গোক্ষুর আর্তনাদ করে ওঠে, 'লখ্নার বাপ-চুদ্দোপুরুষ কুনোদিন মায়াকে হাসপিতালে লিয়া গেছে, প্রসব করাইতে ? হাসপিতাল দেখিয়া ত' এ শালী ডরে মরিয়াবে !'

হারি পিসি গম্ভীর গলায় রায় দেয়, 'উপায় নাই বাপ। এ পস্সব সরলে হবে নি।'

শুনে গোক্ষুর অকূল-পাথারে পড়ে। এ বুড়ী কয় কী ! লখ্নার মায়া যাবে হাসপিতালে ! দুনিয়ার লোক হাসিয়া মরিয়াবে যে ! লখ্নার হইলো চিরটা কাল ঢেঁকিশালে পস্সব। বেদনাটি উঠলেই মায়া ঠাঁই লিবে ঢেঁকি-শালে। হল্দি-তেল ডলতে থাকবে তলপেটে। মুখে 'বাপ্রে মা-রে' বোল তুলবে। ঠিক টাইমে হেলতে দুলতে হাজির হবে হারি পিসি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে আগাপাস্তালা। পোয়াতির সঙ্গে খোশগল্প জুড়বে ঢেঁকির গায়ে ঠেশান দিয়ে। সময় কাটানোও বটে, গল্পসল্প বলে পোয়াতির মনখানা ভুলিয়ে রাখাও বটে। ঠিক লগনটি এলে তখন নড়ে চড়ে বসবে হারি পিসি। কাপড়-চোপড় ন্যাকড়াপাতি ডাঁই করবে হাতের পাশটিতে। গরম জলের কড়াই চাপাবে উনুনে। তারপর হরেক মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করতে থাকবে পোয়াতির ওপর। পোয়াতি চেল্লাচেল্লি বেশি করলে, তখন গাল পাড়বে,

অশ্রাব্য ভাষায়। সে সময়ে মনে ছিল নি, যখন কাণ্ডখানা বাধালু? তখন ত' রসের সায়রে লিড়িকিনির মতন ভাসতিছু! এও হারি পিসির এক চাল। পরে-পশ্চাতে ঐ নিয়ে প্রবোধ দেয়, সে সময়ে উগ্‌লান না বললে, তোর বেদ্‌না কমতো নি মা। আরো কাহিল হয়্যা পড়তু।

কালক্রমে যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকে। সারা তলপেট জুড়ে হাজার কাঁকড়া-বিছার অবিরাম দংশন। আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে থাকে পোয়াতি। সে কষ্ট চোখ মেলে দেখা দুষ্কর। কেবল হারি পিসিকেই মনে হয় ভীষণ ঠাণ্ডা আর শান্ত। পোয়াতিকে হামাগুড়ির মুদ্রায় এনে ঠাণ্ডা গলায় বলে, সহ্য কর্‌ মা। ভগমানকে ডাক। তিনিই অগতির গতি। তিনিই বাঁধ্‌ছেন্‌, তিনিই মুক্ত কর্‌বেন্‌। ডাক্‌ মা তাঁকে। জোরে জোরে ডাক্‌। বল্‌, হে বিপদভঞ্জন, দর্পোহারী, শ্রীমধুসূদন, নারায়ণ—মোকে মুক্ত কর, দয়াল-হরি—। ভগবানকে ডাকা তো দূরের কথা, হারি পিসির কথাগুলোও শোনবার মতো অবস্থা নেই পোয়াতির। প্রতি মুহূর্তে যেন প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যেতে চায়। সারা অঙ্গের সমস্ত রোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় জীবনটা। দেহের প্রতি ছিদ্রে অবিরাম ধাক্কা মারে। পোয়াতি তখন শুধু প্রাণের দায়ে কোঁত পাড়তে থাকে ফরমায়েশ মত। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কেবল একখানি মুখ ভাসতে থাকে মনের মধ্যে। ঘসা ঘসা, অস্পষ্ট। কেলি-কদমের ছায়ায় পীত-বসনে অঙ্গ ঢেকে, পা' দু'খানি আড়াআড়ি রেখে মোহন-বাঁশরী বাজিয়ে চলেছেন ব্রজের গোপাল। মাথায় শিখী-পাখার মুকুট, ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি। বাহুতে, গলায়, বনফুলের মালা। একটা অস্পষ্ট বাঁশির সুরও যেন ভেসে ভেসে আসে। ফের মিলিয়ে যায়। বোঝা যায় না মূর্তি'টা সত্যি কিনা। নাকি, সুদেব মিদ্যার রেশন দোকানের দরজায় আঁটা মূর্তি'খানিই উঠে আসে বুকের অচেনা কুঠরি থেকে? নাকি, সেই কিশোরী বয়েসে, কিষ্টোযাত্রার আসরে, আধো-ঘুমে জড়ানো চোখে দেখা সেই মূর্তি, যাকে ঘিরে গোপিনীরা গেয়ে চলেছে, '—ননীচোরা, মাখন-চোরা গোপীগণের বসন-চোরা, শ্রীরাধিকার মন চোরা, চোরা রীতি গেল না···।'

অবশেষে সেই মুহূর্ত'টি আসে। সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয় একসময়। নিথর হয়ে আসে পোয়াতি। নিঃসাড়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। লাল-তুলতুলে একটি মাংসপিণ্ড, জগতের আলো সইতে না পেরে চোখ বুজে ফেলছে বার বার। তাকে নিয়ে হারি পিসির চলতে থাকে শতেক মুদ্রা, হাজারো মুষ্টিযোগ, পোয়াতি তখন আধো-অচেতনে শুনে চলেছে এক মিষ্টি সুর, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, শিরায়-শিরায়।

নিজের বউয়ের ক্ষেত্রেও এগুলোই ঘটবে নির্ধারিত দিনে, এমন আশাই করে এসেছে গোক্ষুর। কিন্তু হারি পিসির আজ সকালের কথাগুলো শোনা অবধি বুকের মধ্যে অচেনা গুরগুরানি। তলপেটে যেন নারকেল কোরা চলছে অবিরাম। আসলে বউটার গায়ে জোর বলতে তো একতিল নেই। চোখের কোটরে পোয়াটাক চাল ঢুকে যাবে। সারা অঙ্গে সিঁটা পড়া রক্ত

শূন্যতা। হারি পিসির কথাগুলো তাই বেশি করে ভাবনা বাড়ায় বুকে। পুয়াতির গায়ে জোর না থাকলে তাকে বাঁচায়, কার সাধ্যি? কোঁত পাড়তে পাড়তে একটিবার থামিয়া গেলেই সে মল্ল!

বউয়ের এমন সংকটকালে রাতের কাজে না বেরোলেই ভালো হতো।' পথ চলতে চলতে এক ধরনের অপরাধবোধ নিঃশব্দে কুরে খেতে থাকে গোক্ষুরকে। এক্ষুণি কাজটাতে হাত দেবার ইচ্ছেও ছিল না গোক্ষুরের। কিন্তু বাণেশ্বর ঘোষ তাড়া লাগাতে লাগলো সমানে। 'ও গোখরা, দ্যাখ্না একটিবার, বউর্পার কাঞ্চন-বুড়ির বাখুলটা। দেখি, কেমন মরদ তুই। শালি রাজ্যের সোনাদানা জমা করিয়া রাখছে জীবনভর। নিপুত্রক বুড়ি। উ মরিয়ালে, এসব কে ভোগ করবে র‍্যা?'

'দাঁড়াও ঘোষদা।' গোক্ষুর ওকে আশ্বস্ত করে, 'বউটা আগে বিয়াউ। একদম ফুরফুর‍্যাটি হয়্যা কাজে নামবো। একেবারে লদর-পদর ত', এখন রাতে-বিরাতে ঘরের বাইরে রইলে মনটা খালি ছমক-ছমক করতে থাকে।'

'শালা মোর, কি বৌ-সুহাগী রে!' বাণেশ্বর ঘোষের গলা থেকে বিষ-বিদ্রূপ ঝরে পড়ে, 'বউ বিয়াবে, সেই কারণে কে কাজ-কাম বন্ধ রাখে রে শালা? আর কারো বউ বিয়ায় না এ দুনিয়ায়?'

আপনমনে গজগজ করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ, 'কুনোদিন শুনবি, তাবত সোনা-দানা বুড়ি রাখিয়া দিছে নারানগড়ের ব্যাঙ্কে। কিংবা ঝাঁ করিয়া উড়িয়া আস্সে অর কাগের মতন ধুমসি ঝি-টা। তাবত গহনা ঠোঁটে লিয়া ঝাঁ করিয়া উড়িয়া গেছে। তখন আমড়া চুষবি শালা।'

বাণেশ্বর ঘোষের হাজার চাপেও নিজেকে সংযত রেখেছিল গোক্ষুর। একটি দিনের তরেও রাত-বিরেতে বেরোয় নি আজ দু' হপ্তা। কিন্তু বউ আর হারির পিসিই সমস্ত হিসেব ওলোট-পালট করে দিল। গত পরশু বিকেল থেকে বউয়ের বেদনাটা ক্রমাগত বাড়তে লাগলো এবং কাল সকাল নাগাদ হারি পিসি উচ্চারণ করলো কথাটা, 'কেস জটিল। হাসপিতালে না লিয়া গেলে প্রসব হবে নি।'

গোক্ষুরের হাতে তখন একটিও ছ্যাদাম নাই। আগল বাগল হয়ে সে সারা সকাল ঋণ-কর্জ খুঁজলো পৈটের লোকদের কাছে। কিন্তু না, গোক্ষুরের হাজার উপরোধেও টললো না কেউ। হাতটি উপুড় করলো না।

বাণেশ্বর ঘোষ দিল মোক্ষম বুদ্ধি, 'তুই কাঞ্চন-বুড়ির ঘরটা লে আইজ। বড়বাবুও আইজ থানার বাইরে রইবন্। মোর দোরে খানা-পিনা সারিয়া তিনি কখন ফিরবন্ ঠিক নাই। আইজই মোক্ষম রাইত।'

· গোক্ষুর দোনোমনো করছিল।

তাই দেখে আরো উস্কায় বাণেশ্বর ঘোষ, 'আরে দু'এক ঘণ্টার ব্যাপার তো। কিন্তু যা পাবি, তোর বউয়ের দশবারের প্রসব খচ্চা উঠিয়াবে।'

কথাটাকে নাচাতে নাচাতে দুপুর গড়িয়ে ঘরে ফেরে গোক্ষুর। হারি-পিসি তখনো যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চোখ-মুখ ভীষণ থমথমে।

বললো, 'মুই কিন্তু ভালা বুঝিছি নি, বাপ। এ মায়ার বেথা একবার উঠে, ফের কমিয়া যায়। আইজ পস্‌সব্‌ হবে বলিয়া মনে হুচ্ছে নি।'

তখনি ঠিক করে ফেলেছিল গোক্ষুর। সন্ধ্যের মধ্যে টাকা জোগাড় না হলে, আজ রাতেই কাঞ্চন-বুড়ির কেসটা নামাবে সে। কিন্তু অত কাণ্ড করে হলোটা কি ? ... পাওয়া গেল, তাতে হাসপাতালের খরচটুকু উঠবে কিনা সন্দেহ।

পূব আকাশ ধূয়া হয়ে আসছে। একটু বাদেই আঁধার কেটে ভোর হবে। শেষ রাতের হিমেল হাওয়া বইছে। গোক্ষুর পা চালিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

ঢেঁকিশালে টিমটিমিয়ে কুপি জ্বলছে। মেঝের ওপর ন্যাতা হয়ে শুয়ে রয়েছে বউ। হারি পিসি ঢেঁকির গায়ে ঠেস দিয়ে পাথরের মত বসে রয়েছে।

দূর থেকে পুরো দৃশ্যখানি দেখলো গোক্ষুর! আচমকা বুকখানা ছ্যাঁত করে উঠলো তার। দৌড়ে গেল ঢেঁকিশালের কাছে। এবং চোখের সুমুখে যে দৃশ্যখানা দেখলো, তাতে ওর পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ে রয়েছে বউ। গায়ে কাপড়-চোপড়ের লেশমাত্র নেই। নিষ্পলক চোখদুটো আঁধার ফুঁড়ে হারিয়ে গেছে কোথায়, কত দূরে! দু'পায়েব মধ্যিখানে নারকেল মালার মত গোল মুণ্ডু নিথর হয়ে গেছে।

সহসা মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো গোক্ষুরের। তলপেট গুলিয়ে আকণ্ঠ বমি পেল। ধীরে ধীরে বউয়ের পাশটিতে এসে উবু হয়ে বসলো সে। উলঙ্গ দেহখানা আলতো ছুঁলো। ঠাণ্ডা কাঠের মত শক্ত শরীর। অল্প নাড়া খেয়েই লুটিয়ে পড়লো পাশে।

বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো গোক্ষুর। নিজের ছাতিতে দমাদ্দম কিল মারতে লাগলো। শক্ত লাশখানাকে ধরে পাগলের মত ঝাঁকাতে লাগলো অবিরাম।

হারি পিসি পাথরের মত বসেছিল এতক্ষণ। ভাবলেশহীন চোখ। বুকের মধ্যে একরাশ জমাট কষ্ট। গোক্ষুরের বউটাকে মেয়ের মত ভালোবাসতো সে। ধীরে ধীরে চোখের পাতানি পড়তে লাগলো হারি পিসির। দু'চোখের কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। নিজের হাতখানি গোক্ষুরের পিঠের ওপর আলতো রাখলো সে।

ধরা গলায় বললো, 'মাঝরাতের পর থেকেই চোখের পাতানি উল্টিয়া যাইত্তে লাগল। তুই যে কুথা গেছু, জানি নি। কাকে ডাকি, কি করি! আন্দাজে ভর করিয়া শেষ রাতে গেলি বাণেশবর ঘোষের দুয়ারে। সেখানেও তোর সাড়াশব্দ নাই। মা-কালীর থানে মাথা খুঁড়লি খানিক। ফিরিয়া আইসিয়া দেখি, উল্টিয়া পড়িয়া আছে। সারা শরীর কাঠ।'

বউকে ছেড়ে আচমকা হারিপিসিকে জড়িয়ে ধরলো গোক্ষুর, 'ও হারি পিসি,

মোর তাকে তুমি কুথা পাঠিয়া দিল-অ গো— । হায়, সে বিহনে যে মোর তি-ভবন আঁধার গো— । হায়, মুই আর কার তরে চুরি কত্তে যাবো গো— ।

হারি পিসি প্রাণপণে জাপটে রাখে গোক্ষুরকে । হাত দিয়ে সজোরে চেপে ধরে মুখ । চোপ । চোপ্ মার্ । কে কুথা শুনিয়া ফেলবে, সর্বনাশ হয়্যাবে তোর ।

হারি পিসির কথা কানে সেঁধায় না গোক্ষুরের । সে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে আর অনর্গল বলতে থাকে তার মরা বউয়ের হাজারো গুণের কথা ।

॥ চার ॥

সময়টা ভারি খারাপ যাচ্ছে বাণেশ্বর ঘোষের ।

নানান ঝক্কি-ঝামেলায় একেবারে জেরবার । শালা, এ দুনিয়াটা ভদ্দর-লোকের বসবাসের অযোগ্য হইয়া উঠ্‌ল দিনদিন । দলের থানা কমিটির প্রেসিডেণ্টের পদটা অ্যাদ্দিন বাঁধা ছিল । আচমকা চলে গেল সেটা । চাতরিভাড়ার কানু সাঁতরা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল পদখানা । একদিন জেলা কমিটি থেকে এলো প্রমোদ দত্ত । ডেকে পাঠালো বাণেশ্বরকে ।

এ কথা সে কথার পর ইনিয়ে-বিনিয়ে পাড়লো কথাটা । পদত্যাগ করতে হবে । হাই কমাণ্ডের নির্দেশ । এক পদে একজনের মৌরসী পাট্টা চলবে নি । দলের মধ্যে কথা উঠছে । শালা, কথা উঠছে ? আজ তিরিশ বচ্ছর নারাণগড় থানায় দলটাকে বুকে করিয়া আগুলিয়া রাখলাম । সাতষট্টি-আটষট্টি-উনসত্তর-সত্তর,—কত লাথি-ঝাঁটা খাইলাম, কত লতি-লাঞ্ছনা সইলাম, তখন কথা ছিল তুমাদের কুনু সাঁতরা ? সুখের পায়রাগুলি এখন সুদিনে এসে একে একে ঠাঁই লিচ্ছে ঘরের চালে । এখন আমরা সব পচিয়ালি ! দুনিয়ার বিচার দ্যাখো হে । ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনও মুল্য নাই এ যুগে ।

প্রমোদ দত্ত পুলটিস মারে, 'ভাববেন না । আপনার জন্য অন্য কিছু ভাবা হচ্ছে । আরো বড় কিছু । ঠিক সময়ে জানতে পারবেন ।'

দলের মধ্যে যারা শুভার্থী, বললো, 'মানিয়া লউন ঘোষদা । দিনকাল খ্যারাব । জরুরী অবস্থা চলছে দেশে । বহুত জোতদারকে আটকানো হচ্ছে 'মিসা'য় । জলে বাস করিয়া কুমীরের সাথে রণ, ভালো না ।'

দু'দিন বাদেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে বাণেশ্বর ঘোষ । সেই থেকে মনটা ভালো নেই ।

এদিকে হয়েছে আরো এক ঝামেলা । ছোট ভাই রামেশ্বরের মেয়েটা ওর মায়ের সঙ্গে থাকতো মামাবাড়ি কুশমণ্ডীতে । বেলদা বাজার থেকে মাইল দুই উত্তরে কুশমণ্ডী । রামেশ্বর খুন হবার পর অ্যাদ্দিন সাড়া-শব্দ ছিল

না। আচমকা এসে জিগির তুলেছে, আমার সম্পত্তি দিয়া দও জ্যাঠা। আমি সব বিকিয়া দুবো। এখানে আর এক কাঠাও রাখবো নি। ঐ দিয়া বেলদা বাজারে ঘর করবো।'

নিজের ভাইয়ের রক্তে জাত, সেও, সেও পাখনা গজাতেই নিজ মূর্তি ধরেছে হে! থো, থোহ্। ঘোর কলি। ধর্মের মহিমা লোপ পাচ্ছে ক্রমশ। আসলে মেয়েটাকে ওর মামারাই নাচাচ্ছে। নিজেরা তো ফেঁসে আছে ভগ্নী-পতিকে খুন করবার কেসে। নিস্তার পাওয়ার কোনও আশা নেই বাছাদের। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা সব মজুত আছে কাঠগোড়ায় উঠবার জন্য। কেবল সাক্ষীর দিনটাই পড়তে যা বাকি। সেই জ্বলুনীর শোধ তুলতে ভাগ্নীটাকে লেলিয়ে দিচ্ছে বাণেশ্বরের দিকে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার মতলব। আর, এ এক হয়েছে বটে সদর কাচারি। শালা, একটা কেসেরও নিষ্পত্তি হয় না! খালি দিন পড়ে। খালি হাজিরা। উকিল-মুক্তার আর মুহুরিরা টাকা লুটছে দশ হাতে। কণ্ঠা চিরে রক্ত বার করা টাকা, লুটিয়া লিচ্ছে দশভূতে। কি আর করা যাবে! অন্য কেস যা হয় তা হোক, অন্তত খুনের কেসটা যদি কোনও গতিকে জলদি নিষ্পত্তি হতো! তাও টুকচার মনের ডাঁপনটা কমতো বাণেশ্বরের। পাষণ্ডগুলো যদি উপযুক্ত সাজা পেতো, তাহলে অন্তত উপরে আঙুল তুলে ভাইটাকে বলা যেতো, দ্যাখ্ ভাই, দেখিয়া লে, তোকে যারা সম্পত্তির লোভে খুন কল্ল, তোর দাদা হয়্যা তাদেরকে ছাড়ি নি মুই। তা নয়, শুধু তারিখে তারিখে গুচ্ছের টাকার শ্রাদ্ধ। অত ঠ্যাক্না পাছায় লিয়া বাঁচতে পারে মানুষ?

বাণেশ্বর ঘোষের ছোট ভাই রামেশ্বর। কুশমণ্ডীর পালদের বাড়িতে বিয়ে করেছিল সে। একটি মেয়েও হয়েছিল। মেয়ের যখন বছর দুয়েক বয়েস, তখনি সহসা মিলিটারিতে চলে গেল রামেশ্বর। প্রথম দিকে চিঠিপত্র আসতো। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। শ্বশুর বংশ ছিল যথেষ্ট বড়লোক। বেলদা বাজারে বিরাট বাড়ি, কাপড়ের ব্যবসা। শালাগুলোও শিক্ষিত। রামেশ্বরের বউ আর মেয়েকে তারাই নিয়ে গিয়ে রাখলো কাছে। মা-মেয়েতে সেই থেকে বাপের বাড়িতেই থাকতো। পৈতৃক জমিজমা সবই ভোগ-দখল করতো বাণেশ্বর ঘোষ। এই নিয়ে কোনদিন উচ্চবাচ্য করেনি রামেশ্বরের স্ত্রী কিংবা শ্বশুর-শালারা। মানুষটাই চলিয়া গেল কুন্ দেশে, তার ঠিক নাই ক'। তাব জমিন জায়গা লিয়া কি হবে? মোদের যা আছে, ঝি আর লাত্নির চাট্টি ভাত জুটিয়াবে।

কোন্ কোন্ মুলুক ঘুরে, বছর ষোল বাদে একদিন ঘরে ফিরলো রামেশ্বর। তখন সে গুরুতর অসুস্থ। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। একটি হাত কাটা গেছে যুদ্ধে। সারা গায়ে চাকা-চাকা দাগ আর দুর্গন্ধ। সবাই বললো, মিলিটারিতে স্ত্রী-বিহনে অনেকেই অবৈধ নারী-সঙ্গম কিংবা অন্য উপায়ে যৌন সংসর্গ করে থাকে। পরিণামে শরীরে ঢোকে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ। রামেশ্বর ঘোষের সেটাই হয়েছে।

দুই ভাইয়ের ভিটে আলাদা করে গিয়েছিল বাপ দুয়ারী ঘোষ। রামেশ্বর তার ভিটেয় গড়লো একটি টালির ঘর। বউ-মেয়ে খবর পেয়ে এসেছিল। কাউকে কাছে ভিড়তে দেয়নি রামেশ্বর। বলেছে, আজীবন যখন সংসার বিহনে কাটালাম, এই শেষ পহরে তুমাদের বিপদে ফেলিয়া কি হবে? বেশি দিন তো বাঁচবো নি। শুধু-মুদু আমার শরীরের রক্তবীজ তুমাদের শরীরে আর ঢুকে ক্যানে? বউ-মেয়ে অনেক সাধ্য সাধনা করে, অবশেষে ফিরে গেছে কুশমুণ্ডিতে। নিজের অংশের জমি-জিরেতের দখল নিয়েছে রামেশ্বর ঘোষ। ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ করায়। ফসল বেচে এক অংশ পাঠিয়ে দেয় বউ মেয়ের কাছে। বাকি দিয়ে নিজের ভরণ-পোষণ চালায়।

কিছুদিনের মধ্যেই রামেশ্বরকে নিয়ে নানান কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো গাঁয়ে। ও নাকি অঢেল সোনা-দানা এনেছে সঙ্গে। এক টিন সোনার বিস্কুট। নিজের শোবার ঘরটিতে কাউকে কোনও দিনও ঢুকতে দিতো না রামেশ্বর ঘোষ। সর্বদাই ঐ ঘরটিকে এক রহস্যের জালে জড়িয়ে রেখেছিল।

বাণেশ্বর ঘোষ অনেক ভাবেই ভাইয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল। মেদিনীপুরের বিলাত-ফেরত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বারংবার। রাজি হয়নি রামেশ্বর। নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চাইতো সর্বদা। প্রায় কারো সঙ্গেই কথাবার্তা কইতো না। সারাদিন ঘরের মধ্যেই শুয়ে থাকতো। কেউ দেখা করতে গেলে সারাক্ষণ গাঢ় সন্দেহ নিয়ে দেখতো ওকে। একটা সময় এলো, যখন, তার কোনও খোঁজই রাখতো না গাঁয়ের লোক। কেবল মাঝে মাঝে কুশমুণ্ডি থেকে শালারা এসে কি এক অজানা কারণে হম্বি-তম্বি করে যেতো।

এমনি করেই বছর তিনেক ছিল রামেশ্বর ঘোষ। একদিন অমাবস্যার রাতে আচমকা খুন হয়ে গেল সে। কে বা কারা এসে রাতের আঁধারে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারলো। শোকে-তাপে ওর বউটাও হার্ট-ফেল করে মরলো মাস দুই বাদে।

যতই হোক মায়ের পেটের ভাই তো। তার অমন শোচনীয় মৃত্যুতে বাণেশ্বর ঘোষের কঠিন প্রাণও ভেঙে পড়লো। প্রবল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো সে। ঐ অবস্থায় ভাইয়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করলো বেশ ঘটা করেই।

খুনের কিনারা হয়তো কোনও দিনই হতো না, যদি গাঁয়ের নিশি কামার একটা লাখ টাকা দামের তথ্য না দিতো। ঐ রাতে সে তার মেয়ের বাড়ি কোটালচক থেকে ফিরছিল। রাত তখন আন্দাজ বারোটা-একটা। রামেশ্বর ঘোষের বাড়ির সামনাসামনি হতেই আচমকা জনা চারেক লোককে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে দেখলো রামেশ্বরের বাড়ি থেকে। ঝলাক করে টর্চ টিপলো নিশি কামার। এবং দেখলো, রামেশ্বরের দুই শালা, সঙ্গে আরো অচেনা দু'জন।

শোনামাত্রই থানায় ডায়েরি করলো বাণেশ্বর ঘোষ। কেস শুরু হলো। রামেশ্বরের দু'শালা গ্রেপ্তার হলো। জেল-হাজতে রইলো দু'মাস। এখন

জামিনে আছে। কেস চলছে। সাক্ষী-সাবুদও তৈরী। সবই ঠিক-ঠাক চলছে। শুধু একটাই দুঃখ বাণেশ্বর ঘোষের। কেসটার নিষ্পত্তি হচ্ছে না কিছুতেই।

দুঃখ আরো আছে বাণেশ্বরের। ইদানীং আবার এক ঠাট জুড়েছে মালতী। পাশটিতে ভিড়তে দেয় না। নানান অজুহাত তার। আজ গায়ে বেথা, কাল মাথার যন্ত্রনা, পরশু ঠুনকো পেকেছে, হাজার বাহানা।

একান্তে কত করে বোঝায় বাণেশ্বর, 'ও মালতী, ও মোর মালতীলতা, অমন ছাতিতে পা দু'টা রাখিস নি। ঠুনকো কি কারো পাকে না রে? মোর অবস্থাখানা একটিবার বুঝ্।'

শুনে মাগী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'পরের বউ বলিয়া কি তার উপর টুকে দয়া-ধর্ম রইতে নাই? খালি ননী-মাখমটি হামুলিয়া খাইতে চায় মোর ননীচোরা! দূর হ।'

হামলে পড়ে তাকে বোঝায় বাণেশ্বর ঘোষ, 'ও মালতী, অবুঝ হস্ নি। মায়া-মাইনষের অত অল্পে হেদিয়া পড়লে চলে রে? মায়া-মাইনষের জীবন হইলো কইমাছের জীবন। অমন লবংলতার মতন পলকা হইলে কি চলে? ও মালতী!'

মায়া যেদি বলে, মুই বুঝবো নি, তেবে স্বয়ং বিধাতাও তাকে বুঝ দিতে অপারগ। কাজেই মনের খেদ মনেই চেপে থাকতে হয়।

মাঝে মাঝে অক্ষম আক্রোশে গর্জাতে থাকে বাণেশ্বর। দাঁড়া, মাগী, তোর দেমাক ভাঙিয়া চোদ্দ আনা কচ্ছি। শালা, কলিকাল! মায়া-মানুষ একটা শক্তপোক্ত ঠাঁই ধরতে চায়, এ হোল দুনিয়ার নিয়ম। কোথা শক্ত গুঁড়িতে এসে সর্বক্ষণ শিং ঘসবি, লেপ্‌টিয়া রইবি গাছের সাথে লতার মতন, তা নয়, এমন ভাবখানা দেখাচ্ছু, যেন জীবনটা মোর ধন্য করিয়া দিচ্ছু। তোর কপাল ভালো যে, বাণেশ্বর ঘোষের মত মনিষ্যি তোর পাশ আনাগোনা করে।

গোখরাটা আবার আজ দিনকতক ফিটকে বেড়াচ্ছে। ঐ যে রাতে ওর বউটা মরলো প্রসব করতে গিয়ে, ঐ থেকে কি যে হয়েছে ওর! পাশটি ভিড়তে চাইছে না। কানাঘুষায় নানা কথা শুনতে পায় বাণেশ্বর ঘোষ। চুরি-চামারি নাকি আর করবে না ও। বউটা মরে নাকি বেজায় দাগা দিয়ে গেছে। শুনতে শুনতে গা জ্বলে যায় বাণেশ্বরের। ইচ্ছে করে মাড়োতলায় টাঙিয়ে জুতো পেটা করে। শালা, বিড়াল বলে মাছ খাবো নি, আঁশ ছুঁবো নি, কাশী যাবো!

হপ্তাতিনেক আগে কোটালচকের জলায় আচমকা মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল গোক্ষুর ভক্তা। দূর থেকে বাণেশ্বরকে দেখেই গা-আড়াল দিতে চাইছিল। বাণেশ্বরই হাত তুলে থামালো। চারপাশটা নির্জন। একদিকে পণ্ডাদের বিশাল বাঁশঝাড়ের আড়াল। অন্যদিকে কুন্তিদীঘির উঁচু পাড়।

ঈষৎ রুষ্ট গলায় বাণেশ্বর ঘোষ শুধোয়, 'কি রে? দেখা নাই যে বড়?'

গোক্ষুর কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। ইনিয়ে বিনিয়ে নানান্ কথা বলে এড়িয়ে যেতে চায়। বলে, 'কোমরে একটা খ্যাচ্‌কা লাগ্‌ছল কাঞ্চন বুড়ির ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়া। সেটা সারে নি এখনতক্ক।'

শুনে দাত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'তুই শালা মায়ারও অধম। কোমরে খ্যাচকা বলিয়া নিজের পেশা ছাড়ছে কে কবে? শুন্—' গোক্ষুরের দিকে একটুখানি সরে আসে বাণেশ্বর ঘোষ, 'যমুনার অঘোর দে'র ঘরটা লিতে হবে তোকে। জলদি।'

গোক্ষুর চমকে ওঠে, 'সে কি দাদা? সেটা তুমার ঝি'র ঘর। অঘোর দে তুমার বিয়াই যে।'

'থাম্। অমন বিয়াইর মুহে পিসাব করি মুই।' বাণেশ্বর ঘোষ খিঁচিয়ে ওঠে, 'শালা চশমখোর, মোর ঝি' রাখীর গা'র রংটা টুকে চাপা বলিয়া, চাপ দিয়া বিশ ভরি সোনা আদায় করিয়া লিছে। তা বাদে, টাকার বড় দেমাক হইচ্চে শালার। মোর রাখীকে উঠতে বসতে খোঁটা দেয়।'

গোক্ষুরের দু'চোখে সীমাহীন বিস্ময়। নির্বাক দাঁড়িয়ে মাটিতে আঁকচিরা কাটতে থাকে। এক সময় বলে, 'দেখি।'

'দেখি! এ আবার কি ধরনের কথা?' সাপের মত হিসিয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'শুন্ গোখরা, মুই এক কথার লোক। অঘোর দে'র ঘরটা তুই সাত দিনের মধ্যে লিবি। লচেত কথা খারাপ হবে।'

ডান হাতে মালা ঠক্‌ঠকিয়ে মজুর পাড়ার দিকে চলে যায় বাণেশ্বর। গোক্ষুর ধরে নিজের পথ।

তখনও বোঝা যায় নি। কিন্তু গোক্ষুর নামে লোকটির সাহস যে ধীরে ধীরে কতদূর বেড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন দু'হপ্তার মধ্যেও সে কাজটাতে নামলোই না।

দ্বিতীয়বার বাড়িতে ডেকে পাঠাতে, এলো। এবং অম্লান বদনে বললো, 'অর চুরি-চামারি করতে ভালো লাগছে নি ঘোষদা। মোকে তুমি ছাড়। অন্য কারিগর দেখ।'

বাণেশ্বর ঘোষ তো তাজ্জব। নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বেস করতে না সে। না, ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। সমাজ-সংসারের বিপরীত নিয়ম এটা। ধোবা কাপড় কাচবে নি, নাপিত নখ-চুল কাটবে নি, গোয়ালা দুধ বিকবে নি, লধবা চুরি করবে নি, সমাজ-সংসার তা'লে চলবে কি করিয়া? কথায় বলে, লধবা চোর, লধবার গুষ্টি চোর, লধবার পাদ্‌টি চোর। সেই লধবা কয় কিনা, মুই আর চুরি করবো নি! কি সব দিনকাল আইল হে? কুন্‌দিন শুনবো, জল বলছে, মুই উজানে বইবো। সূর্যদেব বলছেন, মুই পচ্ছিমে উদয় হবো। নাহ্। ব্যাপারটাকে আর তুচ্ছ করা যায় না। কাল নারাণগড়ের হাট। থানা কমিটির মিটিংও আছে। মিটিং-এর পর একটিবার থানায় যাইতে হবে কাল। বড়বাবুকে সব খুলিয়া বলতে হবে। এটা তো তাঁরও মাথা ব্যথা। লধবার বাচ্চা চুরি ছাড়িয়া খাটা-বাটা ধরছে

এটা তাঁরও জানা দরকার। ঠিক সময়ে খবরটি না দিলে, শেষে তিনি দুষবেন বাণেশ্বর ঘোষকেই।

দু'পহর বেলায় হাঁটছিল বাণেশ্বর ঘোষ। জপের ঝুলিতে আগুন নাচছিল অবিরাম। মনে মনে ভাবছিল হরেক ভাবনা। ধান কাটা শুরু হয়েছে সবে। দাদার জমি নিয়ে প্রায় দেড়শো বিঘের চাষী সে। ফি-মরসুমে পাকা ফসল ঘরে তুলতে জিভ বেরিয়ে যায়। দ্বিগুণ মুনিষ-মাইন্দার লাগিয়েও ফাঁকা জমিনে ফসল পড়ে থাকে। লোধাগুলোর তখন পোয়া বারো। ক্ষেতের ধান রাতের আঁধারে পা দিয়ে মলে নিতে জুড়ি নেই ওদের। এমন নিপুণ সে কৌশল, আঁটিতে যদি একটি ধান অবশিষ্ট থাকে! মাঠে মাঠে বাণেশ্বর ঘোষের মাইন্দাররা রাত-জাগুয়া হয়ে পাহারা দেয়। তাও কাঠা দশেক জমিনের ধান মলে নিয়ে গেছে শালারা। শালা, মরসুমের শুরুতেই এই! এবারে অর্ধেক ফসল ঘরে পৌঁছুলে হয়। খবর শুনেই হনহনিয়ে হাঁটা দিয়েছে বাণেশ্বর ঘোষ। আগুন জ্বলার মাঠে।

আঘ্রাণে রোদের তেজ কম। তাও বাণেশ্বরের থলথলে শরীরের খাঁজে খাঁজে ঘাম জমছে। যেদিকে দু'চোখ যায় হলুদ ধানের ক্ষেত। ফসলটা ভালোই হয়েছে এবারে। তবে পুরোপুরি ঘরে উঠলে হয়। যা শুরু করেছে শালারা! তাছাড়া শোনা যাচ্ছে, আচমকা মজুর ধর্মঘট করবার ষড়যন্ত্র আঁটছে শালারা। অস্ত্র শানাচ্ছে গোপনে। নিতাই মাস্টার তো বহুদিন এলাকা ছাড়া। কে তবে ওষুধখানা ঘুঁটছে। নাটকের মূল গায়েনটি তবে কে?

হাঁটতে হাঁটতে আচমকা বাণেশ্বরের চোখ দু'টো আটকে গেল ডাইনে। দু'তিন খানা বন্দের পরে পলাশ গাছের তলায় জাঁকিয়ে বসেছে নিশি কামার আর শ্যাম চক্রবর্তী। খুব মশগুল হয়ে কথাবার্তা বলছে। হুঁশ নেই কোনও দিকে। দৃশ্যখানা বাণেশ্বরকে বড় ভাবায়। নিশি কামার বাণেশ্বরের ভাইয়ের খুনের কেসের প্রধান সাক্ষী। প্রত্যক্ষদর্শী সে। শ্যাম চক্রবর্তীর মত একটা গোলমেলে লোকের সঙ্গে তার অত কিসের গুজুর গজুর?

কোটালচকের শ্যাম চক্রবর্তী। বাপ বিপিন চক্রবর্তী ছিল এলাকার নাম করা গুণীন। লোকে বলতো, সে নাকি ছিল তন্ত্র-সিদ্ধ পুরুষ। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ ওরা। পুজো-পাঠের বদলে গুপ্তবিদ্যায় অধিক পারঙ্গম। সম্মোহন, উচাটন, বশীকরণ, তন্ত্রে-মন্ত্রে ওস্তাদ ছিল বিপিন চক্রবর্তী। জল-চিকিৎসা, ডাকিনীতন্ত্র সর্প বিদ্যায় ও ছিল পারদর্শী। এলাকার লোক ভয় পেতো ওকে। ও নাকি তন্ত্রসম্মত উপায়ে 'বীর' রেখেছিল।

শ্যাম চক্রবর্তী বাপের কাছে কিছু কিছু শিখেছিল সে সব বিদ্যা। এখনো বাচ্চার গায়ে 'কু' হাওয়া লাগলে, গরুর দুধ বন্ধ হয়ে গেলে, কাউকে ভূতে ধরলে, সাপে কাটলে, ডাক পড়ে শ্যাম চক্রবর্তীর। পোয়াতি বউয়ের গা বন্ধ করায় নাকি তার জুড়ি নেই। সে জল মন্ত্রিয়ে দিলে, ঐ জলে কলেরা, ডায়েরিয়া, পিত্তশূল—মন্ত্রের মত সেরে যায়। তবে সাধারণভাবে এসবের

জন্য ইদানীং ডাক্তারের কাছেই যায় লোকে। শ্যাম চক্রবর্তী লোধাদের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে তার পিতৃদত্ত বিদ্যেটি।

এক গাদা কাচ্চা-বাচ্চা শ্যামের। জমি-জায়গা তিন-চার বিঘের বেশি নয়। খেতে দিতে পারে না বউ-ছেলেদের। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ বলে কোনও বর্ণহিন্দু তাকে যজমান হিসেবে নিয়োগ করে না। বাধ্য হয়ে সে লোধাদের যজমানী করে পেট চালায়। এমন ঘটনা ঘটেনি এতদঞ্চলে। এমন কি ওর বাপ বিপিন চক্রবর্তীও হাজার অনটনে কোনও নীচু জাতকে যজাতে যায় নি। তাজ্জব বনে যায় মেট্যাল-যমুনার বামুনকুল। তারা অবিলম্বে 'সমাজ' ডাকে। সে বৈঠকে শ্যাম চক্রবর্তীকেও ডাকা হয়। শ্যামের জন্য পৃথক আসনের বরাদ্দ করা হয়। সারা বেঠকে শ্যাম চক্রবর্তী একবারের তরেও তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে নি। ক্ষমা ভিক্ষাও করে নি বিচারপতিদের কাছে। বরং সারাক্ষণ সে এই কথাটাই বলে গেছে যে, পুরোহিত প্রথায় তার এমনিতে কোনও বিশ্বেস নেই। সব বামুনই পেশা হিসেবে এটাকে নেয়। সেও নিয়েছে। দোকানদার যেমন মাল বিক্রির ক্ষেত্রে জাত-ধর্ম দেখে না, মূল্য পেলেই মাল বেচে, পৌরহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই।

জ্যোতিষ পাণ্ডা প্রবীন ব্যক্তি। এ তল্লাটে ব্রাহ্মণ সমাজের মাথা। রাগের চোটে শ্যামকে খড়ম নিয়ে তাড়া করে সে। শালা গর্ভস্রাব, পৌরহিত্য একটা ব্যবসা? অমন কথা কইলু তুই? ঈশ্বর-সাধনার কি বুঝু রে পাষণ্ড?

শান্ত গলায় জবাব দেয় শ্যাম, 'ঈশ্বর-সাধনা অন্য চিজ। যে করে, সে নিজেই করে। তার তরে পুরোহিতের দরকার হয় না।' বাগ বিতণ্ডা গড়িয়ে চলে অনেক রাত অবধি। শেষ মেষ সাব্যস্ত হয়, শ্যাম চক্রবর্তীকে সমাজে 'বন্ধ' করা হবে।

সেই থেকে ব্রাহ্মণ সমাজে বন্ধ ছিল শ্যাম চক্রবর্তী। ব্রাহ্মণদের কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে সে নেমন্তন্ন পেতো না। গ্রামের কোনও উৎসবে-পার্বণে শ্যামকে ডাকলে, সে বাড়িতে অন্য ব্রাহ্মণরা পাত পাড়তো না। এই ব্যবস্থা বহাল ছিল সাতষট্টি অবধি। শ্যাম চক্রবর্তী তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে নি ওসবে। সে চুটিয়ে যজমানী করতো লোধাদের গ্রামে। যমুনা, পারিজাতপুর, খেজুরকুটি, মাকুর্ল্যা, ডিহিপার, রাংটিয়া, বীরকাঁড়—সর্বত্র, লোধা সমাজে তার যজমানী চলতো। তা বাদে, বাপের কাছে শেখা তন্ত্রমন্ত্রগুলোও সে প্রয়োগ করতো লোধাদের পাড়ায়। ওর প্রতি এক অন্ধবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল লোধা সম্প্রদায়ের। টাকা-পয়সা যে খুব বেশী আয় হতো, তা নয়। দু'চার পয়সা নগদে, তা বাদে কলাটা, মুলোটা, জঙ্গলের কাঠ, ফল-ফুলারি, মধু—এসব দিয়েই তারা শোধ করতো শ্যামের যজমানীর মূল্য।

সাতষট্টিতে অবস্থা বদলালো। নিতাই মাস্টাররা এলো শাসনে। তাদের নির্দেশমতো গাঁয়ের বহু লোক কাজে-কর্মে ডাকতে লাগলো শ্যামকে, ইচ্ছেয় কিংবা অনিচ্ছেয়। ব্রাহ্মণের দলও যুগের ভাবগতিক বুঝে ফেলেছে ততদিনে।

খুব একটা উচ্চ-বাচ্য করলো না তারা। বাহাত্তরে আবার ফিরে এলো পুরনো সরকার। শ্যাম চক্রবর্তীকে নিয়ে আর খুব একটা টানাটানি করলো না কেউ। তবে ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় সবাইয়ের থেকে হাতটাক তফাতে পড়তো শ্যামের পরিবারের পাত। ঐ নিয়ে কোনদিন কথা তোলে নি শ্যাম। কোনও অপরাধবোধ ওর মধ্যে কাজ করে বলে মনে হয় না। পুরো বিষয়টিই বোধ করি ওর কাছে বিরাট এক তামাশা।

আজীবন লোধাদের সঙ্গে মেশার সুবাদেই বোধ করি, ওদের প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন আত্মীয়তা বোধ করে শ্যাম চক্রবর্তী। ওদের পাড়ায় সময় কাটাতে ভালোবাসে। ওদের উৎসবে-পার্বণে হাজির থাকে সব সময়। ওদের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বাগ্রে। নিজের সমাজের প্রতি তার সমস্ত টান বোধ করি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার বদলে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের চাপা বিদ্বেষ।

গোটা তিনেক ঝি এখনো আইবুড়ো রয়েছে তার! সে নিয়ে কথা তুললেই ঠাট্টার ছলে বলে ওঠে, 'ও লিয়া চিন্তা কি মোর? একটাকে দিয়া দুবো বীর কাঁড়ে, একটাকে ডিহিপারে আর একটাকে মাঝের পাড়ায়।'

শুধু কথার কথা নয়, অনেকে মনে মনে বিশ্বাস করে, সচ্চরিত্র ছোকরা পেলে শ্যাম চক্রবর্তী লোধা পাত্রের সঙ্গেও জড়িয়ে দিতে পারে তার মেয়েগুলোকে।

কিন্তু বাণেশ্বর ঘোষের চিন্তা ওসব নিয়ে নয়। তার ভাবনা অন্যত্র। কেন জানি তার সন্দেহ হয়, কেবল যজমানী নয়, তন্ত্র-চিকিৎসাও নয়, শ্যাম চক্রবর্তী সংগোপনে ঐ সব পাড়ায় অন্য কিছু করে বেড়ায়। আরো রহস্যজনক কোনও কাজে নিজেকে জড়িয়েছে সে। সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ নেই, তবে বাণেশ্বর ঘোষের অভিজ্ঞ চোখ বারবার ঐ কথা বলে। শ্যাম চক্রবর্তীর আড়ালে, আর এক শ্যাম চক্রবর্তী আছে। সে খুব বিপজ্জনক কোনও খেলায় লিপ্ত।

আজ নিশি কামারের সঙ্গে একান্তে গুজুর-ফুসুর করতে দেখে বাণেশ্বর ঘোষের ভাবনাগুলোর ডালপালা ছড়ালো চতুর্দিকে। দুশ্চিন্তাটা বাড়লো। কেন জানি, বারংবার মনে হলো, নিছক গল্পই করছে না ওরা।

একবার ন্যাকা-সুধীরকে বলতে হবে। এ ব্যাপারে পাক্কা খবরটি চাই বাণেশ্বরের! এ দুনিয়ায় ন্যাকা-সুধীরের অসাধ্য কিছু নেই।

যার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে চাও, তার সুমুখে ধরা দিও না কখনো। বাণেশ্বর ঘোষ আল বদলে হাঁটা দিল উত্তর দিকে। এখন দু'পক্ষের মাধ্যখানে পলাশ ঝোড়ের আড়াল। অল্প বাদেই বাণেশ্বর কুন্তিদীঘির উঁচু পাড়ের আড়ালে চলে এলো।

বংশী ভঞ্জ আসছে হনহনিয়ে। পেছনে ডজনখানেক বিধবা। বাণেশ্বরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো গাছের ছায়ায়। বিজোড় দাঁত গিজুড়ে হাসলো।

মেট্যালের পুব পাড়ায় ঘর বংশী ভঞ্জর। ছোটখাটো মানুষটি। পালায়-পতরে বুদ্ধি। জমি-জিরেত নেই এক কাঠা। বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আট-দশটি পুষ্যি। তবুও ঘরে তার ভাতের অভাব হয় না। বিরাট টাউট লোক।

তল্লাটের সব্বাই চেনে ওকে। থানার বড়বাবু থেকে, বিডিও সাহেব, জেলারো সাহেব, ওভারসিয়ার বাবু সকলের নয়নের মণিটি। বিয়ের ঘটকালি থেকে গরু-ছাগল বেচাকেনা, গাছ বিক্রির দালালি, সরকারী ঋণ-কর্জ, মালি-মামলার তদ্বির, পেশাদারী সাক্ষ্যদান, স্কীমের লেবার সাপ্লাই, বুড়ো-থুড়োদের তীর্থ করিয়ে আনা—জগতের হেন কাজ নেই যা বংশী করে না। ঐ করে ওর দিব্যি চলে যায়। ছোট খাট মানুষটি। রোগা রোগা হাত-পা। মাথার মধ্যিখানে আহ্লাদী টাক।

বুড়িগুলো এতখানি পথ হেঁটে হাঁফাচ্ছিল।

বংশী মধুর গলায় বলে, 'দিদিমা'রা টুকে জিরিয়া লও। মুই টুকে কথা কই ঘোষদার সাথে।'

বাণেশ্বর শুধোয়, 'কোথা চললি রে, এদের লিয়া ?'

'গঙ্গা-সিনানে যাচ্ছে এরা।' বংশী হাসে, 'মুই বলছি, মোর দ্বারা এসব আর হবে নি। মোকে এবার ছাড়। শুনবে নি। তো, চল্। গঙ্গা সিনান করিয়া কোলকাতাটাও দেখিয়া আইস্বি। হাউড়ার পুল, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর…এসব তো বাপের জম্মে দেখুনি। কবে মরিয়াবি, দেখিয়া লে জম্মের মতন।'

'কি করিয়া যাবি ?'

'ঠুকুর ঠুকুর হাঁটিয়া এরা সন্ধ্যা লাগাদ নারাণগড়ে পোঁছিয়াবে। রাতে পুরী পেসেন্‌জার। ভোরে নাম্ করিয়া দিবে হাউড়া ইস্টিশনে। সিনান সারিয়া, দিনভর কোলকাতা দেখিয়া রাতের পুরী পেসেন্‌জারে চড়বো। পরশু ভোরে নারাণগড়।'

উপস্থিত বংশী ভঞ্জর সঙ্গে গল্প করবার সময় নেই বাণেশ্বরের। বললো, 'বড়বাবুকে পুন্না মধু দিচ্ছু ?' মাথা দুলিয়ে সায় দেয় বংশী ভঞ্জ। দু'চারটি মামুলি কথা বলে আগুন জ্বলার মাঠের দিকে রওনা দেয় বাণেশ্বর।

॥ পাঁচ ॥

গভীর রাতে অঘোর দে'র বাখুলের খিড়কি দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো গোক্ষুর। হি-হি করে কাঁপছিল। মাঘের শীত, বাঘ। মিথ্যে নয় কথাটা। মাঘ চলে যাবে আর দিন দু'তিন বাদে। শীত বোধ করি থাকবে আরো পনের দিন। খিড়কি পুকুরের পাড়ে আমের বাগানে মুকুল এসেছে অজস্র। রাতের হাওয়ায় মিঠে গন্ধ ভেসে আসে।

আজ যমুনা গাঁয়ে মিটিং ছিল 'দেশ'-এর। বাসন্তীপুজো আসছে। যমুনা গাঁয়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। ঝি-ঝিউড়ি আত্মীয়-কুটুমেরা সব জুটবে ঘরে ঘরে। মেলা বসবে চারদিন। চার রাতে চার-আসর যাত্রাগান হবে। ঐ নিয়েই মিটিং ছিল। বাসন্তীতলায় কলকল করছিল লোকজন। একে একে ঘরে ফিরে

গেছে সবাই। শুনশান হয়ে গেছে পুরো গাঁ। এবার নামা যায় কাজে। পাশটিতে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লালা এবং পদ্মা। তাদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছে গোক্ষুর। চারদিকে তাকিয়ে 'জাং' থেকে সিঁদ কাঠিটা খুললো সে সন্তর্পণে।

দিন পনের আগে থানায় ডাক পড়েছিল গোক্ষুরের। বাণেশ্বর ঘোষের মারফতই এসেছিল তলব।

নানা আশঙ্কায় দুলতে দুলতে থানায় হাজির হয়েছিল গোক্ষুর

ওকে দেখেও খানিকক্ষণ কাগজপত্রে মুখ ডুবিয়ে রইলেন বড়বাবু। গোক্ষুর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ফাঁসির আসামীর মত। এই মাঘ মাসের সকালেও ঘামছেন বড়বাবু। ফ্যানের হাওয়ায় তাঁর বাবরি চুল ফুরফুরিয়ে উড়ছে। কপালের রেখা ভাঙচুর হচ্ছে ঘনঘন। বড়বাবুর মুখভর্তি বসন্তের দাগ।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুললেন বড়বাবু।

খুব নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'কি গো, গোক্ষুরবাবু? দর্শন নেই যে তোমার?'

গোক্ষুর কি বলবে বুঝে পায় না। কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে ভক্তিভরে একখানা নমস্কার সারে সে।

বড়বাবুর ঠোঁট তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায়।

বলেন, 'শুনলাম নাকি দীক্ষে-টীক্ষে নিয়েছিস? একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছিস?'

ভয়ে-ভাবনায় গলা শুকিয়ে আসছিল গোক্ষুরের। অন্যদিন দেখা মাত্তর ধমক-ধামক শুরু হয়। পিঠে পড়ে রুলের বাড়ি। তার মানে-টানে বোধগম্য হয় গোক্ষুরের। কিন্তু এ কি ধারা কথা? হেসে-হেসে, মিষ্টি-মিষ্টি। গোক্ষুর বড় কষ্টে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে।

বড়বাবু বলেন, 'ঘোষবাবুর মুখে যা শুনলাম' তোকে তো আর এ পাপ-ভূমিতে রাখা চলে না। কোনও পুণ্যধামে পাঠিয়ে দিতে হয়। পাহারা—।'

সেপাইজী এসে দাঁড়াতেই বড়বাবু হুকুম করেন, 'একে ফাটকে পুরে দাও। আর গত একমাসে কোথায় কোথায় চুরি-ডাকাতি হয়েছে তার রেজিস্টারখানা নিয়ে আসতে বল ছোটবাবুকে।'

দুপুর অবধি ফাটকে ছিল গোক্ষুর ভক্তা।

খেতে যাবার আগে বড়বাবু আবার ডেকে পাঠালেন নিজের কামরায়।

'আজকের মত ছেড়ে দিচ্ছি তোকে।' গোক্ষুরের দিকে দু'চোখ তাক করে বলেন বড়বাবু, 'কিন্তু খবরদার, ঘোষবাবুর কথামত না চললে তোকে এ জীবনে আর লোহার গরাদের বাইরে বেরোতে হবে না। যা শালা, বাগানটা কুপিয়ে দিয়ে, বাড়ি যা। সাতদিন বাদে আমি ঘোষবাবুর কাছে খবর নোব।'

সময় বুঝে পরিপাটি করে সিঁদখানা কেটেছে গোক্ষুর। পা খানি সবে ঢোকাতে যাবে, এমন সময় সহসা পিসাব করতে এলো অঘোর দে'র ব্যাটা

প্রফুল্ল দে, অর্থাৎ কিনা বাগেশ্বর ঘোষের জামাই। আচমকা পেছন থেকে টর্চের জোরালো আলো পড়লো গোক্ষুরের পিঠে। ভীষণ ত্রাসে চমকে উঠলো গোক্ষুর। কেউ যেন এক খাবলা আগুন চেপে ধরেছে ওর পিঠে।

অল্প তফাতে আতাগাছের অন্ধকার ছায়ায় গা' মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল লালা আর পদ্মো। বেগতিক দেখে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে আমবাগানের দিকে পেছোতে লাগলো তারা। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে যেন গোক্ষুরকে কানে কানে বললো, 'পালিয়া যা, গোখরো রে, বাঁচতে ইচ্ছা ত' পালিয়া যা।'

এক ঝটকায় পা-খানা সিঁদের মুখ থেকে বের করে নিলো গোক্ষুর। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। এক লাফে টপকে গেল কাঁটা-বাঁশের বেড়াখানা। কিন্তু ততক্ষণে প্রফুল্ল দে'র চিল-চিৎকারে জেগে উঠেছে পড়শীরা। আসলে মিটিং সেরে এসে, খেয়ে-দেয়ে অনেকেই ঘুমোতে যায় নি তখনো। অঘোর দে'র চিৎকার শুনেই দক্ষিণ আর পুব দিক থেকে টর্চ আর লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে আসছে লোকজন। গোক্ষুর সরু গলিপথ ধরে দৌড় মারলো পশ্চিম দিকে।

যমুনা গাঁয়ের পশ্চিম দিকটাতে লোকজনের বসবাস বেশি। ঘন ঘন ঘরদোর। পথঘাট সরু এবং সংখ্যায় কম। এই মুহূর্তে জেগে উঠেছে পুরো পশ্চিমপাড়া। গোক্ষুর প্রাণপণে ছুটছে। ওর পেছনে পিলপিল করে ছুটে আসছে জনা পঁচিশ-তিরিশ মানুষ। বাঁ-হাতে টর্চ, ডান হাতে লাঠি। এখন কোন গতিকে গলিপথ উজিয়ে ফুটবল-ডাঙা, এবং বিশ কদমে ডাঙাটুকু পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বেঁচে যায় গোক্ষুর। কিন্তু জঙ্গলে পেঁছুতে এখনো প্রায় সিকি-মাইলটাক বাকি। চিৎকার আর সোরগোল শুনে চারপাশের ঘর-দোর খুলে ছুটে আসছে আরো লোক। ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওর দিকে। টর্চের আলোগুলো জ্বলছে, নিভছে। কখনো কখনো ছুঁয়ে ফেলছে গোক্ষুরের গা। গোক্ষুর প্রমাদ গোনে। সামনে বিশাল ফুটবল-ডাঙ্গা। তার ওপারে জঙ্গল। সহসা গোক্ষুরের মনে হলো, ডাঙার দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ডাঙা মানে, অনেক দূর অবধি মানুষের দৃষ্টি আর নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। শালারা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে পারে। নিদেন, পেছন থেকে কেউ যদি তীর-টীর ছুঁড়ে বসে তো গোক্ষুর গ্যাছে! পলকের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো গোক্ষুর। কেশব দে'র ভুষিমাল দোকানটা বাঁয়ে রেখে ডাইনে ছুটলো সে। দৌড় লাগালো যমুনার লোধা-পাড়ার দিকে। প্রথমেই যে ঘরটা পেলো তার দরজাতেই ধাক্কা মারতে লাগলো সমানে।

ভেতর থেকে সাড়া আসে না। গোক্ষুর জাতভাই হিসেবে এদের ধাত চেনে। রাতের বেলায় সহজে সাড়া দিতে কিংবা দরজা খুলতে ভয় পায় এরা। পুলিশের ভয় তো আছেই। ওরা মাঝে মাঝে এসে লোধাদের আগড়ে মারে লাঠির ঘা। দরজা খোলায়। ধমক ধামক দেয়। জেরা করে

অনেকক্ষণ ধরে। যাবার সময় মুরগির ভাড়ি খুলে, তুলে নিয়ে যায় মুরগী। মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকজনও এসে ঝামেলা জোড়ে। হয়তো গাঁয়ের কারো ঘরে চুরি-চামারি হলো, হয়তো অন্য কোনও দল কাজটা করলো, গাঁয়ের লোক কিন্তু উত্তেজিত হয়ে হামলা চালাবে লোধাপাড়ারই বাছাবাছা লোকের ওপর। ধরে নিয়ে গিয়ে পিছমোড়া করে টাঙিয়ে দেবে বাসন্তীতলার নাটমণ্ডপে। গোক্ষুর বোঝে, একেবারে নিশ্চিত না হলে দরজা খুলবে না এরা। হাতেও সময় নেই একতিল। গোক্ষুর প্রাণভয়ে কঁকিয়ে ওঠে, 'কবাট খুল গো। মুই ডিহিপারের গোক্ষুর ভক্তা। ক্ষীরোদ ভক্তার ব্যাটা। কবাট না খুললে মারিয়া ফেলবে যমুনার লোক।'

অল্প বাদে ঝনাত করে খুলে গেল দরজা। একখানা শীর্ণ লোলচর্ম হাত বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। চকিতে গোক্ষুরকে টেনে নিলো ভেতরে।

দরজায় ফের বাঁশের হুড়কো এঁটে দিল বুড়ো। ঘসা টর্চের আলো ফেললো গোক্ষুরের মুখের ওপর। 'তুই ক্ষীরোদের ব্যাটা?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে গোক্ষুর। ততক্ষণে টর্চের আলো জেবলে কুঠরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে বুড়ো। পলকের মধ্যে একখানা ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে ফিরে এসেছে। গোক্ষুরকে বলতে হল না। সে ন্যাকড়াখানি হাতে নিয়ে মুহূর্তে মুছে ফেললো ধুলোমাখা পা-হাত-মুখ—সর্বাঙ্গ।

ফিসফিস করে বুড়ো বলে, 'মোকে চিনতে পাল্লি নি বাপ? মুই মুরলী কোটাল।'

চমকে তাকায় গোক্ষুর। মুরলী জ্যাঠা! অন্ধকারে বুড়োকে চিনবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে।

মুরলী জ্যাঠার সাথে গোক্ষুরের বাপের ছিল গলায় গলায় ভাব। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে গোক্ষুর। মুরলী মাঝে মাঝেই যেতো গোক্ষুরদের বাড়ি। কখনো সখনো দু'একরাত থাকতো। একদলে ডাকাতি করেছে বহুদিন। গোক্ষুরের জানা ছিল, মুরলী কোটালের ঘর যমুনার লোধাপাড়ায়। কিন্তু সে ঘরের সঠিক হাল-হদিশ জানতো না গোক্ষুর। বাবা মারা যাওয়ার পর আজ বহুদিন মুরলী জ্যাঠার কোন খোঁজ-খবর ছিল না গোক্ষুরের কাছে। বেঁচে আছে, না কি মরে গেছে, তাই জানতো না সে। 'এটাই তেবে তুমার ঘর?' গোক্ষুর বলে।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মুরলী কোটালের উঠোনে পড়লো একাধিক টর্চের আলো। দূর থেকে ভেসে এলো উত্তেজিত গলা।
'এই দিক দিয়া ছুটিয়া আইল। মুই নিজের চোখে দেখছি।'
'এদিকে আইলে আর কুনদিকে যাবে?'
'অ্যাই সন্তোষ, অই আমগাছটায় টর্চ মারিয়া দ্যাখ ত।'
'মুরলী, অ্যাই মুরলী—। মুরলী কোটাল ঘরে আছ?'

ভেতরে খাড়া থেকে প্রমাদ গোনে মুরলী। একটি ছোট্ট কুঠরীকে কেন্দ্র করে উত্তর, পূব ও দক্ষিণে সরু বারান্দা। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

মধ্যে মধ্যে দু'তিনটি ছোট কুলুঙ্গি, তাক ও ঘুলঘুলি। কুঠরীটা দক্ষিণ-মুখো। কুঠরীর সুমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণের বারান্দায় একটি ছেঁড়া দড়ির খাটিয়া। উত্তরের বারান্দায় মুরগীর ভাড়ি। পুবের বারান্দায় গুটি কয় ছাগল বাঁধা। হেগে-মুতে কাদা বানিয়ে রেখেছে অর্ধেকখানি বারান্দা। কুঠরীর মুখে কোনও কপাট নেই। তার বদলে একটি ছেঁড়া চট ঝুলছে। মুরলী চক্ষের পলকে গোক্ষুরকে ঠেলে দেয় কুঠরীর মধ্যে। বলে, 'বিছুনায় শুইয়া পড়ু, জলদি।'

বলেই সশব্দে হাই তোলে মুরলী কোটাল। গা-হাতের আড় ভাঙে।

জড়ানো গলায় শুধোয়, 'কে?'

'আমরা হমুনার লোক। দরজা খুলু।'

'খুলি।' বলেই ধীরে-সুস্থে এগোতে থাকে মুরলী কোটাল। দরজার হুড়কা খোলে। 'ক্যাচ-কোঁচ' আওয়াজ তুলে বাঁশের দরজা টানতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ডজনখানেক টর্চের আলো একেবারে বল্লমের মতো বিঁধে যায় মুরলীর সর্বাঙ্গে। মুরলী দু'হাত দিয়ে আড়াল করে চোখ। ডর-ছুটকা খরগোশের মতো তাকায় আগন্তুকদের দিকে।

কুঠরীর মধ্যে জমাট অন্ধকার।

কিন্তু ভেতরে পা' দেওয়া মাত্তর গোক্ষুর নিমেষে বুঝে ফেলে, কয়েকটি কথা। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে। সম্ভবত একজন। এবং সে জেগে রয়েছে।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে থাকে গোক্ষুরের। আশে-পাশে পা' বুলিয়ে একটি বিছানার অস্তিত্ব টের পায় সে। খেজুরপাতার চাটাইয়ের ওপর ছেঁড়া ক্যাঁথা একখানি। গোক্ষুর ঝুপ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। এবং তখনি তার গা' ঠেকে ঘরের মধ্যেকার মানুষটির সাথে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গোক্ষুর বুঝে ফেলে আরো গুটিকয়েক কথা। বিছানার অপর অংশে যে শুয়ে রয়েছে, সে একটি মেয়ে। এবং সে এই মুহূর্তে গোক্ষুরের দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে গোক্ষুরের ডান বাহু, গলা এবং ডান গালে। উত্তেজনায় সে নিঃশ্বাস ঈষৎ দ্রুত এবং উত্তপ্ত।

গভীর রাতে প্রাণের দায়ে যার পাশটিতে শুয়ে রয়েছে গোক্ষুর, তাকে সে চেনে না। সে এও জানে না, মুরলী জ্যাঠার বাড়িতে আর কে কে আছে। পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটাই বা কে?

বাইরে সোরগোলটা বেড়েছে। অনেক মানুষ উত্তেজিত গলায় জেরা জুড়েছে মুরলীকে। জেরা যত না করছে, চিৎকার আর আস্ফালন করছে ঢের বেশি। কেউ কেউ অধিক উত্তেজনায় চালে, দেওয়ালে, উঠোনে, অকারণে লাঠি আছড়াচ্ছে। টর্চ বাতিগুলো জ্বলছে, নিভছে। ঘরের ভাঙা, নীচু দেওয়াল এবং ফুটো চাল চুইয়ে আলো ঢুকছে কুঠরীর ভেতর যৎসামান্য।

ছোট্ট কুঠরীর মধ্যে খুব ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই। বিছানাটিও নিতান্তই ছোট। মেয়েটির সঙ্গে প্রায় গায়ে গা' ঠেকিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে গোক্ষুর। ডানপাশ থেকে সঙ্গিনীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অবিরাম আছড়ে পড়ছে গায়ে।

একসময় বাইরের কলরব আর পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এলো ঘরের ভেতরে। মুরলী কোটালের গলার স্বর স্পষ্ট হলো।

'আইস, ঘরের ভিতর আইস। ঢুকিয়া দ্যাখ, কোউ আছে কি না।' বলতে বলতে বাঁশের দরজা ঠেলে প্রশস্ত করে দেয় মুরলী। 'ক্যাঁচ' করে আওয়াজ ওঠে। পাঁচ-সাতটা টর্চের আলো নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে ঘেরা বারান্দায়। কুঠরীর মধ্যেও ঢোকে দু'এক চিলতে।

কুঠরীর মধ্যেটা বেশ গরম। মাঘ মাসের শীত ঢুকতে পারে নি এই ঘুপচি ঘরের মধ্যে। বাইরের কনকনে শীত ভেদ করে এসেছে গোক্ষুর। ঘরের মধ্যে ঢুকে বেশ আরাম বোধ করছে এখন। দরজা ঠেলে ঢুকলো জনা কয়। ছাগলের মল মূত্র, মুরগীর মল, পচা পান্তা, আমানি নোংরা কাপড়-চোপড়—বন্ধ হাওয়ায় সবকিছুর গন্ধ মিলে মিশে এক বিকট গন্ধ, ঘরময়। লাঠি আর টর্চ বাগিয়ে যারা ঢুকেছিল, তারা তৎক্ষণাৎ নাকে কাপড় চেপে ধরে। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে 'বাপ্‌রে' বলে ছুটে বেরিয়ে যায় বাইরে।

অত্যুৎসাহী কয়েকজন তাও থেকে গেল। তারা লাঠি বাগিয়ে টর্চ টিপে ঘুরতে থাকে বারান্দাময়। ঘরের চাল-বাতা-রলার ফাঁক-ফোকরে টর্চের আলো ঢুকিয়ে চিল-নজরে পর্যবেক্ষণ করে। মুরগীর ভাড়ির মধ্যে হাত ঢোকায় বার বার।

'এই খাটিয়ায় কে শোয়?'

'কে আবার, মুই।' চোখ রগড়াতে রগড়াতে জবাব দেয় মুরলী কোটাল।

'আর এই কুঠরীর মধ্যে?'

'মোর ঝি গো। পঞ্চমী।'

'কুন্ ঝি? তোর ত' তিন-চারটা ঝি।'

'যেটাকে ব্যা দিলাম বচ্ছরটাক আগে। শশাঙ্ক ত' জান।'

মজুর-পাণিশ ধরা, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করা এবং আরো কিছু প্রকাশ্য ও গুহ্য কারণে শশাঙ্ক বেরার যাতায়াত আছে যমুনার তিনটে লোধা-পাড়াতেই। পাড়াগুলোর অনেককেই সে চেনে।

বললো, 'হুঁ, হুঁ। দিইছিলু বটে একটা ঝি-র ব্যা, বচ্ছরটাক আগে। বেলটি না কুথা যেন?'

'বেলটিতেই।' অমায়িক হাসে মুরলী কোটাল, 'জামাই আসসে কাল। রইছে ঘরের মধ্যে।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে বাইরের কথাবার্তাগুলো গিলছিল গোক্ষুর। ভয়ে-আতঙ্কে আমড়া-কাঠটি হয়ে গেছে। কুঠরীর দরজায় ঝোলানো ছেঁড়া চটের অজস্র ফুটো দিয়ে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ছে টর্চের আলো। জোনাকির মতো

সে আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। মুরলীর কথায় প্রমাদ গোনে গোক্ষুর। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে, 'দুঁকুর দুম..., দুঁকুর দুম... ।'

সহসা নিকষ অন্ধকারের মধ্যে একখানা পুরুষ্টু নরম হাত এসে পড়লো গোক্ষুরের বুকের ওপর। নিঃশব্দে বেষ্টন করলো ওকে। টানতে লাগলো নিজের দিকে।

গোক্ষুর কাঠ মেরে যায়। সে বুঝতে পারে, ডান হাত দিয়ে গোক্ষুরকে জড়িয়ে রেখেছে মেয়েটি। তার ভারি স্তন গোক্ষুরের ডান বাহুর ওপর চেপে বসেছে। শীতের রাতেও গলগলিয়ে ঘামতে থাকে গোক্ষুর।

মেয়েটি কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঘুরিয়া শুঅ মোর দিকে। জাপটিয়া ধর মোকে।'

পরিস্থিতির গুরুত্বটা গোক্ষুরও বুঝতে পারছিল। সে নিঃশব্দে ডান পাশ ফিরে শোয়। মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে তার গায়ের চাদরের অর্ধেকখানা চাপিয়ে দেয় গোক্ষুরের ওপর। বাঁ-হাতখানা ঢুকিয়ে দেয় গোক্ষুরের গলার তলা দিয়ে। পিঠ বেষ্টন করে, সে হাত থামে গোক্ষুরের বাঁ-দাপনার কাছাকাছি। ডান হাত দিয়ে গোক্ষুরকে আর একপ্রস্থ জড়িয়ে নেয় মেয়েটি। তারপর নির্দ্বিধায় মুখখানা ঢুকিয়ে দেয় গোক্ষুরের বুকের ভেতর।

গোক্ষুরের সারা অঙ্গে অসংখ্য খোল-কত্তালের বাজনা বাজছে তখন। এক-দিকে মৃত্যুভয়। ধরা পড়ে গেলে অনিবার্য মৃত্যু। অন্যদিকে এক ভর-ভরন্ত যুবতী মেয়ের দম বন্ধ করা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে, সারা শরীর জুড়ে অবিরাম কাঁসর-ঘণ্টা। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি, প্রতিটি রোমকূপ যেন জেগে উঠেছে আদিম অন্ধকারে।

বাইরে মুরলী কোটালের সঙ্গে দর কষাকষি চলছিল।

মুরলী বলে, 'মা-কালীর কিরা বাবু। ঝি-জামাই ছাড়া ঘরে কেউ নাই।'

'তব্বো আমরা ঘরে ঢুকিয়া দেখবো।' বলে ওঠে শশাঙ্ক বেরা।

'ছি, ছি।' জিভ কেটে যেন নিজেই লজ্জায় মরে যায় মুরলী কোটাল, 'কি যে ক'ন বেরার পো'! ওরা লাজে মরবে তা'লে। ঘরে ঢুকিয়া আপনারও লাজে মাথা কাটা যাবে।'

'মাথা কাটা যাউ।' শশাঙ্ক বেরা অবিচল, 'এই, টর্চটা দেখি তো রে।'

টর্চের জন্য হাত বাড়ায় শশাঙ্ক বেরা।

মেয়েটি সহসা গোক্ষুরের বুকের খোঁদল থেকে মুখখানা বের করে।

গোক্ষুরের কানের মধ্যে মুখখানা পুরে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'মরব না কি, মোকে জাপটিয়া ধর-অ।' বলেই সে ফের মুখ লুকায় বুকের মধ্যে। সজোরে আঁকড়ে ধরে গোক্ষুরকে।

গোক্ষুর এক মুহূর্ত সময় নেয়। তারপরই সে পরম আবেগে আঁকড়ে ধরে মেয়েটিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের থেকে টর্চ-বাতি ঝলসে ওঠে। পুরো কুঠরী-খানা আলোয় ভরে যায়। চটের পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে একটি মুখ। টর্চের

তীব্র আলো প্রথমে পড়ে গোক্ষুরের মাথায়। পরে, মেয়েটির তালুতে। কেবল তালুটুকু ছাড়া আরপুরো মাথাখানি ঢুকে গেছে গোক্ষুরের বুকের মধ্যে।

কুঠরীর মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় টর্চের আলো। গোক্ষুর আর পঞ্চমীর শরীর দুটো আলোর জিভ দিয়ে বারবার চাটতে থাকে শশাঙ্ক বেরা। একসময় উঁকি মারা মুখখানি অদৃশ্য হয়ে। টর্চের আলোও নিভে যায়।

বাইরে বেরিয়ে শশাঙ্ক বেরা বলে, 'ঢ্যামনা-ঢেমনির এক্কেরে চেতনা নাই। দুজন দুজনকে ঠাসিয়া ধরছে, যেন জোড়-খাওয়া সাপ। চল গে, এ ঘরে কেউ নাই। পাড়ার মধ্যে চল।'

দ্রুত মুরলীর উঠোন থেকে বেরিয়ে যায় শশাঙ্ক বেরার দল।

যাবার সময় শশাঙ্ক ইলচি করে বলে, 'অ মুরলী, জলের ঘটি পাশে রাখবি সর্বদা। যা দেখিয়া আইলাম, তোর ঝি আইজ একটু বাদে মরণ-চিচ্কার জুড়বে। সতরু রইবি।'

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে চলে যায় শশাঙ্ক বেরার দল। দূরে তাদের টর্চের আলো আর গলার আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে মেয়েটিকে ঢিলে করে দেয় গোক্ষুর। মেয়েটিও ধীরে ধীরে হাত টেনে নেয় গোক্ষুরের শরীর থেকে। বাঁশের দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ ওঠে বাইরে। গোক্ষুর নিঃশব্দে উঠে বসে বিছানার ওপর। চটের পর্দা সন্তর্পণে সরিয়ে উঁকি মারে বাইরে।

দড়ির খাটিয়া থেকে ফিসফিস করে ওঠে মুরলী, 'চুপ মারিয়া বসিয়া র' কুঠরীর মধ্যে। কে কুথা লুকিয়া আছে তার ঠিক নাই।'

গোক্ষুর চকিতে মুন্ডুখানা ঢুকিয়ে নেয় ভেতরে।

অন্ধকার বারান্দায় হেঁটে চলে বেড়ায় মুরলী কোটাল। খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজ তুলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালায়। লম্ফ ধরায়। 'আঁ—।' করে সশব্দে হাই তোলে। হাতে-পায়ের আঙুল মটকায়। একসময় মেঝের ওপর থাবড়ে বসে মতিহার আর শালপাতা দিয়ে চুটা বানাতে শুরু করে।

লম্ফের আলো ঝুলন্ত ছেঁড়া চট ভেদ করে ভেতরে ঢুকেছে খানিকটা। কুঠরীর মধ্যে আবছা আলো! ঐ আলোয় এতক্ষণে মেয়েটিকে দেখে গোক্ষুর। দেখতে দেখতে সারা শরীর জুড়ে এক ধরনের প্রদাহ শুরু হয়। এ যে আকাট যুবতী! নিঃসাড়ে শুয়ে শুয়ে থির পলকে তাকিয়ে রয়েছে গোক্ষুরের দিকে!

॥ ছয় ॥

বেলা দশটা নাগাদ গীতালি এলো। রামেশ্বরের মেয়ে।

বাণেশ্বর ঘোষ বৈঠকখানায় বসে সম্পত্তির কাগজপত্র দেখছিলেন। একটা ঝামেলার সৃষ্টি করেছে নতুন বিডিও'টা। দিল্লী থেকে একটা স্কিম এসেছে, ব্লকে ব্লকে গৃহহীনদের জন্য ঘর বানিয়ে দেবে সরকার। আগামী দোসরা

অক্টোবর. জাতির পিতা 'বাপুজী'র জন্মদিনে এদেশে যেন একজনও গৃহহীন না থাকে। ব্লক অফিসে মিটিং হল। যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে শুরু করতে হবে কাজ। জেলা-কমিটির প্রমোদ দত্ত বললো, এই স্কিমটা আমাদের তুরুপের তাস। মনে রাখবেন দাদা।

নির্দেশ এলো, প্রতিটি অঞ্চল থেকে দশদিনের মধ্যে পেশ করতে হবে গৃহহীনদের তালিকা। মিটিং বসলো অঞ্চল অফিসে। তৈরী হলো লিস্ট। তাতে বাণেশ্বর ঘোষ, কুলদা ডাক্তার, কালাচাঁদ আইচদের তাবত মুনিষ-মাইন্দার, গরু-বাগাল, গোয়াল-কাড়নী এবং অনুগত বশংবদদের নাম ঢুকলো। অঞ্চল প্রধান কালাচাঁদ আইচ নিয়ে গিয়ে হাতে হাতে দিয়ে এলো লিস্ট। শালা বিডিও, এনকোয়ারী করে অর্ধেক নামই দিল কেটে। ঐ জায়গায় ঢোকালো পনেরো-বিশটা লোধার নাম। প্রতিবাদ জানিয়েছিল কালাচাঁদ আইচ। বিডিও নাকি মিষ্টি করে শুধিয়েছে, আপনি বলতে চান, কালাচাঁদবাবু, ঐ লোধারা কেউই গৃহহীন নয়? প্রত্যেকেরই বাড়িঘর আছে? এ তো ভারি তাজ্জবের কথা! তারা হল লোধার জাত। চুরি-চামারি করে। ভিড়কা-ভিড়কি করলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালায়। কোনও একখানে থিতু হয় নাকি এরা? কিন্তু কে শুনবে এসব কথা। ঐ লিস্টই বহাল রইল।

সরকার বললো, 'জমি কেনার দরকার নাই। খাস জমিনে এদের বসত গড়ে দাও।'

বিডিও বললো, খাস জমি মানে তো আঘাটায় বেঘাটায় ডাঙা-ডহর. শ্মশান গোচর, টাঁড়-টিকর। জনবসতি থেকে সবচেয়ে দূরে. সবচেয়ে খারাপ জমিটি। কে আর গ্রামের লাগোয়া ভালো জমি খাসে ছেড়েছে? ঐ সব তেপান্তরের মাঠে ঘর বানিয়ে বসত গড়লে, কেউই গিয়ে বাস করবে না ওখানে। কোটি-কোটি টাকা নষ্ট হবে সরকারের। যদি জোর-জার করলে যায়ও, কাজ কাম পাবে না। লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাবে। অল্পসল্প চুরি-চামারি করতো যারা, আরো ক্রিমিন্যাল হওয়ার সুযোগ পাবে।

বহুত চিঠি চালাচালির পর সরকার বললো, তাহলে গাঁয়ের লাগোয়া জোত জমি অ্যাকুয়ার কর।

বিডিও শালা এত খচ্চর, বাণেশ্বরের একখানা চার বিঘের ভিটা অ্যাকুয়ার করবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে সদরে। শুনেই তো বাণেশ্বরের মাথায় বজ্রাঘাত। দুধের সরের মত সরেস জমি. সেটাতে কিনা ঘর হবে লোধাদের জন্য!

সেই কারণেই সকাল থেকে জমি-জায়গার কাগজগুলো নিয়ে বসেছে বাণেশ্বর ঘোষ। যে করেই হোক আটকাতে হবে এটা। বিডিও শালা ভেবেছে কি? তার বাপের জমি পেয়েছে?

মেজাজটা এমনিতে তুঙ্গে ছিল। গীতালীকে দেখে সহসা সারা মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠলো। তবে সেটা নিমেষের তরে। পরমুহূর্তে হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'আয়, আয় মা।' বাণেশ্বর কাগজপত্র সরিয়ে রাখে. 'বুড়া-ছেইলাটাকে মনে পড়ল অ্যাদ্দিন বাদে?'

জ্যাঠাকে প্রণাম করলো গীতালী।

মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বাণেশ্বর ঘোষ, 'আয়ুষ্মতী হও। হাঁটিয়া আইলু?'

'হুঁ।' ছোট্ট জবাব দেয় গীতালী।

'খবর পাঠাইলে নারানগড়ে গাড়ি রাখতাম।' অনুযোগ করে বাণেশ্বর, 'যা। তোর জেঠাইমা ভিতরে। ঘামিয়া গেছু একেরে।'
হাতের ব্যাগটা নিয়ে অন্দরের দিকে পা' বাড়ালো গীতালী। বাণেশ্বর চেয়ে রইলো পেছন থেকে।

ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে। রামেশ্বরের মত মুখখানি পেয়েছে। ওর মায়ের মত টকটকে গায়ের রঙ। ছিপছিপে চেহারাখানি বেশ। ভাবতে ভাবতে নিজের মেয়েগুলোর কথা মনে পড়ে। ভাতের হাঁড়ির মত কালো রঙ। শরীরেরও ছিরি ছাঁদ নেই। সোনা নগদে চতুর্গুণ খরচ করে তিনটে মেয়েকে কোনও গতিকে পার করেছে বাণেশ্বর। বুকের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করতে থাকে সে স্মৃতি। ছোট ভাইয়ের মেয়েটাকে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে যায়।

সবেমাত্র বিশ পেরোলো গীতালী। মেদিনীপুর গোপ কলেজে রেখে বি-এ পাশ করিয়েছে ওর মামারা। আর নিজের মেয়েগুলো, ঘরের কাছে হাইস্কুল থাকা সত্ত্বেও কেউ ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারে নি। শোনা যাচ্ছে, চাকরির চেষ্টায় আছে। পেয়েও যাবে হয়ত। ওর মামারা তো করিতকর্মা কম নয়। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে বাণেশ্বর ঘোষ। একটা পরাজয় বোধ, ঐটুকু মেয়েটার কাছে। খস খস করে কাগজের পাতা ওড়ে হাওয়ায়। বাণেশ্বর দু'হাতে সামলায়। জমির দখল নিতে এসেছে বোধ হয়। কিংবা ধানের ভাগ। আশ্বিনে একবার এসেছিল। দিন দুয়েক ছিল। কথাটা পেড়েছিল তখনই। বাণেশ্বর ঘোষ উচ্চ-বাচ্য করে নি।

মেট্যাল স্কুলে একটা মাস্টার আছে। প্রণব রায়। বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক সবেতেই তুখোড়। কাঁচা-কাতিকটির মতো চেহারা। বেলদা স্কুলে নাকি পড়তো। গীতালী পড়তো ওর চেয়ে তিন চার ক্লাস নীচুতে। মেয়েটাকে নাকি ঐ সময় বছরটাক টিউশনি পড়িয়েছিল প্রণব। এখন দু'জনে গলায় গলায় ভাব। এক বেলার জন্য এলেও মেয়ের যাওয়া চাই ইস্কুলে। দেখা করা চাই ছোকরার সঙ্গে। ব্যাপারটা বাণেশ্বর ঘোষের বেজায় অপছন্দ। প্রণব ছোকরাটাকে মোটেই সুবিধের মনে হয় না তার। পড়ায় নাকি ভালোই। তবে বড্ড দেমাক। স্কুলের প্রেসিডেন্ট সে, মিটিং-টিটিং-এ গেলে অল্প বয়েসী মাস্টাররা সব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ছোকরা কোনও দিন হাত-তুলে নমস্কার অবধি করে না। খুব নাকি গরীব ঘরের ছেলে। মেগে-যেচে পড়েছে। ছাত্র হিসেবে ভালো ছিল, তাই ঠেকে নি কোথাও। তা, ভিক্ষা বৃত্তি করে বড় হয়েছ তুমি, অতো গুমোর কিসের হে? আসলে,

আঙুলে ফুলে কলাগাছ। দরিদ্রের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার, তৃণসম জ্ঞান করে এ তিন সংসার। এ হয়েছে সেই বৃত্তান্ত।

কাঁথির দিকে কোথায় যেন বাড়ী। থাকে স্কুলের হোস্টেলে। অথচ অন্য মাস্টারদের দ্যাখ। দূরে তো তাদেরও বাড়ি। হোস্টেলে না থেকে তারা এক-একজন গেরস্থের ঘর ধরে নিয়েছে। থাকে-খায়, বাড়ির ছেলে-পিলেগুলোকে দেখিয়ে টেখিয়ে দেয়। বাড়িতে কুটুম এলে মাছ-টাছ ধরে। উৎসবে-পার্বণে হাট-বাজার, অতিথি-অভ্যাগতদের দেখভাল করে। এমনি করেই থাকা-খাওয়ার খরচটা বাঁচিয়ে ফেলে প্রায় সবাই। এ ছোকরা ঠিক উল্টো। জয়েন করেই ঠাঁই নিয়েছে হোস্টেলে। গেরস্থের অন্নপ্রার্থী হবে না। তাতে নাকি মান যাবে বাবুর! পড়ায়-টড়ায় ভালো, শোনার পর বাণেশ্বর ঘোষ প্রস্তাব দিয়েছিল ওকে। মোর মেয়ে রাখীর ঘরে গিয়া থাক না মাস্টার। নাতুনগুলোকে টুকচার দেখাবে সকালে-সন্ধ্যায়। মুখের ওপর না বলে দিল ছোকরা। এমনি সাহস। আরে, মুই বাণেশ্বর ঘোষ, দলের থানা কমিটির প্রেসিডেণ্ট, ইস্কুল কমিটির সভাপতি, চারপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক এক ডাকে সাড়া দেয়, তার মুহের উপর কয়া দিলু, 'না'! দেখবো রে তোকে, সময় আইসু। অসময়ে ফলে না বৃক্ষ, সময়েতে ফলে। সেই থেকে তক্কে তক্কে আছে বাণেশ্বর ঘোষ। সুযোগটি পেলেই ঘাড়টি ধরে তাড়াবে ওকে। মেট্যাল গাঁয়ে বসবাস করিয়া বাণেশ্বর ঘোষের ল্যাজে পা!

সেই ছোকরার সঙ্গে কিনা ফি-বারেই গা-ঘসাঘসি করতে ছোটে নিজেরই বংশের মেয়ে! এ দুঃখ কোথায় রাখি রে! লজ্জা-শরম থাকবে নি তোর? বি-এ পাশ করিয়া ফেলছু বলিয়া বংশের মান-মর্যাদা ধুলায় লুটিয়া দিবি তুই? রাগে ফুঁসতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। কেমন করে এ মেয়েকে জব্দ করবে বুঝে পায় না।

গীতালীকে ভেতর ঘরে আদর করে বসিয়েছে বাণেশ্বরের বউ বিষ্ণুপ্রিয়া। খোঁজ খবর নিচ্ছে গা-গতরের। গীতালী তার মায়ের সাথে আজীবন মামা বাড়ীতে রয়েছে। এ নিয়ে দুঃখের অন্ত নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। মা মরবার পরও কেন যে গীতালী পড়ে রয়েছে পরবাসে, এটাই মাথায় ঢোকেনা তার। ইদানিং গীতালীকে কাছে পেলে ঐ নিয়ে আক্ষেপের বন্যা বইয়ে দেয় সে। আজও বারবার আক্ষেপ-অনুযোগ করছে ঐ নিয়ে। ঠাকুরপো মরিয়া যাবার পর কত করিয়া কইলাম তোর মাকে। আর না, চলিয়া আইস এবার। মায়া-মানুষের পাশ শ্বশুর-ঘরের তুল্য ঠাঁই নাই। তা সে বর্তমানেই হউক, কিংবা স্বামীর অন্তে হউক। এই যে মুই আজীবন শ্বশুরঘরে বসবাস কচ্ছি, তোর জেঠা মরিয়া গেলে কি বাপের দোর চলিয়াযাবো? তা কি ফের হয়? শ্বশুরের ভিটায় পদদীপ না জ্বাললে, মায়া মানুষের মরিয়াও মুক্তি নাই। কানে দিলো নি মোর কথাটা।

গীতালী মন দিয়ে শুনতে থাকে জেঠিমার আক্ষেপগুলো। জবাব দেয় না।

রামেশ্বর যখন মিলিটারিতে ছিল, তখন এরাই নাকি পেছনে লেগে লেগে মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল মামার বাড়িতে। তাড়িয়ে দিয়েছিলোই বলা যায়। রামেশ্বর ফিরে আসার পরও এরা তেমন গা করেনি। এমন কি রামেশ্বর খুন হওয়ার পরও কোনদিন মুখ ফুটে বলে নি, তোমরা এসো, বসবাস কর দেশের মাটিতে।

গীতালী যখন বাপের সম্পত্তি ফেরত চাইলো, আক্ষেপটা শুরু হয়েছে তখন থেকেই।

ছোট মামা বড়ই ঠোঁট কাটা।

বলে, 'বটেই তো। ঘরের বউ, মেয়ে, ক্যানে থাকতে যাবে পরের দুয়ারে আজীবন। তুই চলিয়া যা, আজই।

'তারপর?' ভ্রু-বাঁকিয়ে শুধোয় গীতালী।

'তারপর কি হবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!'

বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে পারে ছোট মামা।

বলে, আদরে আদরে একেরে মাথায় তুলিয়া রাখবে তোকে। দুনিয়ার যত ভালো ভালো চিজ আনিয়া খাবাবে। পরের দোরে কষ্টে-সৃষ্টে এক বেলা আধ পেটা খায়া মানুষ তুই, অত গুরু পাক খাদ্য সইতে পারবি নি। একদিন ফুড্-পয়েজনিং হয়্যা মরিয়াবি।

একেবারে হাসির ছলে যে ইঙ্গিতটা দিল ছোট মামা, তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না গীতালী। বাণেশ্বর ঘোষের পক্ষে, হাতের মুঠোয় পেলে, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা বিচিত্র কিছু নয়। গীতালীর বিশ্বাস বাণেশ্বর ঘোষ সেন মানুষ, সব পারে।

শিউলি এ বাড়ির ছোট বউ, টুকটুকে ফর্সা রঙের ওপর বেশ কাটা-কাটা মুখ-চোখ। কথাবার্তা কম বলে। শাশুড়ী সর্বদা বাঁকা-ভুরুর ডগায় রেখেছে ওকে।

সর্বদাই কেমন দুঃখী-দুঃখী মুখ মেয়েটার। ভীম একাদশীর মেলা বসেছে বাপের বাড়ির দেশে। ভাই এসেছিল নিয়ে যেতে। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবল আপত্তিতে শিউলি যেতে পারে নি। অথচ আগের বারে যখন এসেছিল গীতালী, মেয়েটা দু'পায়ে নাচছিল ঐ আনন্দে, কিনা মেলায় যাবে সে। ভেতর উঠোনে একটি তুলসী মঞ্চ। একটি বিশাল পেয়ারা গাছ। ভেতর বারান্দায় ঝুলছে লোহার গোলপানা খাঁচা। তার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একটি টিয়ে। বটের কুঁড়ির মতো সোহাগী অঙ্কুর দিয়ে বারবার কামড় দিচ্ছে খাঁচার তারগুলোতে। পাখি পুষেছে শিউলি।

কথাবার্তার ফাঁকে সামনে এসে দাঁড়ায়।

'দিদি, নাইতে যাবে না কি?' শিউলির হাতে তেল-গামছা।

'তুই নাইতে চললি নাকি?' গীতালী শুধোয়।

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় শিউলি, 'হুঁ। রাজু ঘুমাচ্ছে। এই বেলা না করলে আর— ।'

শিউলির ছেলেটা বড় দুরন্ত হয়েছে। এক বছর বয়েস, কিন্তু সারা বাড়ি যেন মাথায় তুলে রেখেছে। বড় মিষ্টি বাচ্চাটা। গীতালীর বড় ভালো লাগে ওকে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাচ্চাটা এমন পাজী, কিছুতেই আসবে না গীতালীর কোলে।

উঠে দাঁড়ায় গীতালী। বলে, 'যাই জেঠ্‌মা, চানটা সারিয়া আসি।'

শিউলির এই গায়ে পড়া ভাবটা পছন্দ হলো না বিষ্ণুপ্রিয়ার। গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। তবুও মুখে বললো, 'যা। নাইয়া আয়। ফিরিয়া আইসা কিছু মুখে দে।'

খিড়কির ঘাটটা নির্জন। পাথরের ওপর চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে শিউলি। থমথমে মুখ।

গীতালী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ওকে।

বাণেশ্বরের ছোট ছেলে চপলাকান্ত গীতালীর চেয়ে বয়েসে ঢের বড়। শিউলিকে সে হিসেবে তার 'বৌদি' ডাকা উচিত। কিন্তু প্রথম দিনই শিউলি বলে দিয়েছে সোজাসুজি, 'মোকে তুমি নাম ধরিয়া ডাকবে। মুই তো বয়েসে ছোট।'

নারাণগড় থেকে মাইল তিন-চার পুবে কাঁঠালিয়া গাঁয়ে শিউলির বাপের বাড়ি। গরীব ওরা। তাও নাইন অবধি পড়িয়েছিল শিউলিকে। সরলপানা মুখখানি কেমন দুঃখী দুঃখী। গীতালীর মনে হয় মেয়েটা সুখে নেই একতিল। খালি আড়াল খোঁজে। কিছু একটা বলতে চায়। পারে না।

শুকনো শাড়ি-সায়া ওপরে রেখে আঁচলের খুট থেকে একটা কাগজের পুঁটলি বের করলো শিউলি সন্তর্পণে।

গীতালীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'ধর ত।' গীতালী দেখলো, নুনের পুঁটলি।

গীতালীর হাতে পুঁটলিখানা ধরিয়েই দ্রুত পায়ে চলে গেল উত্তরের আম বাগানের দিকে। খিড়কি পুকুরের তিনটি পাড়েই আমের বাগান। বাগানের মধ্যেই কয়েকটা টক কুলের গাছ। এই মাঘ মাসে পাকা কুলে ভরে গেছে গাছগুলো।

শিউলি কোঁচড় ভরে কুল পেড়ে আনে। নুনের পুঁটলিখানা হাতে নিয়ে কিছু এগিয়ে দিল গীতালীর দিকে। গীতালী বলে: 'না বাবা, দাঁত টকবে।'

'তুমি একদম শহুরা হয়্যা গেছ।' বলেই কুলের গায়ে চাবলাতে শুরু করে শিউলি। গলা নামিয়ে বলে, 'মা দেখলেই বকবে।'

'কেন?'

'মা বলে, টক খাইলে অম্বল হবে। মা'র অম্বল হইলেই, দুধ খায়া বাচ্চারও অম্বল হবে।'

হি-হি করে হাসতে থাকে শিউলি। ভারি নিষ্পাপ হাসি। ঘাটে নামে দু'জনে। পা জলে ডুবিয়ে বসে থাকে পাশাপাশি।

একটু বাদে শিউলি বলে, 'তুমার প্রণব-মাস্টারের বিয়ে হচ্ছে যে।'

'কোথায় ?' চমকে তাকায় গীতালী।

'সুদেব কাকুর মেয়ার সাথে অরূ বিয়ের কথাবার্তা চলছে।'

'তাই না কি ?' গীতালী সহসা গম্ভীর হয়ে যায়।

'ঘটক কে জানো ?'

নিঃশব্দে মাথা দোলায় গীতালী।

'বাবা।' শিউলি মুচকি হাসে।

এবার সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে যায় গীতালী। ভ্রূ-জোড়া অজান্তে কুঁচকে ওঠে।

'জ্যাঠা হয়েছে সুদেব মিদ্যার ঝি-র ঘটক !' গীতালীর গলায় তীব্র বিস্ময়, 'অরা ত চিরকালই সাপে-নেউলে।'

'কি জানি, কি আছে বাবার মনে ?' শিউলি কুলকুচো করে জল ছুঁড়ে দেয় মাঝ পুকুরে, 'গণেশদা ত' ইদানিং ঘন ঘন আসে বাবার কাছে।'

গীতালী জবাব দেয় না। ধীরে ধীরে জলে নামে। শরীরখানি ডুবিয়ে দেয় জলের তলায়।

কনকনে ঠাণ্ডা জল। গীতালীর ভয় হয়, ঠাণ্ডা না লেগে যায় !

'জান দিদি—,' শিউলি প্রসঙ্গ বদলায়, 'খুড়্-শ্বশুর যে রাতে খুন হইলেন, সে রাতে-–।'

আচমকা খিড়কি দোরে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ। হেলতে দুলতে এসে হাজির হয় বিষ্ণুপ্রিয়া। বারোমেসে হাঁপানীর রোগী। খিটখিটেও সেই কারণে।

'তুদের গা-ধুয়া হইল ?' পায়ে পায়ে জলে নামে বিষ্ণুপ্রিয়া, হাঁফাচ্ছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'জলে বেশি ডুবলে ঠাণ্ডা লাগিয়াবে। এখন সিজিন্ চেঞ্জের টাইম।'

হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অকারণে মুখ-হাত ধুতে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। মুখভর্তি জল নিয়ে কুলকুচি করে ছেটোতে থাকে জলে। এ বচ্ছর আম তেমন হবে নি। গাছে মুকুল কুথা ? মুখে চোখে জল নেয় বিষ্ণুপ্রিয়া। তাইলে ধানও হবার আশা নেই। আঁচল দিয়ে মুখখানা পরিপাটি করে মোছে। আমে ধান, তেঁতুলে বাণ···।

গীতালী বুঝে ফেলে শিউলিকে আর ওর সঙ্গে একা একা থাকতে দিতে নারাজ বিষ্ণুপ্রিয়া। কৌশলে পাহারা দিচ্ছে ছোট বউ-মাকে। ঘাটে উঠে গা মুছতে থাকে দু'জনে।

গেল বারে যখন এসেছিল গীতালী, ছোট বউমা'র নামে সাত কাহন করে বলেছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। ভিখারী ঘরের মায়া, অলক্ষ্মীর মতন হাঁটন-চলন, কাজ-

কমে'র ছিরি-ছাঁদ নাই, জিভের আগায় বড্ড লোভ আর মিচ্ছা কথা। লুকিয়া চুরিয়া বাপের দোরকে কিছো কিছো পাঠায় বলিয়া সন্দেহ হয়।

শিউলি আর মুখ খুলবে না। গীতালী তাড়া লাগায় ভাজকে। চ, চ! জলদি কর্। ক্ষিদা লাগছে।

পাশে দাঁড়িয়ে এটা ওটা বকে চলে বিষ্ণুপ্রিয়া। গীতালী তখন অন্য ভাবনায় বিভোর। ফি-বারে এলেই শিউলি ওকে একা খোঁজে। কিছু একটা বলতে চায় সঙ্গোপনে। কথাটা বলে উঠতে পারে না কিছুতেই। গীতালী যতক্ষণ থাকে কেউ না কেউ সারাক্ষণ পাহারা দেয় শিউলিকে।

বিকেল চারটে নাগাদ স্কুল-হোস্টেলে গেল গীতালী।

মাটির দেওয়াল টালির ছাওয়া দোতলা বাড়ি। একতলার তিনখানা মাত্র ঘরে ছেলেরা থাকে। অন্যগুলোতে ক্লাস হয়। দোতলায় শিক্ষকরা একটাতে, বাকি গুলোতে ছাত্ররা। হেডমাস্টার জ্যোতিশ্বর রায় ছাড়া আর মাত্র দু'জন শিক্ষক থাকেন হোস্টেলে। প্রণব এবং শিশিরবাবু। বাকিরা মেট্যাল, যমুনা, ফুলগেড়িয়া, কোটালচকের এর-ওর দুয়োরে।

উত্তরে ডিম্পিার, দক্ষিণ ও পূবে মেট্যাল, পশ্চিমে কোটালচক ও ফুলগেড়্যা। গ্রামগুলি চারপাশ থেকে ঘিরে রয়েছে। মাঝখানে ইস্কুলটা। কোটালচক এবং ফুলগেড়্যার পশ্চিমে যমুনা।

হোস্টেলে এখন কেউ নেই। ছেলেরা খেলছে মাঠে। কেউ কেউ দল বেঁধে বেড়াতে গেছে কেলেঘাইরের দিকে। শিশিরবাবু বোধ করি গাঁয়ের ছোকরাদের সঙ্গে ভলি খেলছেন জগন্নাথ দাসের দোকানের সামনে। চপলাকান্ত, গণেশরা সব খেলছে ওখানে।

শাড়ির আঁচল সামলে গীতালী পায়ে পায়ে উঠে যায় দোতলায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিল প্রণব। পরনে পায়জামা আর গেঞ্জি। গীতালীর পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়।

'এসো, এসো। কবে এসে?' প্রণবের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা।

'আজই।' বিছানার একপ্রান্তে বসে গীতালী, 'এই শেষ বেলায় ঘরের মধ্যে শুয়ে রয়েছো যে? সবাইয়ের সঙ্গে খেলতে পার তো।'

মুচকি হাসে প্রণব। কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে। সহসা নাটকীয় ভাবে গেয়ে ওঠে, 'নয়, নয়, নয়, এ মধুর খেলা···। অর্থাৎ আমার কাছে খেলাটা কখনোই মধুর নয়।' হেসে ওঠে প্রণব, 'খেলতে আমার ভালো লাগে না তেমন।'

'তোমরা রবীন্দ্রনাথের পিণ্ডি চটকাবে।' গীতালীর চোখে মুখে কপট রাগ, 'কি কথার কি অর্থ!'

'ও কথা থাক।' প্রণব কথা ঘোরায় অন্যদিকে, 'তোমার খবর বল। জ্যাঠামশাই কি বলে? সম্পত্তিগুলো ফিরিয়ে দেবে তোমাকে?'

'জানি না।' থমথমে গলায় বলে গীতালী, 'বলে নি কিছু এখনো।'

সহসা বিছানা থেকে নামে প্রণব।

'একটু চা' খাওয়াই তোমায়।' প্রণব পেছন দিকে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে আড় ভাঙে। পাঞ্জাবি চড়ায় গায়ে।

'আমার জন্য চা করতে হবে না তোমায়। চা আমি তেমন খাই না।'

'খাও, খাও।' স্টোভের সামনে বসে ফস করে দেশলাই জ্বালায় প্রণব, 'মেহমান বলে কথা। শুধু মুখে বিদায় দিলে সংসারের অকল্যাণ হবে।'

'সংসার? কার সংসার?' কপালে দু' চোখ তুলে তাকায় গীতালী।

'কেন? আমার। তুমি তো আমার ঘরেই এসেছো।'

'তা এসেছি!' গীতালীর দু' চোখ জুড়ে দুষ্টুমির হাসি, 'তবে এটা তোমার ঘরই কেবল। সংসার নয় কোনও অর্থেই। সংসার হতে হলে আরো কিছু চাই মশাই।'

যে কথাটা মেয়েলী কৌতূহল থেকে বার বার শুধোবে ভেবেছিল তখন থেকে, সেটা এবার বলেই বসলো গীতালী। 'অবশ্য সংসার তোমার শিগগির হচ্ছে!' বলতে গিয়েই গীতালীর ফর্সা মুখখানি লাল হয়ে ওঠে।

গীতালীর গলার স্বরে রহস্যের গন্ধ পায় প্রণব। চায়ের সসপ্যানে চামচ নাড়ানো থামিয়ে সে ফিরে তাকায় গীতালীর দিকে।

'তোমাকে বাংলায় অনার্স পড়তে কে পাঠালো বল তো?'

'কেন?'

'এই যে প্রতিটি বাক্যেই 'আসল কথাটা চেপে রেখে শুধু কাব্যের জাল' বোনা, এতে অন্যপক্ষের, বিশেষ করে সে যদি অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যা জানা একটি অপদার্থ হয়, তবে তার কি হাল হয় বল তো? খুলে বল দেখি, ঘর আর সংসারের মধ্যে কি তফাত, আর সেটা শিগগির কি করেই বা হতে যাচ্ছে আমার?' লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলে প্রণব। আরো হয়তো চলতো বক্তৃতা, কিন্তু সসপ্যানে চা উথলে ওঠায় বক্তৃতা থামিয়ে ওকে সসপ্যান সামলানোর ব্যাপারে মনোযোগী হতে হয়।

গীতালী নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, শুনলাম শিগগির বিয়ে করছো। ঐ কারণেই বললাম। শোন মশাই, ঘর মানে চার-দেওয়ালের কুঠরী, আর সংসার মানে ঘর প্লাস ঘরণী।'

প্রণব ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গীতালীর দিকে।

তাজ্জব গলায় বলে, 'কে বললো তোমায়, আমি বিয়ে করছি?'

সহসা ঈষৎ বিরক্ত হয় গীতালী, 'অমন করছো কেন? বিয়ে করা কিছু অন্যায় নয়। বিয়ের বয়সও হয়েছে তোমার। উপার্জনও করছো তুমি।'

গীতালীকে মাঝ পথে থামিয়ে দেয় প্রণব, 'সব তথ্যই তো বলে গেলে একে একে। এবার বলে ফেল, কাকে বিয়ে করছি আমি? ঐটুকু আর বাদ থাকে কেন?

'এ আর বলার কি আছে?' গলায় যারপরনাই কৌতুক ফুটিয়ে গীতালী

বলে, 'সমস্ত মেট্যাল গ্রামই জানে, সুদেব মিদ্যার মেয়ের সাথে বিয়ের কথা-বার্তা চলছে তোমার। ঘটক আমার পূজনীয় জেঠামশাই।'

সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যায় প্রণব। নিঃশব্দে চা শেষ করে।

একসময় মৃদু গলায় বলে, 'ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে আমায়, বুঝলে। বাণেশ্বর ঘোষ তার চিরশত্রুর মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করছে…! ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে অবশ্যই। কিন্তু চক্রান্তটা ধরতে পারছি নে কিছুতেই।'

প্রণবের কথায় গীতালীর চোখে-মুখেও দুর্ভাবনা ফুটে ওঠে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। ঘরের চালে লালচে রোদ্দুর। পাথরগেড়িয়ার পাড় ধরে গরুর পাল ফিরে আসছে। দোতলার জানলা দিয়ে দেখা যায়।

চায়ের কাপ দুটো মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে প্রণব বলে, 'থাকবো না আর এখানে।'

'কেন? কোথায় যাবে?'

'কাউকে বলি নি, তোমাকেই বললাম। চেষ্টা করছি আমি অন্যত্র চলে যেতে। এ জায়গাটা একদম ভালো লাগছে না আমার।'

গীতালী জানে প্রণবের ল' ডিগ্রিটাও রয়েছে। কলেজে পড়াকালীন শেষ করে রেখেছে ওটা। গীতালী প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনের ভাব পড়বার চেষ্টা করে। বলে, 'ওকালতি করবে?'

'ওকালতি?' প্রণব ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে, 'ওকালতি করতে চাইলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু ঐ পেশাটাকে যে আমি সহ্য করতে পারি নে।'

গীতালী তা জানে। বহুবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রণবের মতে ওকালতি এক ধরণের বেশ্যাবৃত্তি। নীতির বালাই থাকে না। যে টাকা দেয় তাকেই দেহ-মন সমর্পণ। চোর, ডাকাত, খুনী, ধর্ষণকারী, ভেজালদার, চোরাকারবারী, সবাইয়ের পক্ষেই উঁকিল থাকে। থাকে এবং কাজ করে।

প্রণব বলে, 'বরং উঁকিলদের মধ্যে ক্রিমগুলোই চাঁদির জুতোর মোহে ওদের পক্ষে সওয়াল করে।' লম্বা করে মাথা নাড়ে প্রণব, 'ছাত্রজীবনে সখের বশে, নাইট কলেজ বলেই লিখিয়েছিলাম নাম। পাশও করে গেছি। তা বলে ওকালতি করবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি আমি। আমি অন্য কোনও স্কুলে চলে যাব, কিংবা কলেজে, কিংবা অন্য পেশায়।'

॥ সাত ॥

গোক্ষুরের বাপ ক্ষীরোদ ভক্তা ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। ঢেঁকি দিয়ে গেরস্থের দরজা ভাঙতে ওস্তাদ ছিল সে। যমুনার মুরলী কোটাল ছিল তার জানের দোস্ত। একসঙ্গে দল গড়েছিল বহুদিন। গোক্ষুরের কাকা বিনোদ ভক্তা ছিল রোগা-সোগা, মাথায় খাটো। পাক্কা চোর ছিল সে।

ক্ষীরোদ ভত্তা অনেক সাধ্যসাধনা করেও নিজের দলে ভেড়াতে পারেনি ওকে।

বিনোদ বলেছে, তুমার দলে কেমন করিয়া যাবো? দু'জনের লাইন আলাদা। তুমার কাজ বলপ্রয়োগের মাইধ্যমে। মোর হইস কৌশল, শুধুই কৌশল। চোখ, কান, নাক, সর্ব ইন্দ্রিয়কে সতরূ রাখিয়া, শুধু দশটি আঙুলের মাইধ্যমে কাম। শিল্প কর্ম এটা।

পরে-পশ্চাতে গোক্ষুরকে একান্তে বুঝিয়েছে ব্যাপারটা। তোর বাপেরটা হইল ধাপুড়-ধুপুড়, মোরটা হইল লাচ। তোর বাপেরটা যদি হয় জাল ফেলিয়া দুপ্‌টো-দুপুটি করিয়া মাছ ধরা, মোরটা হইল ছিপ আড়িয়া ধরা। বড় উচ্চ মার্গের চিজ রে এটা। এ লাঠি-সড়কির কাম নয়।

গোক্ষুরেরও পছন্দ নয় বাপের লাইনটা। বড় মোটা দাগের কাজ। ঝুঁকি অনেক বেশি। তাগদ দরকার শরীরে। কাকার কাজে মজা আছে, ওস্তাদি আছে। ঝুঁকি কম, বুদ্ধি চাই বেশি। কয়েত বেলটি ফাটিয়ে খায় বাপ, কাকার হইল 'গজভুক্ত কপিত্থ'র ফল। বাইরে শক্ত খোলাটি তেমনি অটুট, ভেতরে সব মাল হাপিস।

ছেলেবেলা থেকে কাকার কাছে টুকটাক হাতেখড়ি নিয়েছিল। নামেমাত্র। ক্ষীরোদ ভত্তার বেজায় আপত্তি ছিল। শালা, ক্ষীরোদ ভত্তার বেটা হয়্যা তুই সিঁদকাটা চোর হবি! সিংহের ছা লেপাল-উঁদুর? গিরস্থের খিড়কির দেয়ালের ধারে শুইয়া শুইয়া সিঁদ কাটবি! খিড়কির ঐ উলি-কাঁদুলে গিরস্থরা মুতিয়া ভিজিয়া রাখে, জানু? শালা, গলায় পা' তুলিয়া দিবো, যদি ঐ চামচিকাটার কথায় লাচবি।

ক্ষীরোদ ভত্তা গোক্ষুরকে জোর করে ভিড়িয়েছিল দলে। প্রথম রাতে তার কাজ ছিল গেরস্থের ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে চারপাশে পাথর-রড়া ছোঁড়া, যাতে পড়শীরা পাশে ভিড়বার সাহস না পায়। দলের চারজন মাল বাহকের একজন ছিল সে। দলের নবীনদের জন্য এই কাজই বরাদ্দ।

বস্তাভর্তি পাথর-বড়া বয়ে নিয়ে যেতে হবে। গেরস্থের উঠোনে দাঁড়িয়ে ঐ পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাবলিক সামলাতে হবে। খালি বস্তাগুলোতে মাল ভরে, মাথায় চাপিয়ে নির্দিষ্ট মোকামে পেঁছে দিতে হবে।

গোক্ষুরের মনে আছে, প্রথম রাতে প্রবল বিক্রমে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে কাপড়ে চোপড়ে হয়ে গিয়েছিল তার।

বার দু'তিন বাপের দলে গিয়েছিল গোক্ষুর। ভালো লাগেনি একেবারেই। বাপকে পষ্টাপষ্টি বলেছে সে কথা। কাকার কাছে পাঠ নিতে নিতে একদিন ভিড়েই গেল কাকার দলে। এখানেও মাল বাহকের কাজ প্রথমে। কারিগর হল অনেক পরে।

হাঁটছে গোক্ষুর ভত্তা। আলপথ ধরে। নাক বরাবর গতি তার। জঙ্গলের ধারে। দু'চোখ চিরুনি চালাচ্ছে গাছে-গাছালিতে। ফল-পাকুড়, মৌচাক যদি এক আধটা নজরে পড়ে যায়। ক্ষেতে খামারে কাজ নেই।

এক ফসলার দেশ। রুখা পাথুরো জমিন খাঁ-খাঁ। প্রায় অনাহারে কাটছে তার। গতকাল দুপুরে হারি পিসি দিয়েছিল চাট্টি পান্তভাত। রাতে কিছু জোটেনি। আজ সারাদিন উপোসে থেকে, গিয়েছিল বাণেশ্বর ঘোষের দুয়ারে। মুড়ি পেয়েছে কাঠা দুই। জ্ঞান পেয়েছে ঢের বেশি। তর সইছে না বাণেশ্বর ঘোষের। কিন্তু গোক্ষুর ভক্তা কেমন সাড় পাচ্ছে না ভেতর থেকে। এর মধ্যে একদিন তো অঘোর দে'র ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়ে মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। তারপর আর নয়। মাত্র একটি ঘর নামিয়েছে আহার মুণ্ডায়। বেশি কিছু নয়। সামান্য বাসনপত্র, সের কয়েক চাল, একটা পাঁঠা-ছাগল। চালগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছিল লালা আর উদমার সঙ্গে। ছাগলটার ঘাড় মুচড়ে ফেলে রেখে এসেছিল আহার-মুণ্ডার জঙ্গলে। ডাল পাতা চাপা দিয়ে এসেছিল। পরের দিন দু'পহর নাগাদ গিয়ে দেখে, টেনে বের করে শেয়ালের দল প্রায় সাবাড় করে এনেছে। বাসন কোসন বাবদ গোটা তিরিশ টাকা পেয়েছিল। এক একজন দশ টাকা করে। ইদানীং আর সামান্য বাসন কোসন নেয় না বাণেশ্বর ঘোষ। 'ছুঁচা মারিয়া হাত ময়লা করিবার' প্রবৃত্তি হয়না তার। এসব নিকম মাল নেয় গুণাধর জানা। নতুন ফুটেছে সে মেট্যাল গাঁয়ে বছর দু'তিন।

আসলে ভালো লাগে না। বউটা আচমকা মরে যাওয়ার পর থেকে আর কিছুই ভালো লাগেনা গোক্ষুরের। পেটের দায়ে করে বটে, কিন্তু সেটা নেহাতই ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

যমুনার জঙ্গল বাঁয়ে রেখে চলেছে ঠায় গোক্ষুর। ডাইনে রুক্ষু পাথুরিয়া জমি। চোত-বৈশাখে কোদালের ঘায়ে লোহা ঠিকরায়। দূরে ঘূর্ণি হাওয়ারা চক্কর খেতে খেতে ওপরে ওঠে। ধুলো-বালির স্তম্ভ গড়ে শূন্যে। ঘূর্ণি-ভূত। গোক্ষুর গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। রোদটা পড়ুক। তাড়া তো নেই কোনও।

জঙ্গলের দিকে তাকায় গোক্ষুর। পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে গাছগুলো। কাঁচ পাতায় ভরে যাচ্ছে ন্যাড়া ডাল। গাছের তলা ভরে যাচ্ছে শুকনো পাতায়। মানুষ বা পশুপ্রাণী হাঁটলে মচর মচর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে বহু-দূর অবধি। শুনতে শুনতে এক ধরনের নেশা ধরে যায়। ছেলেবেলার কথা, মায়ের কথা মনে পড়ে। বহেড়া গাছের তলায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে গোক্ষুর।

পড়ন্ত বিকেল। জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে লালচে রোদ্দুর। হাওয়া বইছে ফুরফুরিয়ে। তাতে রোদের চামড়া জ্বলুনী তেজ খানিকটা কম।

জঙ্গলের কিনার ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলে গেছে সরু পায়ে চলা পথ। দু'পাশে উইঢিবি। ললাশ, মন্তা এবং লাড়ো-খেজুরের ঝোড়। বুনো পাখিরা শিস দিয়ে চলেছে অবিরম।

অকস্মাৎ সামনে দেখতে পেল সন্ধ্যাকে। ছোট ভাই মকর ভক্তার বউ। মাথায় ঝাঁটি কাঠের বোঝা। কপালে ঘাম। শুকনোপানা মুখ। ভোখে

শোকে মলিন।

ঐ অবস্থায় সে তাকালো গোক্ষুরের দিকে। বড় রহস্যময় চাউনি। করুণ অথচ মদির। যেন কি এক নেশার ঘোরে রয়েছে মেয়েটা। যেন রাত্রি উজাগরে অবসন্ন।

গোক্ষুর শুধোলো, 'তুমি ক্যানে? মকর কুথা?'

'সে গেছে বংশী ভঞ্জর সঙ্গে বলক আপিসে।' সন্ধ্যা ধীর গলায় বলে, 'পাড়ার বহুত লোক গেছে। পশু-লোন মিলবে নাকি বলক আপিস থিকে। দু'শো করিয়া টাকা। বংশী লিবে জনা পিছু পঞ্চাশ টাকা।' বলতে বলতে পা বাড়ালো সন্ধ্যা পাড়ার দিকে।

ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে গোক্ষুর। টাউটের পাল্লায় পড়ে মকরা গেছে বলক আপিসে। আর সন্ধ্যা জঙ্গল থেকে কাঠ কুটো নিয়ে চলেছে। ওগুলো গেরস্থের দোরে বিক্রি করে অন্ন তুলে দেবে মরদ আর বাচ্চাগুলোর মুখে।

ঝাঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে বনের শুঁড়ি পথে পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যা। পেছন থেকে ওকে থির পলকে দেখলো গোক্ষুর।

হু-হু আওয়াজ তোলে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যায় ধুলো-বালি, শুকনো পাতা। খসর খসর শব্দ ওঠে। দিগন্তের শেষ ভাপ উগরাতে থাকে ধরিত্রী। সহসা কেমন যেন খাঁ-খাঁ করে ওঠে বুক। মকরের মুখখানি মনে পড়ে যায়।

ঈশেন কোণে মেঘ জমেছে। পাকা জামের মত মেঘ। ইদানীং বিকেলের দিকে ঝড় আসছে মাঝে মাঝে। গোক্ষুর পা চালিয়ে দিল যমুনা-ডাঙার দিকে।

গোক্ষুররা তিন ভাই। মেজোভাই এখন থাকে লোধাশুলির দিকে। শোনা যায় ট্রাক-লুটের দল গড়েছে ওখানে। ছোটভাই মকর ছিল বদ্ধ কালা। মাথা মোটা। চুরি-ডাকাতি জাতীয় কাজের একেবারেই অনুপযুক্ত। ওকে দলে নিলে, দল প্রথম রাতেই ধরা পড়ে যাবে। কারণ চেঁচিয়ে না বললে সে কোনও কথাই শুনতে পায় না। ছেলেবেলা থেকে ও ছিল বাণেশ্বর ঘোষের বাথুলে। বাগালের কাজ করতো। এখন এর বাড়ি ওর বাড়ি দিন-মজুরী করে খায়।

ছেলেবেলা থেকেই বিছানায় মুততো মকর। এক রাতও বাদ যেতো না। বিয়ের বয়স হলে তার সম্বন্ধ আসতে লাগলো এখান-ওখান থেকে। বিয়ে দেবে কি, সবাইয়ের মনে তো ঐ এক চিন্তা। মুতে বিছানা ভাসালে বউ না রাত পোহালেই পালায়। বিয়ে তো হলো। সবাই লক্ষ্য করলো, বউ পালানো তো দূরের কথা, বেশ খুশী মনেই আছে। এবং রাত পোহালে মকরের বিছানায় দ্বিগুণ পরিমাণ জায়গা ভিজে সপ্‌সপে। কথা ভাঙলো মকরার খুড়ী-শাশুড়ী, মাসটাক বাদে যখন এলো। সন্ধ্যাও বিছানা ভাসাতো সেই বাচ্চা বয়েস থেকে। বড় ভয় ছিল বাপ-মা'র। শ্বশুর ঘরে এ মেয়ে এক রাতের বেশি টিকবে না। পাছায় লাথি কষিয়ে তাড়িয়ে দেবে অমন বিছানায়

মুতা মেয়েকে। ভগমানের অশেষ কৃপায় দেবা-দেবী যে এমনটি মিলে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। এখন দু'জনেই বিছানা ভাসায়। কে কার দোষ ধরে!

ফাঁকা মাঠের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা মনে পড়ছিল। নিজে নিজেই হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল গোক্ষুর।

মনে পড়ে যাচ্ছিল মকরের বউ-সোহাগের কথা। অকাল-কুষ্মাণ্ড এই ছেলেটিকে বেশিদিন পুষতে চায়নি ক্ষীরোদ ভক্তা। বিয়ে দিয়েই পৃথক করে দিয়েছিল। যা শালা, চেমনা-চেমনি চরিয়া খা: ডিহিপারের ডাঙায় কুঁড়ে বানিয়ে, সন্ধ্যাকে নিয়ে বাস করতে লাগলো মকর ভক্তা। নামো-পাড়ায় বাণেশ্বর ঘোষের দোরে জন-মজুর খাটে। তাতে দিন চলে না কিছুতেই। সন্ধ্যা বনে-বাদাড়ে যায়। ঝাঁটি-কাঠ ভেঙে টেঙে এনে বেচে-ট্যাচে কোনদিন চলে না!

শুনেছে গোক্ষুর অন্যের মুখে। শেষ বেলায় খাটা-খাটা করে ফিরে সকালের কড়কড়ে ভাত গিলতে বসেছে মকর বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে। সন্ধ্যা পায়ে পায়ে এসেছে কখন। মকরের গন্ধ শুঁকে শুঁকেই এসেছে। কথা বলছে ঘোষদের মেয়েদের সঙ্গে। কড়কড়ে ভাত চিবোতে চিবোতে সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে মকর ভক্তা। কে কথা কয় গো? সন্ধ্যা নাকি। আদর করে ডাকে ওকে। আধ খাওয়া ভাতের থালায় সন্ধ্যাকে বসিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে পাত ছেড়ে। এনামেলের ঘটির মুখে জল খায় ঢক ঢকিয়ে। ঘোষের মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে পীরিত দ্যাখ কালার!

কিছুদিন বাদে এক অন্য ফিকির ধরলো মকর: দিনের শেষে তার প্রাপ্য অন্ন-ব্যাঞ্জন শালপাতায় বেঁধে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিতে লাগলো।

বাণেশ্বর ঘোষের নজর এড়ায় না কিছুই। বিষয়া ব্যক্তি সে। কত তার অন্তর্দৃষ্টি! একদিন প্রবল আপত্তি তোলে। দিন দিন যে নিজের মুখের গ্রাসটি লিয়া গিয়া বউকে খাওয়াচ্ছু শালা তুই যে দুর্বল হয়্যা পড়বি। শালা, দেখি তো রোজ দিন, ফালের বোঁটা বেশিক্ষণ চাপিয়া রাখতে পারুনি। ফাল ঘসটায় মাটির উপর। কোদাল দিয়া ভিতা ছাঁটতে গিয়া খালি হাঁফাউ। কাল থিকে ভাত এখেনে বাঁসয়া খাবি। ঘরে লিয়া যাইতে দিবোনি মুই।

মনের দুঃখে বাণেশ্বর ঘোষের ঘরটাই ছেড়ে দিল মকর। এখন এর-ওর দোরে লাগলো খাটে। কাজ জুটলে খায়, নইলে শাক-পাতা বুনো-ফল খেয়ে দিন কাটায় পুরো সংসার। দুটি বাচ্চা হয়েছে, একটি ব্যাটা, একটি ঝি। খেতে পায় না। সন্ধ্যা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে মাঝে মাঝে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ে। দোরে দোরে ঘোরে দু'এক দানা চালের আশায়।

বড় কষ্টে আছে ওরা। তবুও, গোক্ষুরের মনে হয়, অনেক সুখে আছে মকরার পরিবার। রাতের পর রাত জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে মানুষের দেওয়ালের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে হয় না ওকে। শেষরাতে সমস্ত উপার্জন তুলে দিতে হয় না অপরের সিন্দুকে। মাঝে মধ্যেই থানায় ডাক পড়ে না।

রুলের গুঁতো খেতে হয় না। দণ্ডে, দণ্ডে পলে পলে ভয় আর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে না-মরে বেঁচে থাকতে হয় না মকরকে। একজোড়া নিষ্ক্রিয় কান পেয়ে বেঁচে গেছে মকর ভক্তা। এক জোড়া তীক্ষ্ণ কান পেয়েছে বলে গোক্ষুর ভক্তা আজীবন প্রতি রাত্রেই একবার করে মরণের সঙ্গে কোলাকুলি করে বেঁচে আছে।

দিন কতক আগে এক বিষণ্ণ বিকেলে মকর ভক্তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গোক্ষুরের। সারাদিন জনমজুর খেটে ক্লান্ত শরীরে ফিরছিল মকর। একথা সেকথার পর গোক্ষুর শুধোয়, তোর ব্যাটাটা কেমন আছে রে? তোর মতোই কালা হইছে নাকি?

'না, না' প্রবলভাবে মাথা নাড়ে মকর, একটু বুঝি বিরক্তও হয়, 'কালা হবে ক্যানে? বাপ কালা হইলে কি ব্যাটাও কালা হয়?' শুনে কেমন যেন খুশী হতে পারেনি গোক্ষুর। আহা, কালা হয়ে জন্মালো নি কেন? তাহলে হয়তো বংশের একমাত্র ছেলেটা এ জন্মের মত বেঁচে যেতো। আহা, কালা হয়্যা যাউ উ। কালা লোকেরাই সুখী এ দুনিয়ায়।

ভাবতে ভাবতে সহরীর দিঘীর উত্তর পাড় ধরে কখন গোক্ষুর চলে এসেছে যমুনার লোধা পাড়ার কাছাকাছি। কখন এলো! কেন এলো! এ তো ভারি তাজ্জব ব্যাপার!

সেদিন রাতে জীবন বাঁচাতে যে মেয়েটির সর্বাঙ্গে জড়িয়েছিল, তার শরীরের গন্ধ বুকের ওম্, নিঃশ্বাসের উত্তাপ এখনো যেন লেগে রয়েছে সারা শরীর জুড়ে। আলো-আঁধারি ঘরে সে মেয়ের নিষ্পলক চাউনি, এখনো চোখ মুদলেই দেখতে পায় গোক্ষুর। তার সারা অবচেতন জুড়ে থিতু হয়ে গেছে মেয়েটি। পঞ্চমী।

মুরলী কোটালের সঙ্গে যমুনার লোকগুলোর কথা-বার্তা কুঠরীর মধ্য থেকেই শুনতে পাচ্ছিল সেদিন। গেল বছরই নাকি পঞ্চমীর বিয়ে হয়েছে বেলটির কার সাথে। বাপের বাড়ি এসেছিল নাকি? চলে গেছে শ্বশুরের ঘর? নাকি এখনো রয়েছে এখানে?

মন্ত্রমুগ্ধবৎ পা দুটি চলে। চলতে থাকে। একসময় গোক্ষুর ভক্তা এসে হাজির হয় মুরলী কোটালের উঠোনে। তখনও গাছের মগডাল থেকে রোদ্দুর মিলিয়ে যায়নি। মুরলী কোটাল বসে ছিল উঠোনে। ঘোলাটে চোখে তাকায়, কে বটে? চিনতে পারেনি বুড়া।

গোক্ষুর নিজের পরিচয় দেয়। পাশটিতে গিয়ে থাবড়ে বসে। আগল-বাগল চোখে ইতি-উতি চায়। মনে মনে খুঁজতে থাকে পঞ্চমীকে।

মতিহারের চুটা বানাবার ফিকির করছিল মুরলী কোটাল। সরঞ্জামগুলো টেনে নেয় গোক্ষুর। পরিপাটি হাতে চুটা বানাতে থাকে।

শীতের বেলা লি-লি। পালা-পত্তরে লালচে রোদ্দুর। জঙ্গল থেকে শুকনো হাওয়া বইছে। এমন হাওয়ায় কফ জমে বুকে। খকর খকর কাশতে থাকে মুরলী কোটাল। গয়ের তুলে ছুঁড়ে দেয় তফাতে।

বলে, কত কথায় ?'

অস্বস্তি বোধ করে গোক্ষুর। ইতস্তত করে।

বলে, ইদিগে একটা কাজ ছিল। ভাবলি, দেখিয়া যাই, বুড়াটা কেমন বা আছে।'

আবার কাশি শুরু হয় মুরলী কোটালের। দমকে দমকে। বলে, 'আর থাকা থাকি! এবার যাইতে পারলেই বাঁচিয়া যাই।'

'বাবার মুহে তুমার কত গল্পই না শুনিছি মোরা।' গদ-গদ গলায় বলে গোক্ষুর।

ঘোলাটে দৃষ্টিখানি সুদূর আকাশের গায়ে বিঁধিয়ে দেয় মুরলী কোটাল। স্মৃতির দুয়োরে ঘা পড়ে নিঃশব্দে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে।

বলে, 'সে সব দিনের কথা মনে পইড়লে আজও গা'র রোম্ খাড়া হয়্যা যায়। তরা আইজ-কালের ছগ্রা, কি তার বুঝবি ?'

চুটা পাকানো শেষ হলে একখানা এগিয়ে দেয় গোক্ষুর। নিজে একখানা নেয়। ট্যাঁক থেকে সস্তা লাইটার বের করে ধরায়।

ভক্‌ভকিয়ে ধোঁওয়া ছাড়তে থাকে মুরলী কোটাল।

'তুমার ঝি ঘরে নাই ?' একসময় কথাটা শুধিয়েই ফেলে গোক্ষুর।

'ক্যানে ?' মুরলী কোটালের ঘোলাটে চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে সন্দেহে।

'না, এমন কিছো নয়। টুকচার জল খাইতি।'

'অ--।' ফের চুটোয় টান মারে মুরলী কোটাল, 'সে গেছে জঙ্গলে। কাট-পালা আনতে। ঘুরেছে দিনভর। বিকবে গেরস্থের দোরে। চাল-আটা খদ্দি করবে। তবে না ফিরবে সে! তার ফিরতে ঢের দেরি। তুই বরং ভিতরে গিয়া খায়া আয় জল। কুঠরীর ভিতর মাটির কলসী।'

জল তিষ্টা খুব একটা পায়নি গোক্ষুরের। তাও নিজের মান বাঁচাতে উঠে গিয়ে জল খেয়ে আসে।

তখনও বিড় বিড় করছিল মুরলী কোটাল, 'মায়া-ঝিটা আছে বলিয়া দিনান্তে একবার ভাতে-আমানিতে জুটছে। নচেত দেখতে হইতো নি আর।'

'কিন্তু উ আর কদ্দিন ?' গোক্ষুর কথার খেই ধরে ধরে এগোয়, 'শ্বশুর ঘর চলিয়ালে--।'

'শ্বশুর ঘর ?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুরলী, 'শ্বশুর ঘরের কথাটা কে কইলো তোকে ?'

'সেদিন রাতে উই লোকগুলাকে কইছিলে না ? বেলটি না কোথায় ব্যা দিছ অর--।'

সহসা গুম মেরে যায় মুরলী কোটাল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে। তোবড়ানো গাল দুটো কাঁপতে থাকে। বলে, 'ও মেয়ের শ্বশুর ঘর করা ঘুচিয়া গ্যাছে জন্মের মতন।'

চমকে ওঠে গোক্ষুর। আরো কিছু শোনবার আশায় চেয়ে থাকে মুরলী কোটালের দিকে।

'বছরটাক আগে মার্কণ্ডায় একজন চুরি করতে গিয়া ধরা পড়ছিল। গাঁ'র লোক অকে পিটিয়া মারল। শুনুনি?'

'হুঁ হুঁ। শুনেছি বৈকি।' অস্থির গলায় বলে ওঠে গোক্ষুর।

একটুক্ষণ গুম মেরে থাকে মুরলী কোটাল। 'তারপর বলে অটাই ছিল মোর জামাই।'

গোক্ষুরের বুকখানা টনটন করে ওঠে সহসা। মুখে কথা জোগায় না। পঞ্চমীর মুখখানা সহসা মনে পড়ে যায়।

মুরলী কোটাল নিঃশব্দে চুটা টানতে থাকে। নীলচে ধোঁওয়া কুলকুচি করে ছড়িয়ে দেয় হাওয়ায়।

খানিক বাদে পঞ্চমী ফিরলো। সূর্য তখন ডুবে গেছে। বাদুড়ের পাখায় ভর করে আঁধার নামছে দ্রুত। আকাশ পথে সাঁই সাঁই পাখনা মেলে কোথায় চলেছে বাদুড়ের দল? শাড়ির আঁচলে বাঁধা ছোট পুঁটলি। সওদা করে এনেছে পঞ্চমী। সারাদিনের রোদে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে ওর মুখখানি। উঠোনে পা' দিয়েই নজর পড়লো গোক্ষুরের দিকে। ভুরুতে ঢেউ খেললো বারকয়েক। কপালের মসৃণ ভুঁই ভেঙে চুরে গেল মুহূর্তের তরে। ধীর পায়ে ঢুকে গেল ঘরে।

পেছন থেকে মুরলী কোটাল কাশতে কাশতে বলে ওঠে, 'গোক্ষুরকে টুকে জল দে'তো পঞ্চমী।' গোক্ষুর যে খানিক আগে ঘরে ঢুকে জল খেয়ে এলো, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে বুড়ো।

পঞ্চমী সাড়া দেয় না। কুঠরীর ভেতর তার হাঁটা-চলা, তৈজসপত্র নাড়া-চাড়ার আওয়াজ ভেসে আসে।

উঠোন ছেড়ে দাওয়ায় উঠে আসে মুরলী। হিম পড়ছে। খেজুর পাতার চাটাইখানা নিয়ে পিছু পিছু হাঁটে গোক্ষুর। পেতে দেয় দাওয়ায়। পঞ্চমীর প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। মুরলী কোটাল তার পুরোনো দিনের গল্প জোড়ে। তার কৈশোরের গল্প, যৌবনের গল্প, ডাকাত জীবনের হাজার রোমাঞ্চকর ঘটনা। মাঝে মাঝে থো-থো করে থুথু ফেলে উঠোনে। অন্ধকার আকাশে হাতড়ে বেড়ায় কিছু।

বলে, 'ছাড়িয়া দে, এ গু'খাবা বিদ্যা। ভাল নয়। লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়। যাবিনি আর। খাটিয়া খা।'

গোক্ষুর ভক্তা উশখুশ করছিল ভেতরে ভেতরে। সহসা সে মুখ ঘোরায় পেছনে।

এবং দেখে, পঞ্চমী বাঁশের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দুটি চোখ গোক্ষুরের ওপর তীরের ফলার মত স্থির!

॥ আট ॥

প্রশস্ত উঠোনে দড়ির খাটিয়ায় বসে গভীর ভাবনায় বুঁদ হয়ে ছিল বাণেশ্বর ঘোষ। সারাদিন আগুন উগরে সূর্য তখন পাটে বসেছে। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে লাল চাকিটাকে।

পাশ দিয়ে চলে গেল ছোট ছেলে চপলাকান্ত। রোগা, ঢ্যাঙা, মাথায় বাবরি চুল। ময়ূর-কণ্ঠী লুঙ্গির ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি। বাণেশ্বর হাত পাখার হাওয়া খেতে খেতে পেছন থেকে পলকহীন দেখলো ছেলেকে।

আজ দুপুরে ভোজ ছিল সমবায় অফিসে। কো-অপারেটিভ ইনস্পেক্টর সাহেব এসেছিলেন ক্রেডিট-লিমিট 'ফাইনেল' করতে। তাঁরই সম্মানে, সমবায়ের পয়সায় মাছ-মাংস, দই-মিষ্টির ভূরিভোজ। নেমন্তন্ন ছিল বাণেশ্বর সহ সব ডিরেক্টরদের।

সকাল থেকে খুব ধকল গেছে চপলাকান্তের। সমিতির ম্যানেজার হিসেবে পুরো আয়োজনটা ওকেই করতে হয়েছে। ঝামেলা চুকিয়ে, ঘরে ফিরেছিল ঘণ্টাটাক আগে? আবার বেরিয়ে গেল।

বি-এ পাশ করে বসে রয়েছে ছেলেটা আজ বছর পাঁচেক। বিয়ে-থা করেছে। একটি বাচ্চার বাপ। এখনো একটা চাকরি-বাকরি জুটলোনি। ঠিক জুটলোনি এমনটা বলা যায় না। থানা কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে জেলা কমিটির মাতব্বরদের সঙ্গে সর্বদাই ওঠা-বসা বাণেশ্বরের। তেমন করে ধরাধরি করলে একটা সরকারী চাকরি হয়ত জুটেও যেতো। রেলে,বিদ্যুৎ-পর্ষদে, লোক নিচ্ছে, ঢের। কিন্তু বাধা হয়েছে অন্যত্র। বাণেশ্বরের বড় ছেলে শশিকান্ত নারাণগড়ে থিতু হয়েছে। বউ-ছেলে নিয়ে ওখানেই থাকে। নারাণগড়ে বাণেশ্বরের ধান-কুটাই কল, কাটা-কাপড়ের দোকান। এসব শশিকান্তই সামলায়। এদিকে মেট্যালে বাণেশ্বরদের যে অগাধ সম্পত্তি, ক্ষেত, পুকুর, বাগান, এই বিশাল বাখুল, বাণেশ্বরের অন্তে এসব সামাল দেবার জন্যে একজন তো কাউকে দরকার। দশভূতে লুটে-পুটে খাবে নইলে। আজকাল গাঁ-গঞ্জের পরিস্থিতি ভালো নয়। সারাক্ষণ আগলে থেকেও ভয় যায় না মন থেকে। কে কখন জবর-দখল করে বসে। এই অবস্থায়, দুটি ছেলেই যদি ঘর ছেড়ে বাইরে থাকে তবে আর দেখতে হবে না। চপলাকান্তকে, সেই কারণে, গাঁয়েই থিতু করতে চায় বাণেশ্বর। এই গাঁ-ঘরেই একটা কিছু জুটিয়ে দিতে পারলে, ছেলেটার একটা হিল্লে হয়ে যায়। বাপ-চোদ্দ পুরুষের ভিটা-পুকুর সম্পত্তিগুলোও বাঁচে।

ঘরের সামনেই মেট্যাল স্কুল। সম্প্রতি হাইস্কুল হয়েছে। ওখানেই একটা মাস্টারি পেলে সোনায়-সোহাগা হয়। কিন্তু পোস্ট খালি নেই একে-বারেই। খুব শিগগির নতুন পোস্ট মঞ্জুর হওয়ারও আশা নেই। ভারি

দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে বাণেশ্বরের। আজকের যুগের ছোকরা, তার মতি গতি বোঝা দুষ্কর। দিনভর ক্লাবে গিয়ে তাস পেটে, আড্ডা মারে। এই তো সন্ধ্যের মুখে বেরিয়ে গেল। কত রাতে ফিরবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। মেজাজখানি সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে আছে। কথায় কথায় খিঁচিয়ে ওঠে, আর কচি বউটাকে কারণে-অকারণে আমছুঁ্যাচা করে। আসলে, মনস্তাপে জ্বলছে ছেলেটা। বাণেশ্বরের তাই মনে হয়। বি-এ পাশ করে ফ্যা-ফ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনস্তাপ তো হবেই।

ধরিত্রী তাপ ওগরাচ্ছে। চারপাশে প্রচণ্ড গুমোট। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। বাণেশ্বর গামছা দিয়ে গায়ের কালশিটে ঘাম মোছে। এ সময়টা বিকেলের দিকে ঝড় বাতাস সহ দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়। ধরিত্রী ঠাণ্ডা হয়। আজ আকাশে তারও লক্ষণ নেই। অবশ্য না হয়ে ভালোই হয়েছে। ফলন্ত আমগুলো তাহলে একটিও থাকতোনা গাছে।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে বাণেশ্বরের। সুদেব মিদ্যার ছেলে গণেশ মিদ্যাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কারণে। খাটিয়ায় বসে অপেক্ষা করছে ওরই জন্যে।

সুদেব মিদ্যা অঞ্চলের রেশন-ডিলার। বে-পথে অনেক কাঁচা পয়সা করেছে অল্পদিনে। টাকার গুমরে ধরাকে সরাজ্ঞান করে। দিন-কতক ধরে বাণেশ্বর ভাবছিল, একদিন ফাঁসিয়ে দেবে সুদেবকে। ফি-হপ্তায় তো নারানগড়ে কণ্ট্রোলের মাল তুলে অর্ধেক মাল ওখানেই বেচে দিয়ে আসে। এমনিতে তাতে এলাকার লোকের খুব একটা অসুবিধে হয় না। কারণ গরীব-গুরবো, বিশেষ করে লোধা-সাঁতালরা, পুরো মাল কখনোই তুলতে পারে না। চিনি-টিনি তো ওরা কস্মিনকালেও নেয় না। তা বাদে চাল, কেরাসিনও মাঝে মাঝে তোলে না। ওদের রেশন-কার্ডগুলো সুদেবের কাছেই জমা থাকে বারো মাস। সুদেব তার হিসেব মতো ফি-হপ্তায় ঐ সব কার্ডে তুলে দেয় মালগুলো। বাণেশ্বরের অজানা নেই এসব। মাঝে মাঝে মনে হয়, 'গরীব মাইনষের খাদ্য লিয়া ফাটকাবাজি সইবো নি' ধ্বনি তুলে শালাকে ফাঁসিয়ে দিলেই হয়। কানু সাঁতরার বড় ভক্ত হয়ে উঠেছে শালা। ইদানীং ইচ্ছেটা বড় চাগাড় দিয়ে উঠছিল তাই। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সামলে নিয়েছে বাণেশ্বর।

সন্ধ্যে এখন ঘনিয়ে এসেছে, পায়ে পায়ে গনেশ মিদ্যা এসে দাঁড়ালো বাণেশ্বরের উঠোনে।

বাণেশ্বর মিষ্টি হেসে বসালো পাশটিতে।

ডাক পাড়লো শিউলিকে, 'অ বৌমা, বাইরে একটা হারিকিন দিয়া যাও।'

জ্বলন্ত হ্যারিকেন এনে পাশটিতে নামিয়ে দেয় শিউলি। গণেশের দিকে তাকিয়ে হাসে। ঠাকুরপো, ভালো আছ?

ঘরের বউ-ঝিদের বাইরের লোকের সঙ্গে হ্যা-হ্যা, ফ্যা-ফ্যা করা একেবারেই পছন্দ করে না বাণেশ্বর। আজ কিন্তু খুশীই হল শিউলির ব্যবহারে। বললো, 'টুকচার চা বসাও গণেশের তরে।'

'না, না। চা' আমি খাবো নি।'

'আরে খাও খাও।' বাণেশ্বরের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি, 'তুমরা সব আজ-কালকার ছোকরা। চা খাবেনি, বললে হয়?'

গোয়ালে বড় মশা। গরমকালে বাড়ে। সন্ধ্যার আগেই গরু-বাছুর বেঁধে বেগুনো পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া করেছে বাগালটা। ধিকিয়ে ধিকিয়ে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে খড়ের চাল ভেদ করে। বেগনা পাতার ধোঁয়ায় মশা থাকে না। তাও বাণেশ্বর হাঁক পাড়ে, 'গুয়ালে ঢুকিয়া দ্যাখ্‌রে কেউ। আগুন-টাগুন লাগিয়াবে।'

চায়ের সঙ্গে মুড়িও আসে বাটিতে।

খেতে খেতে দেশ-কালের হরেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। মজুরীর আকাশ-ছোঁয়া দর, ছোটলোকদের আস্পর্ধা, জমি-জিরেত টিকিয়ে রাখার অনিশ্চয়তা, শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব,—সব কিছুই এসে পড়ে আলোচনায়।

'মুই ত' ভাবছি সর্বকিছু বিকিয়া-টিকিয়া দিয়া শহরের দিকে চলিয়াবো।' বাণেশ্বর বলে, 'গাঁ-গঞ্জে বাস করা এক ঝকমারি ব্যাপার এ যুগে।'

গণেশ মিদ্যা অবিশ্বাসের হাসি হাসে। ভাবে, কথার কথা। বলে, 'চলিয়া যাওয়া কি অত সোজা, জ্যাঠা? আপনার অত জমিন, পুকুর, বাগান।'

'সব বিকিয়া দুবো। কিচ্ছো রাখবো নি।' বাণেশ্বর স্পষ্ট গলায় বলে, 'আর একটা ব্যবসা খুলবো ভাবছি নারানগড়ে। ইট-সিমেণ্ট, রড্‌ বালি, চিপস্‌… এই সব। অগাধ বাড়ি ঘর হচ্ছে চার পাশে। ব্যবসাটা জমিয়াবে।'

'কে দেখবে অত ধুরের ব্যবসা?'

'ক্যানে? চপলা। অই দেখবে ব্যবসাটা। বলিয়া দিছি, অকে, কি করবি এই অজ গাঁয়ে বুসিয়া? চলিয়া যা শহরে। নৈতন লাইন ধর্‌। আজকাল চাষ-বাসে কিচ্ছো নাই। টাকা হইল ব্যবসায়।'

গণেশ মিদ্যা জবাব দেয় না। চুপটি করে বসে থাকে। একদিক থেকে দেখলে, কথাটা মিথ্যে নয়। গণেশ ভাবতে থাকে।

'বোনের ব্যা'র কিছো হইল?' বাণেশ্বর কথার খেই পরিবর্তন করে।

'নাহ্‌।' গণেশ ম্লান মুখে জবাব দেয়, 'কত জা'গা থিকে তো উপাড় আইলো, কুথাও কিছো হচ্ছে নি। আপনি যে প্রণব মাস্টারের সঙ্গে কথা কইবন্‌ কইছুলন্‌, কি হইল তার?'

'প্রণব মাস্টার না' করিয়া দিছে। কত চেষ্টা করুলি। শুনলো নি।'

'না করিয়া দিছে? ক্যানে?'

'সে নাকি গ্রাজুয়েট মায়া ছাড়া ব্যা হবে নি।' বাণেশ্বর বলে' 'শুন দেখি কথা। ক্যানে? গ্রাজুয়েট মায়া ছাড়া আর ব্যা হওয়া চলে নি? আশা কি দেখতে শুনতে খারাপ? সম্পন্ন ঘর পাইত, উচ্চ বংশ পাইত…। আসলে ছোকরার দেমাকটা বড় বেশি। এ গাঁ'র শিক্ষিত ছোকরাগুলাকেও তো সে মানুষ বলিয়া ভাবে মনে কর?'

এ হীনমন্যতায় ভোগে গাঁয়ের সবগুলি শিক্ষিত ছোকরা। ওদেরই বয়েসী

ছোকরাগুলো ভিনদেশ থেকে এসে দিব্যি জমিয়ে বসেছে। গণেশদের দিকে যেন করুণার চক্ষে তাকায়।

'একদিন ভাঙিয়া দুবো দেমাক।' নিজের মনে বলে ওঠে গণেশ। মনের ভাপ উগরে দেয় এইভাবে।

বাণেশ্বর একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে থাকে। বলে, 'পাশ করিয়া ত' বুসিয়া আছ। একটা চাকরি-বাকরি দ্যাখ এবার। বাপের উপর আর কত চাপাবে। করিয়া-কর্মি'য়া এবার হাল ধর সংসারের।'

গণেশ মিদ্যার মুখখানি আবার ম্লান হয়ে আসে। বলে কুথা পাবো চাকরি? কে দিবে!'

বাণেশ্বরের দিকে আশায় আশায় তাকায় গনেশ, 'আপনার পার্টি'তে খোব হোল্ড্। দ'ন না একটা জোগাড় করিয়া।'

'কুথা পাব? আজকালকার চাকরির বাজার জান? প্রাইমারী মাস্টার চলছে পাঁচ হাজার। তাছাড়া—।' বাণেশ্বর ঘোষ পোড়া বিড়িখানা ছুঁড়ে দেয় মাঝ উঠোনে, 'তাছাড়া তুমি বাপের এক ব্যাটা, তুমি ঘরের বাইরে বারিয়া গেলে হবে কি করিয়া? তুমার চাই ঘরের পাশে কুনো চাকরি।'

অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। তারপর বলে, 'গাঁর এই ইস্কুলটা যে বিদেশী মাস্টারে ছাইয়া গেছে। নাইলে ত' এ গাঁ'র সবগুলা শিক্ষিত ছোকরার চাকরি হইয়া যাইত।'

এ ক্ষোভও চারপাশের সমস্ত গাঁয়ের তাবত গ্রাজুয়েট ছোকরার মনে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে ধিকিধিকি। মাস্টাররা আসে যায়, চাকরি করে, মাসে-মাসে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফেরে। দেখে দেখে হিংসেয় জ্বলতে থাকে গণেশ মিদ্যার দল। আমরা সব পড়াশুনা শিখিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটছি। আর, এরা সব কুন দেশ থিকে আইসিয়া লবাবী কচ্ছে চোখের সামনে!

'দু' একটাকে তাড়ানো যাইতো, অই জায়গায় তুমাদের এক-আধজনের গতি হয়্যা যাইতো।'

গণেশ মিদ্যা এবার সরাসরি চোখ রাখে বাণেশ্বরের চোখে। সুস্পষ্ট একটা সুগন্ধ আসছে বাণেশ্বর ঘোষের কথা থেকে। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

'উই শালা প্রণব মাস্টারটাকেই তাড়িয়া দিবা যায় ইচ্ছা কল্লে। শালার বড্ড দেমাক। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। লঘু-গুরু জ্ঞান নাই। অত বড় বংশের অত সুন্দরী মায়া-ঝি, তাকে অবধি ঝিঁটিয়া দিল পায়ে। শালা ভাবে কি? এ গাঁ'য় সাইন্স পাশ ছোকরা নাই? অই কেবল একটিমাত্র ধনুর্ধ'র জন্ম লিছে এ দুনিয়ায়?'

প্রণব সায়েন্স গ্রাজুয়েট। ওকে তাড়ালে একজন সায়েন্স গ্রাজুয়েট চাকরি পাবে স্কুলে! গণেশ মিদ্যা নিমেষের মধ্যে জরীপ করে নেয় চারপাশ। তল্লাটের চারপাশের গাঁয়ে মাত্র দু'টি সায়েন্স গ্রাজুয়েট। একজন গণেশ মিদ্যা আর একজন যমুনার রাজকুমার দাস। নামে রাজকুমার, আসলে খেটে খাওয়া ঘরের ছেলে। অর্থবল, লোকবল কিছুই নেই তার। ছুটতে ছুটতে এক

কনুই গুঁতোয় ওকে ছিটকে দেওয়া যাবে! সহসা গণেশের মনের মধ্যে চকচক করে ওঠে রুপোলী লোভ। কৃতজ্ঞ চোখে বারবার তাকায় বাণেশ্বরের দিকে।

বলে, 'আপনি ভরসা দিলেই শালাকে খেদাই।'

'মোর ভরসা লিয়া কি হবে?' শিশুর মতো পবিত্র চোখ বাণেশ্বরের, 'মুই ত' চিরকাল গাঁ-র ছোকরাদিগের পক্ষে। অদের কি করিয়া উন্নতি হবে, অরা কি করিয়া বড় হবে—। আসলে, এ একার কাম নয়। জোট বাঁধতে হবে। একতা চাই। সব্বাইকে বুঝাইতে হবে। চারপাশের সমস্ত গ্রাম অর বিরুদ্ধে এক হইলে, তবে খেদানো যাবে অকে। আইজ-কাল মাস্টার খেদানো সহজ নয়।'

পুরো ব্যাপারটার মধ্যে জটিলতা লক্ষ্য করে কিঞ্চিত দমে যায় গণেশ মিদ্যা। তাও জাঁক করে বলে, 'আপনি বুদ্ধি-ভরসা দিলে ঠিক পারবো'। 'সুভাষ সংঘ'র সব ছোকরাকে নামিয়া দুবো কাজে। মুই আর চপলা বললে, অরা জান দিয়া দিবে। আপনি টুকচার চপলাকে বলিয়া রাখ্‌বেন্।'

'চপলা আর থাকছে কুথা গাঁয়ে? লৈতন বেব্‌সাটা ইস্টার্ট্ কল্লেই অ চলিয়া যাবে নারাণগড়। তাও যদ্দিন আছে, অবশ্যি খাটবে তুমার তরে।'

মনের মধ্যে অবিরাম বাতি উস্কাচ্ছে কেউ। গণেশ মিদ্যা গদগদ হয়ে ঢুপ করে প্রণাম করে ফেলে বাণেশ্বরকে। যেন এইমাত্র মাস্টারির নিয়োগপত্রটা হাতে পেলো সে। গুরুদেবের ভঙ্গিতে হাসে বাণেশ্বর ঘোষ। বলে, 'একটা কথা। যা কইর্‌বার কত্তে হবে কিন্তু জলদি। উদিকে 'তুমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'

গণেশ মিদ্যা বুঝতে পারে না বাণেশ্বর ঘোষের ব্রজবুলি। নির্বোধ ছাত্রের মতো ফাল ফাল চোখে বসে থাকে।

চাপা গলায় বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'উদিকে অই লধনার পুত্তুর সাইন্স লিয়া কলেজে ভর্তি হইচে সে। বীরকাঁড়ের ঠুরকো মল্লিকের ব্যাটা মধু মল্লিক। আর দিনকতক বাদে পাশ করিয়া আইস্‌বে সে। জান ত', আজকালকার চাকরিতে চুয়াড়-সাঁতালদের দাবী আগে। আদিবাসীদের চাকরি বাঁধা। অতএব, জলদি। ও পাশ কইর্‌বার আগেই চুকিয়া যাইতে হবে।'

গণেশ মিদ্যা আবার ভাবনায় পড়ে যায়। ওদিকে একটা লধনার বাচ্চা এমন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে নাকি তার মুখের ভাত কাড়তে! খেয়াল করেনি তো সেটা!

অটল সংকল্পে ফুঁসতে ফুঁসতে গভীর রাতে বিদায় নেয় গণেশ মিদ্যা। বাণেশ্বর ঘোষ জপের মালাখানি হাতে নিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে নিখাদ অন্ধকারে।

গণেশটাকে সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছে বাণেশ্বর ঘোষ। মাথা মোটা, রণচটা গোছের ছোকরা। আবেগপ্রবণ। এই মধু, তো এই বিষ।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সদর পুকুরে পিঠ ওলটায় পাকা রুই। বেশ আরাম বোধ করছে বাণেশ্বর। লম্বা হয়ে শুলো,

দাঁড়ির খাটিয়ায়। অন্ধকারে পায়ের শব্দ। চমকে ওঠে বাণেশ্বর। কে আসে? মুখ তুলে তাকায়।

শশিকান্ত ঢুকলো।

ভুরু কুঁচকে তাকায় বাণেশ্বর। অত রাত করে হঠাৎ শশিকান্ত এলো কেন? কোনও খারাপ খবর নয় তো?

মাথার ওপর হ্যারিকেনখানা দম কমানো ছিল। উঠে বসলো বাণেশ্বর। হ্যারিকেনের আলোখানা বাড়িয়ে দিল।

মুখে-হাতে জল দিয়ে বাইরে এলো শশিকান্ত। কথা বলে কম। ঠাণ্ডা ধাতের ছোকরা। প্যাঁচ-পয়জার কম বোঝে।

বাণেশ্বর একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে বড়ছেলের দিকে।

'কি রে? উখেনে সব ভালো তো?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় শশিকান্ত।

'তেবে? অত রাতে?'

'রমণীমোহনদা খবর দিছে, নারাণগড়ের জনার্দন দাসের হাতে।' শশিকান্ত বলে, 'উত্তর ধারের যে ভিটাটা বিডিও একুয়ার করার প্রপোজাল দিছুল, সেটা বাতিল হয়্যা গেছে।

শুনে মনখানা সহসা পুলকিত হয়ে ওঠে বাণেশ্বরের। রমণীমোহন কাজ করেছে তাহলে! প্রমোদ দত্তর বয়স হচ্ছে এখন সদরের পার্টি অফিসটা চালায় ও-ই। বড় উপকারটা করলো লোকটা। অতখানি ভিটা, সরকার নিয়ে নিলে জলে পড়ে যেতো চোট্টে। ক্ষতিপূরণ বাবদ কত টাকাই বা দিত? তাও ক'বছর বাদে তার ইয়ত্তা নেই।

শশিকান্ত বলে, 'রমণীদা কইছে, কালই সদরে গিয়া এল-এ সেকসনের হরিশ সাহাকে শ'টাক টাকা দিয়া আইসবে। সে-ই নোট দিয়া, কি সব খুঁত ধরিয়া বাতিল করিয়েছে। অর্ডার ধরিয়া বসিয়া আছে সে। টাকা পাইলে, ছাড়বে।'

'দিয়া আইসবো।' মনের পুলকে বলে ওঠে বাণেশ্বর, 'একশ টাকা কিছো না অমন একটা কাজের পক্ষে। বিডিও'র থুঁতা মু'টা যে ভোঁতা করিয়া দিছে, এই ঢের।'

মনটা আনন্দে নাচতে থাকে বাণেশ্বরের। কাল ভোর ভোর তাহলে যেতে হবে সদরে। জলদি জলদি শুয়ে পড়া দরকার। শশিকান্তর কাছ থেকে নারাণগড়ের ব্যবসা-পাতির টুকটাক খোঁজ-খবর নিয়েই হাঁক পাড়লো বাণেশ্বর, অ বৌমা, ভাত বাড়। রাত হয়্যাল।

॥ নয় ॥

ডিবরির আলোটা দু'জনের মধ্যিখানে বসে নৃত্য শুরু করেছে। কালো সিস্ উঠে যাচ্ছে আকাশে। অতীত জীবনের গল্প জুড়েছে মুরলী কোটাল। সব কিছুই তার স্মৃতির মধ্যে ভীষণ জীয়ন্ত।

অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে, নাকি ঘরের চালে-বাতায়, কোথাও অবিরাম 'কুট-কুট' আওয়াজ। ইঁদুর গোছের কোনও জানোয়ার ধারালো দাঁত দিয়ে কিছু কেটে চলেছে। বড় অস্বস্তি লাগে গোক্ষুরের।

মুরলী কোটালের শৈশব কেটেছে খেজুর কুটির লোধা পাড়ায়। অনাদি মল্লিকের পাশ বিদ্যা শিক্ষা। তার দলেই হাতেখড়ি। অনাদি মরলো রক্তবমি করে। মুরলী কোটাল তখন আকাট জোয়ান। একলা সে বিশটা লোকের মহড়া নেবার ক্ষমতা রাখে। দল গড়লো মজবুত করে। একেবারে চালু দল। মাসে তিন-চারটে বড় বড় কাজ নামায়।

পাশের গাঁ সাঁতরাপুর। খেজুরকুঠি আর সাতরাপুর মিলে চালু করলো আর-জি পার্টি। ছোকরার দল রাতভর 'হো—হো,' 'খবরদার' বলে ঘুরে বেড়ায় গাঁ-ময়। পাহারা দল চেল্লালে চোর-ডাকাতের সুবিধে। চোর বুঝতে পারে, পাহারাদার গাঁয়ের কোন্ প্রান্তে। সেই মোতাবেক কাজ-কাম সারে। সাঁতরাপুরের হরিশ ভট্টাচার্য ছিল তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি।

বললো, 'এভাবে নয়। পাহারা হবে নিঃশব্দে।'

সেইভাবেই চলে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসে নিঃশব্দে নজরদারি করে রাত-পাহারার দল। মানুষজনের আনাগোনা লক্ষ্য করে। পাড়ায় পাড়ায় কুকুর এবং গাছে-গাছালিতে পাখি-পাখালের ডাক অনুসরণ করে। একদল নিঃশব্দে বসে থাকে লোধা পাড়ায় ঢোকা-বেরোনোর পথের ধারে। কয়েক খণ্ড মাকড়া পাথরের মত। ওরা কখন বেরোয়, কখন ঢোকে, ক'জন থাকে,—সব তথ্য পরিবেশন করে পরের দিন সকালে।

একদিন রাতের বেলায় খেজুর কুটির পাহারাদাররা বয়ে আনলো জরুরী খবর। মুরলী কোটালের দল ভাগ ভাগ হয়ে বেরিয়ে গেল ডাকাতি করতে। সাজো সাজো রব উঠলো দু'গাঁয়ে। দলে দলে ভাগ হয়ে প্রায় জনা পঞ্চাশ মানুষ ওত পেতে রইলো লোধাপাড়ার চারদিকে। যেদিক দিয়েই ফিরুক শালারা, ধরা পড়বেই। ধীরে ধীরে গড়াতে থাকে নিশুত রাত। কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদ ঘসা ঘসা আলো ছড়িয়ে দেয় মাঠময়। শেষ রাতের ঘুম পাড়ানি হাওয়া অবশ করে দিতে চায় শরীর।

অবশেষে সময় আসে। সাঁতরাপুরের মাঝামাঝি ঝাঁ ঝাঁ করে ডেকে ওঠে কুকুর। কিছুক্ষণ বাদে ফের ডাকে দাসেদের ধান-কুটাই কলে। তারও কিছুক্ষণ বাদে ঝুপ ঝুপ করে এগিয়ে আসে দুটি ছায়ামূর্তি চাঁদের ঘসা আলোর পাতলা চাদর ভেদ করে।

সময় বুঝে 'হুইসিল' মারে দলের লিডার। হৈ হৈ করে আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে পাহারাদারের দল। হতভম্ব দু'জনের একজন পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। পচু ভক্তা ধরা পড়ে যায়। মুরলী কোটালসহ দলের অন্যরা ছিল নিরাপদ দূরত্বে। বেগতিক বুঝে পালিয়ে যায় সবাই।

পচু ভক্তাকে পরের দিন টাঙানো হলো খেজুরকুটি ক্লাবের কড়িকাঠে। নিতান্ত নবীশ ছিল সে। মার খেয়ে সত্যি মিথ্যা যা মুখে এলো বললো। বিকেল নাগাদ চৌকিদার দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে।

হরিশ ভট্‌চার্য দিল মূল্যবান পরামর্শ। পালিয়ে যাবে কুথা শালারা? তক্কে তক্কে থাকো সব। ঘরে ফিরবেই দু'চার দিন বাদে। দিনের বেলায় লক্ষ্য রাখো, ও পাড়ার মেয়েরা কাঠ কুড়োবার ছলে কোন্ জঙ্গলে সেঁধায়। কাঠ কুড়ানোর নামে মরদদের খাবার দিতে যাবেই ওরা।

লেগে গেল গোয়েন্দা বাহিনী। এবং দিন তিনচার বাদে আবার খবর এলো, মুরলী কোটাল এসে নিজের ঘরে ঢুকেছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দু'গাঁয়ের পঞ্চাশ জন মানুষ। ঘিরে ফেললো মুরলীর ঘর। হম্বিতম্বি, ধাক্কা ধাক্কি করে দরজা যখন খোলানো হলো, পাখি তখন ঘরের চাল ফুটো করে খিড়কির পথে উধাও।

বউ বললো, 'আসেনি উ। তুমরা অকে মারিয়া ফেলছো। পাড়ার সক্কলে বলছে। মারিয়া পুঁতিয়া দিছু। উ যেদি না ফিরিয়া আসে তো তুমরা দায়ী।'

শুনে দমে যায় পাহারাদারের দল। বুঝতে বাকি থাকে না, কোনও পাকা মস্তিষ্কের কথা এগুলো। লোধা মেয়ের মুখ থেকে এই কূট ভাবনা আশা করা যায় না। কে পেছনে রয়ে কলকাঠি নাড়ছে? কে?

ঐ দিনই গভীর রাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো মুরলী কোটালের ঘর। দু'গাঁয়ের লোক ছুটলো তৎক্ষণাৎ। ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, জ্বলে খাক হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে পুড়ে মরেছে মুরলীর মুরগী আর ছাগলগুলি।

হরিশ ভট্‌চার্য বললো, 'কেস খুবই জটিল। ঘর পোড়া কেসে জড়াতে চাইছে শালা দু'গাঁয়ের মানুষকে। আশ্চর্য! এই সর্বনাশা বুদ্ধি কে দিল ওকে?'

কেস করতে হলে সদর কোর্টে করতে হবে। থানায় গেলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে মুরলীকে। অন্তত সাত আটটি ডাকাতির কেস ওর মাথায়। সদর কোর্টে মামলা রুজু করে, দু'গাঁয়ের মানুষের নামে ওয়ারেন্ট বের করতে চায় মুরলী।

অনেক ভেবে চিন্তে নিদান দিল হরিশ ভট্‌চার্য। আটকাতেই হবে শালাকে। যে কুনো গতিকে। মেদিনীপুরের সদর কোর্টে যাবার পথগুলো 'সিল' করে দিতে হবে আজ রাতেই।

খেজুরকুটি থেকে পায়ে হাঁটা পথে কেশিয়াড়ী, দুধিয়া-বুঁদিয়া, ল্যাঙামারা, হাতিগেড়্যা অথবা খাজরায় গিয়ে বাসে চড়তে পারে মুরলী কোটাল।

কেশিয়াড়ীতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ থানা রয়েছে ওখানে। চটপট তৈরী হয়ে নিল চারটি দল। প্রতি দলে দশজন করে ষণ্ডামার্কা ছোকরা। সাইকেলে চড়ে রওনা হল তারা চারটি থানের দিকে। মেদিনীপুর যাওয়ার ফার্স্ট বাস আসতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি আর। চারটি জায়গায় দূরত্ব কমপক্ষে তিন মাইল। বেশির দিকে পাঁচ। পাঁই পাঁই সাইকেল চালিয়ে উধাও হয়ে গেল ওরা আঁধার ফুঁড়ে। হরিশ ভট্চার্য বললো, যদি শালা যায় তো ল্যাঙামারা থেকেই উঠবে। দু'ধারে জঙ্গল। নামেই বাস স্টপেজ। লোকজন দোকান পাট কিছুই নেই সেখানে। নিঃশব্দে বাসে উঠে পড়বার পক্ষে জায়গাটা আদর্শ।

হরিশ ভট্চার্য যে কত বিবেচক ব্যক্তি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সকালে। লেঙ্গামারাতেই ধরা পড়লো মুরলী কোটাল।

পুলিশ এলো বেলা করে। নিয়ে গেলো মুরলীকে। চালান দিলো সদরে।

থানার বড়বাবু খেললেন আসল খেলাটি। ডাকাতির কেসে মুরলীকে চালান দিলেন বটে। সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর ঘর-পোড়া কেসের ডায়েরীটাও নিলেন। এবং দুগাঁয়ের কাছ থেকে নগদ দশ হাজার টাকা আদায় করে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিলেন।

কেসে পাঁচ বছর জেল হলো মুরলী কোটালের। বউ তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ততদিনে থিতু হয়েছে তার ভাইয়ের কাছে যমুনায়।

খালাস পেয়ে যমুনায় গিয়ে বসবাস জুড়লো মুরলী। তার মনে তখন ধিকি ধিকি জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। হরিশ ভট্চার্যকে একটিবার দেখবে সে। দল গড়লো ফের। আরো দুর্ধর্ষ দল।

পুরো দল নিয়ে একরাতে হরিশ ভট্চার্যের বাড়িতে হানা দিল মুরলী। সে এক অপ্রতিরোধ্য দল। গাঁয়ের মানুষের সাহস নেই ঐ দলের মোকাবিলা করে। হরিশ ভট্চার্যের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল অলৌকিক ভাবে সজাগ। মুরলী খালাস পাওয়ার পর থেকেই সে ছিল খুব বেশি রকমের সজাগ। ফলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায়ও মুরলী কোটালের দল দরজা ভেঙে ঢুকতে পারলো না ঘরে। দোতলা থেকে বন্দুক ফোটাচ্ছিল' হরিশ ভট্চার্য নিজে। তার তিন জোয়ান ব্যাটা এবং মুনিশ মাইন্দর আগলাচ্ছিল সদর ও খিড়কির দরজা। ধান চালের বস্তাগুলোকে টেনে টেনে ঠেসান দিয়েছিল দরজার গায়ে।

রাত পুইয়ে আসছে দেখে মুরলী কোটাল নিল এক নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি। শেষ অবধি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল বাইরের শিকল তুলে দিয়ে। আধঘণ্টা কাল দাঁড়িয়ে পাহারা দিল নিরাপদ দূরত্বে। তারপর কুলকুলি' মেরে ফিরে গেল।

চুপ করে বসে থাকে মুরলী কোটাল। গোপ্দুরও ভাষা খুঁজে পায়না।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে মুরলী কোটাল ভারি গলায় বলে। 'সে রাতে হরিশ ভট্চার্যের পুরা বংশটি পুড়িয়া মল্ল। বংশে বাতি দিবার তরেও

রইলোনি কেউ।'

আঁধার গাঢ় হয়েছে চারপাশে। হাওয়া বইছে শনশনিয়ে। ডিবরির আলো দ্বিগুণ বেগে নাচছে। মুরলী কোটালের ছায়াখানিও পেছনের দেওয়ালে পিশাচের মত নৃত্য জুড়েছে।

'কুট-কুট' আওয়াজটা নিরবছিন্ন চলেছে। শুনতে শুনতে…শুনতে… গোক্ষুরের এক সময় মনে হয়, আওয়াজটা ঢুকে গেছে ওর মগজে। চারিয়ে গেছে। বাইরের আওয়াজ থেমে গেছে বুঝি অনেক আগে! মগজের আওয়াজটা ক্রিয়াশীল। এরকম একটা বিরক্তিকর আওয়াজ মগজের মধ্যে পাকাপাকি বাসা বাঁধলে মুশকিল। গোক্ষুর অনামনস্ক হওয়ার চেষ্টা করে। একটা চুটা ধরিয়ে ভক্-ভক্ ধোঁওয়া ছাড়ে।

এনামেলের বাটিতে করে দুবাটি চা দিয়ে গেল পঞ্চমী। দুধ ছাড়া গুড়ের চা। গোক্ষুর পঞ্চমীর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখে। বিষাদে ভরা করুণ দুটি চোখ।

চায়ের বাটি বসিয়ে দিয়েই ঝাঁঝিয়ে ওঠে পঞ্চমী, 'তুমাদের কি আর কুনো কথা নাই? খালি চুরি-ডাকাতির গল্প।'

মেয়ের ধমকে চুপ করে যায় মুরলী কোটাল। চায়ের বাটিতে চুমুক মারে। গরম গুড়জলের স্বাদ নেয় তারিয়ে তারিয়ে। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরীখ করে রাত।

এ ক'দিনে মুরলীর মুখ থেকে অনেক লোমহর্ষক ডাকাতির গল্প শুনেছে গোক্ষুর। কিন্তু হরিশ ভট্চাজের ঘর পোড়ানোর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

বিড় বিড়িয়ে বলতে থাকে মুরলী কোটাল, 'একটা পুরা বংশ লোপ পাইয়া গেল, বিনা দোষে।'

'বিনা দোষে ক্যানে?'

'অর আর দোষ কি, বল্?'

'বারে, তুমাদের যে বুদ্ধি করিয়া ধরুল। তুমার জেল হইল।'

মুরলী কোটাল ম্লান হাসে। বলে, 'দ্যাখ্ বাপ, চোরের কাজ চুরি করা। গিরস্থের কাজ চোর ধরা। চুরি করা যদি দোষের নাই হয়, চোর ধরাও দোষের নয়। এটা তো গিরস্থের ধর্ম। সেটাই কচ্ছে হরিশ ভট্চাজ। তার অনুপাতে কুনু অন্যায়টা সে কল্ল, বল?'

চায়ের বাটিখানি ঠক্ করে নামিয়ে রাখে মুরলী। বলে, 'গু'খাবা বিদ্যা এসব। ভালা নয়, মোট্টো ভালা নয় রে।'

এখন, এই বৃদ্ধ বয়েসে মুরলী কোটালের সর্বাঙ্গে জ্বালা। পোড়া পোড়া জ্বালা। দিনে চার-পাঁচ বার বামন-গেড়িয়ায় ডুব দিয়েও সে জ্বালা কমেনা। গোক্ষুর বলে, 'পিত্ত প্রবল। তিতা খাও।'

মুরলী কোটাল তেতো হাসে।

'এ পিত্তের জ্বলন্ নয় রে বাপ। এ জ্বালার মাহিত্য মুই বুঝি।'

গলাখানি আপনসেই খাটো হয়ে আসে মুরলীর, 'একটা পুরা বংশ পুড়িয়া মল্ল আমার হাতে! সারা অঙ্গ জ্বলে কি সাধে?'

শালপাতার চুটাখানি কান থেকে টেনে আনে মুরলী। ধরায়। প্রবল আক্রোশে ধোঁয়া ছাড়ে ভক্‌ভকিয়ে।

বলে, 'সারাজীবন অত ডাকাতি করিয়া কি লাভ হইল বল্? গাঁয়ের বড়লোকগুলান আরো বড়লোক হইল চুরির মালে। আইজ মোর তিন-তিনটা ঝি। ব্যাটা-পুত্তুর হইলো নি। বংশের বাতি দিবার কেউ রইলো নি মোর।'

চোখের কোণা চিক চিকিয়ে ওঠে বুড়ার। গলা ধরে আসে। বাক রোধ হয়ে যায়।

পঞ্চমী এসে পাশটিতে বসে। ধীরে ধীরে হাত বোলায় মুরলীর শীর্ণ পিঠে।

পঞ্চমীর গায়ের গন্ধ পায় গোক্ষুর। উথলানো দুধের গন্ধ। পঞ্চমী বলে, 'চল, ভিতরে চল। রাত হইল। শুইয়া পড়।'

মেয়ের দিকে থির পলকে তাকায় মুরলী। ঠোঁট জোড়া তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে।

বলে, 'অই দ্যাখ্ এটার কপাল দ্যাখ্। ব্যা-ঘর হইলো ফাগুনে। পরের কার্তিকে চুরি করতে গিয়া মরলো ছোকরাটা। মুই দু'চোখ বুজলে এটাকে দেখবে কে?'

সহসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মুরলী কোটাল। পঞ্চমীর কোলে মাথা গুঁজে শিশুর মত রোদন জুড়ে সে।

পঞ্চমী বলে, 'গোক্ষুরদা, আজ তুমি যাও। অন্য দিন আইসো। না নিদালে এর কান্না আইজ থামবে নি।

এক নতুন অচেনা গলায় কথা বলে পঞ্চমী। জল ভরা মেঘের মত মমতায় ভারি। তাল শাঁসের মত নরম।

গোক্ষুর তাও বসে থাকে। একটা কথাই কেবল বলবার তরে লকর-পকর করে মন। বলতে চায়, ভেবোনি মুরলী জ্যাঠা, মুই ত' রইলাম। তুমার অন্তে পঞ্চমীর ভাবনা মোর। কথাগুলো বলতে পারে না গোক্ষুর। ঠায় বসে থাকে।

খানিক বাদে নিজেকে কোনও ক্রমে সামাল দেয় মুরলী কোটাল। সোজা হয়ে বসে। গোক্ষুরকে থির পলকে পর্যবেক্ষণ করে।

বলে, 'এ বিদ্যা তুই ছাড়িয়া দে গোক্ষুর। বাপ বিহনে, মুই তোর বাপের তুল্য। মুই তোকে বিনতি কচ্ছি, তুই একাজ জন্মের মতন ছাড়্।'

মুরলী কোটালের চোখের কোণায় পিচুটি টলমল করে ওঠে।

গোক্ষুর বিপন্ন বোধ করে। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

বলে, 'কাজ ছাড়িয়া দিলে কি খাবো জ্যাঠা?'

'ক্যানে? খাটিয়া খাবি।' সহসা যেন জ্বলে ওঠে মুরলী কোটাল,

দুনিয়ার মানুষ খাটিয়া খাচ্ছে, তুই পারবি নি ?'

গোক্ষুর গভীর সমস্যায় পড়ে। কথাটা বলা যত সহজ, গোক্ষুরের পক্ষে মেনে চলা ততই কঠিন। মুরলী জ্যাঠা কি জানে না, এ পথে আসা যত সোজা, ফিরে যাওয়া তত নয়। এক শিকল গায়ে জড়ালে লক্ষ শেকল হয়ে তা আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে।

অসহায় গোক্ষুর পঞ্চমীর চোখের ওপর চোখ রাখে। নিষ্পলক চোখ পঞ্চমীর। সে চোখে যেন রাজ্যের ব্যাকুলতা। যেন বলতে চায় 'কয়্যা ফেলাও, কয়্যা ফেলাও গো। বাপের কথায় রাজি হয়্যা যাও তুমি। মোর অবস্থাটা কি হইচে একটিবার ভাবো !

জঙ্গল থেকে হু-হু হাওয়া বয়ে আসে। উড়তে থাকে পঞ্চমীর রুক্ষ চুল। শাড়ির বিবর্ণ আঁচল উড়তে উড়তে রঙ বদলায়।

গোক্ষুর উঠে দাঁড়ায়। উঠোন পেরিয়ে আগড়ের দিকে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে।

পঞ্চমী বসে থাকে ঠায়।

পিছু না ফিরেও গোক্ষুর অনুভব করে, ওর দু'খানা চোখের দৃষ্টি ছুরির ফলার মত বিঁধে গিয়েছে গোক্ষুরের পিঠে।

॥ দশ ॥

নারানগড় থেকে মেট্যাল মাইল চারেক। মাইল তিনেকের মাথায় কেলেঘাই নদী। নারানগড় থেকে নদীর ধার অবধি রাস্তাখানি সংস্কার করা হয়েছে ব্লক থেকে। শুকনোর দিনে রিকশা ভ্যান চলতে পারে। তেমন একটা কেউ যায় না রিকশা ভ্যানে। দু'একজন হাঁটা-কাতুরে মানুষ। বুড়ি-থুড়ি ঠেকায় বে-ঠেকায় ক্কচিৎ-কদাচিৎ ভাড়া করে রিকশা-ভ্যান। ভাড়া দিতে হয় অসম্ভব বেশি।

গীতালী একটা রিকশা ভ্যানই নিল। চৈত্র মাস। আড়াই পহর বেলা। রোদ্দুরে তেজ আছে। অতটা পথ হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। হাতে একখানা মাঝারি সাইজের ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। দরদাম করে ভ্যানে চড়ে বসলো গীতালী। কেলেঘাইর পাড়ে গিয়ে নামিয়ে দেবে। গীতালী বাকি পথটুকু হেঁটেই যাবে।

কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে। পলাশ ফুটবে দিনকয় বাদে। এদিকে পলাশ ফোটে খুব।

লাল ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে ভ্যান। একটা রোগা প্যাটকা ছোকরা সিটে বসে প্রাণপণে প্যাডেল দাবাচ্ছে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় গীতালী।

এমনিই হয় তার। একাকী হয়ে গেলেই মন হারিয়ে যায় হাজারো ভাবনায়। কৈশোর থেকে আজ অবধি পুরো জীবনখানি একে একে এসে দাঁড়ায় সামনে। ঠিক যেন বায়োস্কোপের ছবি!

জ্ঞান হয়ে অবধি গীতালী উপলব্ধি করেছে, চার পাশের বাচ্চাদের চেয়ে সে কোনও কোন বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। প্রায় সবাইয়ের বাড়িতে মা, বাবা, কাকা, কাকী, জেঠা, জেঠী, দাদা কিংবা দিদি—এই সম্পর্কের মানুষগুলো, একটা বাড়িতে কিংবা পাশাপাশি বাস করে। কেবল গীতালী যে বাড়িখানায় বাস করে, সেখানে 'মা' ছাড়া অন্য সম্পর্কের মানুষগুলো বেমালুম উধাও। তার বদলে ঐ বাড়িতে থাকে অন্য সম্পর্কের মানুষ, মামা-মামী, দাদু-দাদি, মাসী…।

ছোটবেলায় কত্তোবার সে মাকে শুধিয়েছে, 'মা-গো' এ ঘরে কেন বাবা, কাকা, দাদু-ঠাকুমা'রা থাকে নি? কেন মামা-মামীরা থাকে? তাদের ত' অনেক দূরে কুথাও থাকবার কথা।'

ধীরে ধীরে বয়েস বেড়েছে গীতালীর। বোধ-বুদ্ধি বেড়েছে। ক্রমে ক্রমে সে বুঝেছে, যেখানে সে বড় হচ্ছে, সেটা তার নিজের বাড়ি নয়। নিজের গ্রাম নয়। তার বাবা কোন্ দূর দেশে লড়াই করতে গেছে। মামা বাড়িতে কেউ কোনদিন খারাপ ব্যবহার করে নি ওর সাথে। বরং অন্যদের তুলনায় ওর প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছে সব ক্ষেত্রে। দাদু এবং মামারা ওকে ভালো খাইয়েছে, পরিয়েছে, ভালো স্কুল-কলেজে পড়িয়েছে। সেই অর্থে কোন অভাব নেই গীতালীর। তবুও এক ধরনের অভাব বোধ সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর নিত্যসঙ্গী। সব পেয়েও কেমন যেন নিজেকে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় এবং অপরের গলগ্রহ মনে হয়। যতই বয়স বাড়ছে, মামার বাড়িতে বসবাসটাকে ক্রমশ পরবাস বলে মনে হচ্ছে। বাবা ফিরে আসার পর, নিজের গাঁয়ে, জন্মভূমিতে, ফিরতে চেয়েছিল গীতালী। বাদ সাধলো বাবাই! একদিন রহস্যজনক ভাবে সেও চলে গেল ওপারে! বাবার পিছু পিছু মাও। গীতালীর স্বদেশে ফেরার স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন আর মেট্যালে থাকবার কথা ভাবে না সে। এই গাঁয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক সে চিরকালের মত চুকিয়ে দিতে চায়। পৈত্রিক সম্পত্তিগুলো বেচে দিয়ে ঐ পয়সায় স্বাধীন ভাবে কিছু করতে চায়।

পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর বাস্তবিকই কোনও লোভ কস্মিনকালেও ছিল না গীতালীর। কোনও দিন ভাবেও নি, যে বাবাকে তেমন করে পেলোই না জীবনে, তার কিছু জমি-জায়গার জন্য তাকে জেঠার বিরুদ্ধে সত্যি সত্যিই যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যা দরকার ছিল একান্তভাবে, তা যখন পেলোই না, যা দরকার নেই তার জন্যে কেন এতো মনান্তরে যাওয়া! কিন্তু বাবার আচমকা খুন হয়ে যাওয়া এবং মামাদের খুনের কেসে জড়িয়ে দেওয়া, পুরো ব্যাপারটিই তাকে বদলে দিয়েছে পুরোপুরি। এখন সে তার জেঠা বাণেশ্বর ঘোষকে সন্দেহ করে, ঘৃণা করে। বাবাকে খুন করবার কারণ যদি এই সম্পত্তি হয়

তবে সেই সম্পত্তি সে জেঠাকে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে দেবে না। দরকার হলে কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দেবে যাকে খুশী। গীতালী মনস্থির করেই ফেলেছে।

রিকশা ভ্যানের গতি একেবারেই কমে গিয়েছে। পুরু বালির নালার মধ্য দিয়ে চলেছে গাড়ি। প্যাডেল করে নয়, লোকটা টেনে টেনে চলেছে ভ্যানখানা। রোদ্দুরের তেজ আরো বেড়েছে। গরম হাওয়ায় হলকা ছড়াচ্ছে চার পাশে।

একটি ছোকরা অনেকক্ষণ ভ্যানটার পিছু পিছু হাঁটছে। ছেলেটিকে লক্ষ্য করলো গীতালী। বছর বিশেক বয়স। গায়ের রঙ কালো হলেও বেশ লম্বা এবং গাট্টা-গোট্টা গড়ন। পরনে সস্তা ধুতি ও শার্ট। পায়ে সস্তা চপ্পল। কাঁধে একখানি কাপড়ের ব্যাগ।

রিকশা ভ্যানটি যে গতিতে চলছে, তাতে ছেলেটি সাধারণভাবে হাঁটলে অনেক আগেই ওদের ছাড়িয়ে চলে যেতো। কিন্তু কেন জানি সে রিকশা ভ্যানের পিছু পিছু মন্থর গতিতে হাঁটছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল গীতালী।

রোদের তাপে এবং পুরু বালির ওপর এক নাগাড়ে ভ্যান টেনে টেনে সিড়িঙ্গে ভ্যানওয়ালাটি দরদরিয়ে ঘামছে। এক সময় একটা চড়াই মতো জায়গায় এসে থেমেই গেল সে। টানাটানি করেও এক চুল সরাতে পারলো না ভ্যানের চাকা।

আচমকা ছেলেটি ভ্যানের পেছনে হাত লাগালো। বললো, 'টানো ভাই জোরসে।'

ভ্যানওয়ালার টানাটানি এবং পেছনের ছেলেটির ঠেলায় চড়াইটা পেরিয়ে গেল। আবার ধীর গতিতে চলতে লাগলো ভ্যান।

বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল গীতালীর। একজন গ্যাট হয়ে বসে থাকবে ভ্যানের ওপর, দু'দিক থেকে দু'জন মিলে সেই ভ্যান গড়াবে, না চড়লেই ভালো ছিল। ছাতাখানা খুলে নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে চলে এলেই বেশ হতো।

মাথা পুড়ে যাচ্ছে রোদে। ছাতার কথা মনে হতেই তা মালুম হলো গীতালীর। কিন্তু সঙ্কোচের বশে ছাতাখানিকে কিছুতেই খুলতে পারলো না সে। দু'জনে মিলে রোদে পুড়তে পুড়তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার ভ্যান, আর সে কিনা ছাতার ছায়ায় আরাম করে বসে, দেখতে দেখতে যাবে সেই দৃশ্য!

চোখাচোখি হতেই ঠোঁটের কোণে হাসে ছেলেটি।

গীতালী অস্বস্তি বোধ করে। তাও ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফোটাতেই হয় তাকেও।

'দিদি নিশ্চয়ই মেট্যাল যাবে?' ছেলেটি এবার সরাসরি শুধিয়ে বসে।

মাথা দোলায় গীতালী, 'কি করে জানলে?'

'আমি তুমাকে চিনি।' জবাব দেয় ছেলেটি, 'তুমি ত' বাগেশ্বর ঘোষের ভাইঝি।'

গীতালী অল্প বিস্মিত হয়।

'তোমার বাড়ি কি মেট্যালেই ?'

'না, বাড়ি মোর বীরকাঁড় গ্রামে। ঐ যে বাঁ-দিকের গ্রামটা দেখছো।' ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখায়, 'তেবে, এখন আমি মেটালেই যাবো। মোর মাউসীর ঘর ডিহিপারে।'

ডিহিপারে অধিকাংশই লোধাদের বাস। তাদের বেশভূষা চাল-চলন অন্য রকম। ছেলেটি তবে কোন্ জাতের ?

ডিহিপারে কারে ঘরে ?'

অল্প চুপ করে থাকে ছেলেটি।

তারপর বলে, 'নাম বললে কি চিনব ? হারি বলিয়া এক বিধবা মায়া আছে না ডিহিপারের পাড়ায়, ধাইগিরি করে, সে মোর মাউসী। মোর নাম মধু মল্লিক।'

নাম শুনেই চিনতে পারে গীতালী। প্রণবের কাছে নামখানি শুনেছে বার কয়েক। ছেলেটির ভারি প্রশংসা করে প্রণব।

'তুমি ত' বি-এস-সি পড়। খড়গপুর কলেজে। তোমাকে চিনি।'

সে কথায় ঈষৎ সঙ্কুচিত বোধ করে মধু। বলে, 'উই একটু-আধটু পড়ি-টড়ি আর কি। সে কিছো নয়।'

'কি বলছো তুমি ?' গীতালী সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'তোমাদের সম্প্রদায়ে তোমার মতন আর দু'টি নাই। মেট্যাল স্কুলের প্রণববাবু তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

ভীষণ লজ্জা পায় মধু। বলে, 'প্রণব স্যার মোকে বেজায় ভালো পান। মেট্যালে গেলে মুই উনার কাছ থিকে অনেক পড়া বুঝিয়া লিই।'

ভ্যান এসে গেল কেলেঘাইয়ের পাড়ে। ভাড়া মিটিয়ে হাঁটতে শুরু করলো গীতালী।

'ব্যাগটা মোকে দও।' হাত বাড়িয়ে দেয় মধু।

'না, না, কি এমন ভারি ?' গীতালী প্রবল আপত্তি জানায়।

ব্যাগখানা ওর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেয় মধু। দু'জনে পায়ে পায়ে নামতে থাকে কেলেঘাইয়ের গহ্বরে।

নদীর বুক খাঁ-খাঁ। দু'পাশে প্রশস্ত বালির চর। মধ্যিখান দিয়ে সরু স্রোত বয়ে চলেছে তিরতিরিয়ে। কাচের মত স্বচ্ছ জল। তাতে খেলে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়িয়া মাছ। বালির ওপর শশা আর তরমুজ লাগিয়েছে পাশাপাশি গাঁয়ের চাষীরা। বন-কলমী দিয়ে বেড়া দিয়েছে। এখন ঠায় দুপুর। জন-মনুষ্য নেই ধারে কাছে। কেবল দুধারের ঘন গাছ-গাছালিতে গা-লুকিয়ে ডেকে চলেছে হরেক জাতের পাখি।

জায়গাটুকু একা একা পার হতে হলে ভয় করতো গীতালীর। সঙ্গে মধু আছে, তাই রক্ষে।

হাঁটু জলে শাড়ি তুলে পার হয়ে গেল গীতালী। লাল টুকটুকে চটি জোড়া তুলে নিয়েছে হাতে। মাথার চুল ফুরফুরিয়ে উড়ছে কপালের ওপর। ফর্সা নাকের ডগায় চিক চিক করছে ঘাম।

ঝোপের মধ্যে বসে রয়েছে একজোড়া কপ্‌তুর পাখি। গায়ে ছিটে ছিটে দাগ। গলায় কণ্ঠির মালা।

নদী পেরিয়ে আবার হাঁটা শুরু করেছে দু'জনে।

'তুমি আমাকে চিনলে কি করে?' গীতালী শুধোয়।

'বা-রে! মুই তো মাঝে মাঝেই মেট্যালে গিয়া থাকি। তুমিও তো ইদানীং আসতেছ ঘন ঘন। সেদিন তুমি প্রণব-স্যারের ঘরে গিয়া ঢুকলে। মুই স্যারের পাশে পড়া বুঝিয়া ফিরতেছিলাম তখন। তুমি মোকে লক্ষ্যই করনি।'

বেশ কথা বলে ছেলেটি। সঙ্কোচের বালাই নেই। চোখে-মুখে এখনো ছেলেমানুষী সারল্য।

'আমার কিন্তু ভারি অবাক লাগছে তোমাকে দেখে।' গীতালী বলে।

দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় মধু।

'লোধা সম্প্রদায়ের ছেলে হয়ে তুমি বি-এ-সি পড়ছো! ভাবা যায় না।'

সহসা গুম মেরে যায় মধু। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। এক সময় মৃদু গলায় বলে, 'কত কষ্ট করিয়া যে অদ্দুর আস্‌সি, তা ভগবানই জানেন।'

দু'পাশে খাঁ-খাঁ ন্যাড়া মাঠ। আলে আলে পলাশের ঝোড়। দূরে দূরে গাঁ। মা-মনসা, কাশীপুর, ...।

চৈত্রের আকাশ আগুন ঝরাচ্ছে। তপ্তনীল আকাশে চক্কর মারছে ডোম-চিলের দল।

গলগলিয়ে ঘামছিল গীতালী। ফর্সা মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে।

পায়ে পায়ে পথ ফুরোচ্ছিল। শরীরের কষ্ট ভুলতে এক সময় কথা-বার্তায় বুঁদ হয়ে যায় ওরা। মধু মল্লিক ধীর গলায় শোনাতে থাকে তার পথ ভাঙার ইতিবৃত্ত।

বীরকাঁড়ের ঠুরকো মল্লিক জোয়ান বয়েসে ছিল পাক্কা ডাকাত। ধীরে ধীরে চোখে ছানি পড়লো তার। দু'বার কাটিয়েও কিছু হলো না। বেশি বয়েসের ছেলে মধু। প্রাইমারী ইস্কুলে সে নাকি সেরা ছাত্র। মাস্টাররা নাকি তাকে প্রশ্ন জিগাবার সাথে সাথেই সে জবাব দিয়ে দেয়। সকলে তাজ্জব মানে। দৈত্যকুলে কে এ প্রহ্লাদটি আইলো হে!

ফার্স্ট ডিভিশনে প্রাইমারী পাশ করলো মধু। হাই স্কুল বলতে এদিকে নারাণগড়, ওদিকে মেট্যাল। অতটুকু ছেলের পক্ষে দু'টোই দূর। পড়তে হলে বোর্ডিং-এ ভর্তি হতে হয়। মাসে মাসে চব্বিশ সের চাল আর পাঁচ টাকা নগদ। এ ছাড়া ভর্তি ফি, ইস্কুলের বেতন, বই-পত্তর কেনা...। মধু মল্লিক লেখা পড়ায় ইতি টেনে ভর্তি হয়ে গেল পাশের গাঁয়ে গেরস্থের দোরে গরু বাগালীর কাজে।

একদিন দুয়ারে এসে হাজির নিতাই মাস্টার।

'ঠুরকো মল্লিক ঘরে আছ নাকি?'

'আছি আইজ্ঞা। না মরিয়া বাঁচিয়া আছি।'

।'তুমার ব্যাটা কোথা ?'

'গরু-বাগালী কচ্ছে ভঞ্জদের বাখুলে।'

'ডাক তাকে। কথা আছে।'

'সে তো আজ্ঞা, অতবেলা গরুর সঙ্গে গরু হইয়া ঘুরছে বনে-বাদাড়ে। সইন্‌ঝার আগে ঘরকে ঘুরবে নি।'

ঠুরকো মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে নিতাই মাস্টার।

'ব্যাটাটাকে পড়াও। অগাধ বুদ্ধি না কি অর। তুমার বংশের নাম রাখবে। সম্প্রদায়ের মু' উজ্জ্বল করবে।'

ঠুরকো মল্লিক অবাক মানে নিতাই মাস্টারের কথা শুনে। লোকটা গরীবের দুঃখে কাঁদে। গরীবের পাশে থেকে সংগঠন করে। পুলিশের অকারণ জুলুম হলে পাশে দাঁড়ায়। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করে। নিতাই মাস্টারের কোনও কথাই ফেলে না বীরকাঁড়ের লোধারা। তা বলে, এ কি কথা বলে মাস্টারের পো ? লোধার পুত্তুর হয়্যা, সে নাকি ইংরাজী ইস্কুলে পড়া-লেখা করবে ! এ কি তাজ্জব কথা !

সহসা ক্ষেপে ওঠে নিতাই মাস্টার' 'তেবে কি পাখনাটি গজিইলে রাতের কুটুমটি সাজবে ? তোদের মতন চোর হবে নাকি তোদের জাতের সক্কলে ? মানুষ হবে নি কুনো দিন ?'

ঠুরকো মল্লিক ভয় পেয়ে যায় নিতাই মাস্টারের রুদ্ররূপ দেখে।

বলে, 'কুথা পড়বে মাস্টার ? খচ্চা পাতি পাবো কুথা ?'

উঠে দাড়ায় নিতাই মাস্টার।

বলে, 'দেখি, কি করা যায়।'

হপ্তাখানিকের মধ্যে নিতাই মাস্টার গিয়ে হাজির হয় স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়িতে। সঙ্গে দড়ি বাঁধা পেণ্টালুন পরা, উদোম গায়ে মধু মল্লিক।

নিতাই মাস্টার বলে, 'আপনি স্যার একে পরীক্ষা করুন পয়লা। যত প্রশ্ন করবার করুন। তারপর মোর কথা বলবো মুই।'

গোটা পাঁচ-সাত প্রশ্ন করেই ইন্‌স্‌পেক্টরসাহেব তাজ্জব। এতখানি প্রখর বুদ্ধি ধরে, ঐটুকু ছেলেটা !

নিতাই মাস্টার খুলে বলে সব।

'চাকরি মানেই তো গুলামী হুজুর। তার মধ্যে অন্তত একটি কাজ করিয়া যাউন, সারা জন্মের গুলামীর কষ্ট ঘুচিয়া যাবে আপনার।'

ইন্‌স্‌পেক্টর মধুকে নিয়ে গেলেন মেদিনীপুরে, ডি-আই সাহেবের পাশ। এবং সব দেখে শুনে ডি-আই সাহেব চিঠি লিখলেন মেট্যাল ইস্কুলের হেডমাস্টার জ্যোতিশ্বর রায়কে।

চিঠি পেয়ে মহা সংকটে পড়লেন জ্যোতিশ্বর রায়। এ এক বাড়তি খরচের বোঝা ইস্কুলের কাঁধে চাপাতে চাইছেন ডি-আই সাহেব। ছেলেটির স্কুলের মাইনে এবং বোর্ডিং চার্জ একেবারে ফ্রি করে দিতে হবে। ভর্তি ফি এবং বইয়ের খরচ তিনি জোগাড় করে দেবেন। সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা

হেড মাস্টারমশাইয়ের। একদিকে ঘাড়ে চাপাতে চাইছে বাড়তি খরচের বোঝা। অন্য দিকে ডি-আই সাহেব ক্ষেপলে ইস্কুলের সমূহ ক্ষতি। স্কুলখানিতে সবে নাইন-টেন খুলেছে। এখন সরকারী অনুদান এবং অন্যান্য আনুকূল্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। ডি-আই ক্ষেপলে সমূহ মাটি। জ্যোতিশ্বর রায় তৎক্ষণাৎ ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকলেন। বাণেশ্বর ঘোষের সভাপতিত্বে সে মিটিং গভীর রাত অবধি গড়ালো। প্রায় সমস্ত মেম্বারের অনিচ্ছেসত্ত্বেও তেতো পিলখানা গিলবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, কেবল ইস্কুলের স্বার্থে। তবে বোর্ডিং চার্জ মকুব করা যাবে না। ছাত্রদের কাছ থেকে বোর্ডিং চার্জ বাবদ যা ওঠে, তাতে সারা মাসের দু'বেলার খাদ্য সংকুলান হয় না। মুদির দোকানে ধার পড়ে থাকে, বাণেশ্বর ঘোষ চাল দেন কর্জ হিসেবে। সরকারী অনুদান-টান এলে কিছু কিছু পরিশোধ হয়। এই অবস্থায় বিনে পয়সায় খাওয়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। লোধার পুত্তুর, ওতো ফের ডবল গিলবে অন্যদের চেয়ে। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হলো, ডিহিপার, কোটালচক, ফুলগেড়্যা এবং যমুনার মোট বিশজন সম্পন্ন মানুষের কাছে অনুরোধ জানানো হবে এ ব্যাপারে। তাঁদের মধ্যে বারো জন দু' সের করে চাল দেবেন মাসে এবং বাকি আটজন দেবেন একটি করে টাকা। ঐ টাকার তিন টাকা যাবে বেতন বাবদ এবং পাঁচ টাকা বোর্ডিং চার্জ।

বহুত দড়ি টানাটানির পর অবশেষে রাজি হলেন দাতার দল। মধু মল্লিক ভর্তি হলো ইস্কুলে। প্রথম দিনেই তাকে ডেকে বলে দেওয়া হলো পুরো ব্যবস্থাটা। চাল এবং টাকাটা দোরে দোরে ঘুরে তাকেই সংগ্রহ করতে হবে।

মেট্যাল স্কুল বাড়িটা ছিল লম্বা ব্যারাকের মত। একতলায় সাত-আট খানা ঘর। দোতলায় বোর্ডিং। কিন্তু প্রথম দিনেই বাধলো গোল। নিতাই মাস্টারের পিছু পিছু ওরই দেওয়া একখানা তোবড়ানো বাক্স আর শতচ্ছিন্ন ক্যাঁথা-বালিশ নিয়ে হাজির হলো মধু। সঙ্গে সঙ্গে গুজগুজ কথাবার্তা শুরু হলো ছেলেদের মধ্যে এবং বিকেল নাগাদ প্রকাশ পেয়ে গেল সেটা। তারা কেউ 'লোধা-ছা'র সঙ্গে এক ঘরে থাকতে রাজি নয়। অর গায়ে ক্যাঁকড়া আর গুগলির দুর্গন্ধ। ও সবাইয়ের মুড়ি-চিঁড়া, ক্রাসিন তেল এবং পয়সা চুরি করিয়া লিবে।

জ্যোতিশ্বর রায় ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রদরদী মানুষ। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি মন্দ ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে রক্ষণশীল এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। ধর্মাধর্ম, জাতপাত এসব ছিল তাঁর রক্তে, সংস্কারে। নিজে অব্রাহ্মণ বলে, কোনও ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণামও গ্রহণ করতেন না। বর্ণ হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে লোধার ছেলেকে এক সঙ্গে রাখার ব্যাপারে তাঁর খুঁত-খুঁতুনি ছিল আগে থেকেই। ছাত্রদের সমবেত প্রতিরোধে তিনিও যেন মনে জোর পেলেন। মধুর থাকার ব্যবস্থা হলো একতলার একটি ক্লাস ঘরে। ঘরের এক কোণে বাক্স-বিছানা রাখলো সে।

বোর্ডিং-এর কোনও পৃথক খাবার ঘর ছিল না। ছাত্ররা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খাবার খেতো। মধুর খাওয়ার ব্যবস্থা হলো বারান্দা সংলগ্ন নিমগাছের তলায়। একখানা কোদাল ধরিয়ে দেওয়া হলো তাকে। সারা বিকেল ঐ কোদাল দিয়ে নিমতলাটি চেঁছে-ছুলে পরিষ্কার করলো সে। গোবর দিয়ে নিকোলো। বোর্ডিং-এর সমস্ত ছাত্র যখন বারান্দায় বসে খেতো, মধু তখন নিমগাছের তলায় তার এনামেলের থালাটিতে নিঃশব্দে খেয়ে যেতো লম্ফের আলোয়। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে গ্রাসের পর গ্রাস তুলতো। এক সময় খালি থালাখানি বাগিয়ে, এঁটো কাঁটা নিকিয়ে গোবরজলে ধুয়ে চলে যেতো কলতলায়। কলতলায় তখন ছেলেদের ভীড়। তারা থালা ধুচ্ছে, আঁচাচ্ছে, কল টিপে জল খাচ্ছে। মধুকে নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করতে হতো। যতক্ষণ না শেষ ছেলেটি চলে যেতো টিউকলের কাজ মিটিয়ে।

ক্লাস ফাইভের ঘরখানাতেই থাকতো মধু। ঘরের এক কোণায় থাকতো তার তোবড়ানো বাক্স আর খেজুর পাতার চাটাইতে জড়ানো ছেঁড়া-কাঁথা, ময়লা বালিশ। বাবুই দড়িতে ঝুলতো ছেঁড়া প্যাণ্ট, গামছা।

ক্লাসে মাস্টার আসার আগে মধুর বালিশটাকে নিয়ে ক্লাসের মধ্যে ফুটবল খেলা চলতো প্রায় দিন। পেছন থেকে মাথায় চাঁটি পড়তো আচমকা। আর লোধাদের কথা ও উচ্চারণ-ভঙ্গি নকল করে নানা জাতের শ্লেষাত্মক কথা। ভগমান সক্কল জনম্ করাইবেন, ইঁদর জনম করাইবেন নাই। জল দিলেও দোষ, নাই দিলেও দোষ! ওর ঠিক পেছনে যারা বসতো তারা ক্লাস চলাকালীন অবিরাম চালিয়ে রাখতো তাদের রেকর্ড। নধবা চোর, নধবার গুষ্টি চোর, নধবার পাদটি চোর। একজন শুরু করলেই ধারাবাহিকভাবে পাদপূরণ করে যেতো অন্যরা। নধবা, নধবা কইবি নি, আমরা বসু-শবরের জাত। কিংবা, নধবা, নধবা কউ যে বড়, ন'টা 'ধা' দেখিয়া দে'দেখি। ক্লাসে মাস্টারমশাই থাকলেও নিচু গলায় বেজে যেতো ওদের রেকর্ড, অবিরাম। শুনে যেতে হত মধুকে। নিঃশব্দে হজম করতে হত। কান গরম হয়ে যেতো। মাথার মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলতো সর্বক্ষণ। পড়ায় ভুল হয়ে যেতো প্রায়ই। কথায় কথায় দু'চোখ ভরে উঠতো জলে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতো, কাজ নেই পড়াশুনো করে। ফিরে যাই, নিজের গাঁয়ে। গরু চরাই, কিংবা মাটি কাটি, কিংবা বাপ-জেঠার কাছে চুরি বিদ্যার পাঠ নিই।

একটা ক্লাস শেষ হলে মাস্টারমশাইয়ের পিছু পিছু মধুও বেরিয়ে যেতো বাইরে। পেছন থেকে সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে ছুটে আসতো শ্লেষ-বিদ্রূপের শত শত বাণ। ভোখ্খে রব, সুখ্খে শুব, তেঁতুল বীচা কঁডরাই খাব, গেড়িয়ায় গেড়িয়ায় কটু খুঁজব, তবো খাটতে যাব নি। না শোনার ভান করতো মধু। অফিস ঘরের সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, যতক্ষণ না পরের পিরিয়ডের মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢোকেন।

চাল এবং টাকা সংগ্রহের জন্য চার গাঁয়ের মোট কুড়ি জনের বাড়িতে যেতে হতো মধুকে। স্কুলের পর যখন সমবয়েসী বন্ধুরা কলকল করে খেলাধুলো করতো, কিংবা দল বেঁধে বেড়াতে যেতো কেলেঘাইয়ের পাড়ে, মধুকে তখন একখানি বস্তা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত গাঁয়ে-গাঁয়ে, দোরে দোরে। লক্ষ্মীর পা আঁকা উঠোনে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানতে হতো চালের জন্য। এ এক আচ্ছা আপদ জুটেছে! গেরস্থের বউ-ঝি'রা এই পড়ন্ত বেলায় সামনে আরশি সাজিয়ে চুল বাঁধছে, কিংবা মেতে উঠেছে গল্প-গুজবে। এমন সময়ে মূর্তিমান রসভঙ্গটি হয়ে হাজির। কে? না, এক লোধার পুত্তুর। কি? না, সে পড়বে, তাকে চাল দাও। যা, যা, আজ হবে নি। হাত আজোড় নাই কিংবা ধান কুটা হয় নি, কাল কিংবা পরশু আসবি। নয়তো সামনের মাসে আসিস, একসাথে দু'মাসের দিয়া দুবো। ফি-মাসে এক ঘরে অন্তত দু'তিন বার যেতে হতো মধুকে। এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতো মাসের সবগুলি বিকেল। সে ছিল তার ভর-ভরন্ত কৈশোরের দিন। মন সারাক্ষণ ছুটতে চায় চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত। ছেলেমানুষী নানান ক্রিয়া-কাণ্ডে লিপ্ত হতে চায় মন। শেষ বিকেলে খেলার সবুজ মাঠ জুড়ে আহ্লাদী হাওয়া। শাল বনের সবুজ হাতছানি। গাছে গাছে ফল-পাকুড়। নদীর ধারে মসৃণ বালি। তিরতিরে কাকচক্ষু জলে গাছেদের নম্র ছায়া। পাখির কিচির-মিচির গান। সব কিছুকে তুচ্ছ করে, এক পেট খিদে বয়ে বয়ে, সে ঘুরে বেড়াতো চটের বস্তা কাঁধে চাপিয়ে। আকুল প্রার্থনায়, আকণ্ঠ অভিমানে।

ডিহিপারের হারিবুড়ির সাথে আলাপ হয়েছিল তখনই। বাচ্চা ছেলেটিকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিল বুড়ি। সময় পেলেই হারিবুড়ির দোরে চলে যেতো মধু। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতো অনেকক্ষণ। মেট্যালের স্কুলে, ঐ দুঃসহ কষ্ট আর অপমানের দিনগুলোতে হারিবুড়িই ছিল ওর একমাত্র আশ্রয়।

বছর দুই এইভাবে থেকে, মধু যখন পড়াশুনো ছেড়ে দেবার কথা চূড়ান্তভাবে স্থির করে ফেলেছে, তখনি নিতাই মাস্টার তাকে নিয়ে গেল 'বিদিশা'য়।

নারাণগড় থেকে খানিক দূরে লোধা শিশুদের নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য তৈরী হয়েছে একটি আশ্রম। তার নাম 'বিদিশা'। মধু ওখানে ঠাঁই পেলো সগোত্রদের সঙ্গে।

'বিদিশা-তেই নৈতন জীবন ফিরিয়া পাইলাম মুই।' মধুর গলায় চাপা আবেগ।

গীতালী নির্বাক হয়ে শুনছিল। পথ ভেঙে ভেঙে এগুনোই বটে। এই কাঁকুরে, দুর্গম পথ। অতখানি এগোনোর কথা ছিল না। মধু এগিয়েছে। মধু বলেই পেরেছে। প্রণবদার কথা মিছে নয়। গীতালীর দুচোখে ফুটে ওঠে স্নেহ মেশানো শ্রদ্ধা।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দু'জনেই। মধু মল্লিক এবার ডাইনে যাবে, গীতালী বাঁয়ে।

ব্যাগখানি ফিরিয়ে দিতে দিতে মধু শুধোয়, 'দিদি ক'দিন থাকবে ?'

'দেখি।' গীতালী অন্যমনস্ক গলায় জবাব দেয়, 'কাল, কিংবা পরশু।'

'ডিহিপারে শীতলা পুজো চলছে। আমরা সকলে মিলিয়া করছি। আমাদের পুজো দেখতে আইসবে, বিকাল বেলায় ?'

মৃদু হাসলো গীতালী।

'তোমাদের পাড়ায় খুব শীতলা পুজো হয়, তাই না ?'

মধু হাসে।

বলে, 'বছরে কমপক্ষে একবার শীতলা পুজো করবেই লোধারা মাঘে কিংবা চৈত্রে।

গীতালী মিষ্টি হেসে বললো, 'দেখি, যদি সময় পাই। চেষ্টা করবো।'

।। এগার ।।

একটু বেশি রাতে নিশি কামার এলো বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে। আকাশে চাঁদ নেই। পচা পাঁকের মত অন্ধকার।

ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল বাণেশ্বর ঘোষ। দিনকতক বড় ধন্ধ জেগেছে মনে। নিশির বড় ভাব হয়েছে শ্যাম চক্রবর্তীর সাথে। মাস কয় আগে ব্যাপারটা প্রথম নজরে পড়েছিল বাণেশ্বরের। আগুনজ্বলার মাঠে পলাশ গাছের তলায় খুব গুজগুজ করছিল দু'জনে। তারপরও দু'চার বার দেখা গেছে দু'জনকে, একান্তে। ইদানীং শ্যাম চক্রবর্তীর বাড়িতে নিশি কামার যাতায়াতও জুড়েছে। ব্যাপারখানা কেমন বেখাপ্পা ঠেকে বাণেশ্বরের কাছে। শ্যাম চক্রবর্তী সুবিধের লোক নয়। মনে মনে তাকে চিরকালই সন্দেহ করে বাণেশ্বর ঘোষ। এদিকে নিশি কামার রামেশ্বরের খুনের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। শ্যাম চক্রবর্তীর সাথে আচমকা মেলামেশার সঙ্গে ঐ কেসটার কোনও সম্পর্ক নেই তো ? এমনিতে নিশি কামার চিরকালই বাণেশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তি। ঋণে-কর্জে মাথার চুল অবধি ডুবে রয়েছে বাণেশ্বরের কাছে। ইচ্ছে করে বিগড়াবে, এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শ্যাম চক্রবর্তী যদি কোনও গভীর জাল ফেলে ভেতরে ভেতরে ? নিশিটা আবার বেজায় মাথা-মোটা। মনের অজান্তে কি করতে কি করে ফেলবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বোকা লোকগুলোকে নিয়ে এই এক ভয়। বেশ কিছুদিন মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলোকে চেপে রেখে শেষ মেষ ডেকেই পাঠিয়েছে নিশিকে। চুপ করে বসে থাকা ঠিক নয়। তত্ত্ব-তালাশটা এবার নেওয়া উচিত। বুদ্ধু লোকটি পেয়ে শ্যাম চক্রবর্তী হেন ধড়িবাজ ব্যক্তিটি ভেতরে ভেতরে কোন্ সুড়ুংটি কাটছে, সেটা জানা দরকার। পয়লা চটকায় সরাসরি ধরা দিতে চায়নি বাণেশ্বর। যদি কোনও

গোপন ফন্দি থাকে শ্যামের, তবে জানাজানি হয়ে গেলে সাবধান হয়ে যাবে ও। সেই কারণেই ন্যাকা-সুধীরকে লাগিয়েছিল বাণেশ্বর। সে ব্যাটা এই ক'মাসে সঠিক খবরটা জোগাড় করতে পারলো না। সেই কারণেই আজ একান্তে ডেকেছে নিশিকে।

নিশিকে বসিয়ে বৈঠকখানার দরজাখানি ভেজিয়ে দিল বাণেশ্বর ঘোষ। একটা বিড়ি ধরিয়ে বার দুই টান মারলো। বারকয়েক খুক খুক করে কাশলো। তারপর সরাসরি শুরু করলো কথাটা।

'হাঁ রে নিশি, একটা কথা জিগাবো তোকে। সত্যি জবাব দিবি?'

বাণেশ্বরের থমথমে মুখ এবং কথা বলবার ধরণ দেখে ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছে নিশি কামার।

বাণেশ্বর বলে, 'শ্যাম চক্রবর্তীর সাথে তোর অত লটর-পটর কিসের রে? দু'জনাতে খোব গুজুর-গুজুর কচ্ছিস এখানে-উখানে? ব্যাপারটা কি?'

নিশি কামার বিপন্ন বোধ করে। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

মৃদু গলায় বলে, 'কিছো না। এমনি-এমনি।'

বাণেশ্বরের চোখ দুটো জোড়া টর্চের মত জ্বলছিল। তার তীব্র দৃষ্টি যেন ঢুকে যাচ্ছিল নিশি কামারের বুকের মধ্যে। নিশি কামার ভয় পেয়েছে। কথা চাপছে। বুঝতে তিলমাত্র অসুবিধে হয় না বাণেশ্বর ঘোষের। সন্দেহে গাঢ় হয়ে আসে দু'চোখ।

বলে, 'এমনি-এমনি? শালা, তুই কি বোকা-চৈতন ঠাউরিলু মোকে? জবাবটা ঠিক ঠিক দিবি কিনা বল্?'

নিশি কামারের বুকের মধ্যে বাঁশপাতার কাঁপন। বাণেশ্বর ঘোষকে সে আজীবন চেনে। রুষ্ট হলে এ মানুষটি যে কি পরিমাণ ভয়ংকর হতে পারে, সেটা ওর চেয়ে বুঝি ভালো জানে না কেউ।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'বিশ্বাস কর ঘোষের পো, তুমার বেপারে কিছো নয়। ব্যাটার মাথায় হাত দিয়া কইবো। সে অন্য কথা।'

'সেই অন্য কথাটা বল্ না শুনি।' ক্ষেপে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'ক্যানে শুধুমুদু ঢ্যামনামি করছু তখন থিকে?'

'সে মোর ঘরের কথা।' ব্যাকুল গলায় বলে নিশি কামার, 'সে কথা তুমার শুনার নয়। বিশ্বাস কর। মোর ব্যাটার কিরা।'

রাগখানা পারদের মত চড়ছিল বাণেশ্বর ঘোষের। কি অমন গোপন কথা যে বাণেশ্বর ঘোষকে তা বলা যায় না? নিশি কামারের কোন্ গোপন কথাটা বাণেশ্বর না জানে?

উঠোন বরাবর বাইরে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ। নিকষ আঁধারের মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে কিছু দেখতে চায়। সাপের মত হিসহিসে গলায় বলে, 'তুই তাইলে কইবি নি? তেবে চলিয়া যা ঘর। রাত বাড়ে!'

এটা কোনমতেই চলে যাবার অনুমতি নয়। নিশি কামার সেটা বিলক্ষণ বোঝে। এটা হলো সর্বশেষ হুমকি।

নিশি কামার তাও বসে থাকে। ভয়ে-আশঙ্কায় নাভিমূল সুড়সুড় করতে থাকে ওর। খানিকক্ষণ কাকুতি মিনতি চালায়। এক সময় নাচার হয়ে আসল কথাটা ভাঙে।

'এই, বউটাকে লিয়া বড্ড সমিস্যায় পড়ছি দাদা। সেই কারণেই শ্যাম চক্রবর্তীর পাশ ছুটাছুটি।' নিশি কামার বিতাং করে বলে ব্যাপারখানা।

বউটা যারপরনাই চরিত্রহীন। বিয়ের সময় অতটা ছিল না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তার হ্যাংলামী বাড়ছে। এক মেয়ে তার। এক ছেলে। নিশির প্রথমপক্ষের মেয়েটির বিয়ে হয়েছে কোটালচকে। তারও বিয়োবার টাইম হলো। তাও মালতীর ছোঁক ছোঁক স্বভাব যায় না।

জাতে কামার হলে যা হয়, নিশিকে দিনভর তপ্ত কামারশালে জ্বলন্ত লোহার সামনে বসে থাকতে হয়। লোহা পিটতে হয় আসুরিক শক্তিতে। গভীর রাতে সিঁদ কাঠি বানাতে হয়। এতসব করে আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না। দিনভর উত্তপ্ত লোহার সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেই ঠাণ্ডা মেরে যায়। ফলে যা হবার হয়েছে। বউ জুটিয়ে নিয়েছে নিজের মত। ইদানীং এ ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়েছে। যাকে তাকে ঘরে ঢোকাচ্ছে রাতের বেলায়।

বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে নিশি কামার।

বাণেশ্বর মনে মনে হাসে। শালা ঢুকাবে নি তো কি করবে রে? তুই শালা তপ্ত লুহার সাথে দিনভর লড়াই করিয়া নিজে ঠাণ্ডাটি মারিয়া গেছু। গভীর রাইতে ঘরে গিয়া ধপাস করিয়া বিছুনায় পড়ু। পড়িয়াই মরিয়া যাউ। সে মায়ার টুকে সাধ আহ্লাদ নাই? তার শরীলের ক্ষিদা-তিষ্টা নাই? ঠাণ্ডা জলে চুবিয়া দিলে তোর গরম লাল-টকটকে লুহা ঠাণ্ডা হয়া যায়। মায়া গরম হইলে তাকে ঠাণ্ডা কত্তে গরম মরদ চাই। তুই শালা লুহার মতিগতি ভালো বুঝু, মায়ার মতিগতি তোর বুদ্ধির অগম্য।

'হুঁ—।' বাণেশ্বর ঘোষ সাউদ সাজে, 'এ গাঁয় কিছো লম্পট লোক জুটছে বটে। খেদা না একদিন শালাদের। আর যদি বুঝু, বউটাই ফুসলিয়া আনছে, তো আম-ছ্যাঁচা কর্ শালীকে। যে হাতুড়ি দিয়া লুহা পিটু, ঐ দিয়া—।'

বাণেশ্বর আসলে রগড় জুড়েছে নিশির সঙ্গে। মালতীকে সে বিলক্ষণ চেনে। এমন খাণ্ডার মেয়া এ তল্লাটে বিরল। নিশি কামার ওকে এক চড় লাগালে, ও শালী নিশি কামারকে একটি লাথি কষাবে। তাও বাণেশ্বর খেলাতে থাকে নিশিকে।

বাণেশ্বরের কথায় খুব একটা উৎসাহ পায় না নিশি। বলে, 'আম-ছ্যাঁচা কত্তে পারি দাদা। তবে অর সাথে নুন-লঙ্কা যোগ কল্লে তবেই না জুতসই হয়।' অল্পক্ষণ চুপ করে থাকে নিশি কামার। তারপর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলে, 'ঐ নুন-লঙ্কাটাই যে জোগাতে পারি না আজকাল!'

সেটা বাণেশ্বর ঘোষের চেয়ে বেশি কেউ জানে। ষাট বছর উম্মর হলো

তার। তবুও ওকে পেলে মেয়েটা ঐ বুড়া শরীর নিয়ে যা ছেঁড়া-কামড়া করে! তাতেই মালুম হয়, বহুদিন ধরে উপোসী রয়েছে। নিশি কামার ওকে, বোধ লেয়, একদানাও খাদ্য দেয় না।

বাণেশ্বর ঘোষ যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'বলু কি রে? তোর ঝি-টা ব্যাটাটা তেবে হইল কি করিয়া?'

'আগে তো অমনটা ছিল নি দাদা। যত দিন যাচ্ছে—।'

'হুঁ—।' বাণেশ্বর বুঝতে পারে পুরো ব্যাপারটা, 'তা শ্যাম চক্রবর্তীর পাশে কি?'

'অনেকদিন ধরিয়া ভাবি একটা কোবরাজ দেখাই, লচেত কুনো গুণীন। শ্যাম চক্রবর্তী তো দুটাই জানে। বাপের মতন না হইলেও, জানে তো কিছো। সেই কারণেই একদিন আগুন জবলার মাঠে ভেট হবায় অকে বললাম কথাটা।'

'ত' কি বলে শ্যাম?'

'পর্‌থমে বললো, ম্বায়াকে দেখতে হবে, পরীক্ষা কত্তে হবে। একদিন ঘরে আইল। চা-ফা দিয়া করালাম মালতীকে দিয়ে। অর হাব-ভাব, হাঁটন-চলন ভালো করিয়া দেখলো শ্যাম। রায় দিল, হস্তিনী জাতের মায়া।

বলি, 'সিটা কি ঠাকুর?'

শ্যাম বলে, 'মায়ার চারটা জাত আছে জানু নি? পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রণী, হস্তিনী। এ মায়া হস্তিনী।'

'মায়া হস্তিনী হইলে কি হয় ঠাকুর।'

শ্যাম চক্রবর্তী হাসে। গুহ্য হাসি। বলে, 'কি ফের হয়! হাতীর মতন খাদ্য খুঁজে। কিছোতেই ক্ষিদা যায় না শরীরের।'

বটে তো! মালতীর তো ঠিক অই ব্যাভার! বলি, তেবে উপায়?

শ্যাম অনেক ভাবে। দু'তিন দিন ঘুরায়। শেষমেষ বলে, উপায় আছে।

বলি, 'কি উপায়, বল ঠাকুর। বাঁচাও মোকে। মনস্তাপেই মরতে বসেছি মুই।'

শ্যাম বলে, এক, 'মায়ার ক্ষিদা কমাইতে হবে। দুই, তোর শক্তি বাড়াইতে হবে। তিন, ঢ্যামনাকে জব্দ করতে হবে। সময় লাগবে। খচ্চা হবে। ধৈর্য্য ধর্‌, ঠিক হয়্যাবে।'

বাণেশ্বর ঘোষ শুনছিল মন দিয়ে। ভেতরে কুলকুলিয়ে হাসছিল। বললো, 'তো, ক্ষিদা কমছে? শক্তি বাড়ছে?'

'ওষোধ দিছে দু'জনার তরে! একদিন আইসিয়া ফুঁকিয়া গেছে বউকে। খড় মন্ত্রিয়া দিছে, বিছ্‌নার তলায় রাখছি। একটা হোম কত্তে হবে মাস-দুই বাদে।'

'হোম কিসের তরে?'

'বুঝি নি বাবু অত তন্তর-মন্তর। বউকে যে ঢ্যামনা খাচ্ছে, তার শরীর থিকে শক্তি হরণ করিয়া মোর শরীরে নাকি সিটা সঞ্চালন করবে। আর ঢ্যামনার উপর উচাটন মন্ত্র প্রয়োগ করবে।'

'অতে কি হবে ?'

'উচাটন বিদ্যা প্রয়োগ কল্লে নাকি মালতী সুদ্ধু দুনিয়ার সব মায়া উয়ার উপর ক্ষেপিয়াবে। উয়ার মুখদর্শন করতে চাইবে নি। হোম কত্তে হবে তার জন্যই।'

বাণেশ্বরের ভ্রূ-জোড়া অলক্ষ্যে কুঁচকে ওঠে নিমেষের তরে। শ্যামের বাপটা তন্ত্রে-মন্ত্রে-ওষধিতে এক্কেরে ভেল্কি লাগাতো। শ্যাম চক্রবর্তীও, শোনা যায়, কিছু পেইছে বাপের থিকে। মালতীর ঢ্যামনার শরীর থেকে হোম করে শক্তিহরণ করবে সে ? বাণেশ্বর যেন নিজের অজান্তেই অস্বস্তি বোধ করে। শরীরখানা কেমন দুর্বল লাগে তার। পায়ের পাতা ঝিন ঝিন করে।

তাও মুখে বলে, 'বেশ তো। জলদি সারিয়া ফ্যালু হোমটা। তৈতন শক্তি ধারণ করিয়া শালীকে এমন ধরবি যেন 'বাপ' বলিয়া ডাকে তোকে।'

তেমন সুদিনের স্বপ্নে পলকের তরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিশি কামারের মুখ। পরমুহূর্তে চুপসে যায়।

বলে, 'হোমটা তো কবেই হয়্যা যাইতো। কিন্তু হচ্ছে নি একটা চিজের তরে।'

'কি ?' বাণেশ্বর ইতিমধ্যেই মালতীর ঢ্যামনার জায়গায় বসিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

'উ শালার বাঁ-পায়ের কড়ি আঙুলের নখ চাই এক টুকরা। অই নখ হোমের আগুনে মন্তর পড়িয়া ফেলতে হবে। ব্যস। ঐ হোমের ছাই এক চিমটি আন্দাজ জলে গুলিয়া খাইলেই হবে। ত, ঐ নখটুকুই জোগাড় কত্তে পাত্তিছি নি।'

ভেতরে গুরগুরানি শুরু হয়েছে বাণেশ্বর ঘোষের। বাঁ-পাখানা অজান্তেই ঢুকিয়ে নেয় কোলের ভেতর।

খেজুর গাছে ঝুপ করে বসে কোনও রাতচরা পাখি। বাণেশ্বর ঘরের মধ্যে বসেই শুনতে পায় সে আওয়াজ। বলে, 'পায়ের নখ যে জোগাড় করবি, ঢ্যামনাটাকে চিনু তুই ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় নিশি কামার। একটুক্ষণ গুম মেরে থাকে। বলে, 'কোউ একটা আসে-যায়, এটা বুঝতে পাচ্ছিলম বহু আগে থিকে।'

'কি করিয়া বুঝলু ?' বাণেশ্বর ঘোষের চোখে পলক পড়ে না।

'ঘরে-বিছানায় হাজার গণ্ডা টুকিটাকি লক্ষণ দেখা যায়। তা বাদে, দিনের পর দিন লুহা পিটিয়া অসাড় মুই। শুইয়াই মরিয়া যাই। মালতীর মাথায় আগুন জ্বলিয়া যায় না তাতে। হাসিয়া কথা কয়। আদর-যত্ন বাড়িয়া যায়।'

'হুঁ।' অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে বাণেশ্বর। বলে, 'তারপর ?'

'তো ভাবি, কে আইসে-যায় ? কে আইসে যায়— ?'

বাণেশ্বর নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে নিশি কামারের ঠোঁট জোড়ার দিকে। ও দুটোর ফাঁক দিয়েই বেরোবে মালতীর মনের মানুষটির নাম।

'একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াল শালা। সেদিন টুকে জলদি ফিরিয়া আসি ঘরে। শালা পালিয়া যাবার ফুরসত পায় নি।'

'কে রে লোকটা?' বাণেশ্বরের মুখে ফ্যাকাশে হাসি।

নিশি কামার চুপচাপ বসে থাকে। ভাবে। তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'বংশী ভঞ্জ।'

তীব্র চমক খায় বাণেশ্বর। এমনটা একদম আশা করে নি। ধীরে ধীরে সামলে নেয়। 'বটে বটে!' বাণেশ্বরের দু'চোখে চাপা ক্রোধ। ছাই চাপা আগুন। বলে, 'সে শালা তো কিছোদিন মতিয়া হাড়ির বউর সাথে ছিল। এক ক্ষেতের ঘাস ফুরাইতে, ফের অন্য ক্ষেতে চোখ চারাচ্ছে! ঘরেও তো বউ আছে অর।'

'শুনতে পাই, একগাদা বাচ্চা বিইয়া সে শালী ফঁপরা কাঠ। শীতের মাদি-কুত্তীর মতন হাড়-সার হয়্যা গেছে।' নিশি কামারের গলায় তীব্র আরকের ঝাঁঝ, 'আর, এ শালা কলির কিষ্টোটি সাজিয়া চরিয়া বুলছে বিশ্বভুবন!'

'শালা ঘরে আছে এখন?'

'না। যমুনার একটা দলকে লিয়া গেছে পুরী।'

বাণেশ্বর ঘোষের শরীর জুড়ে জ্বলন শুরু হয়েছে। শিরায় শিরায় লক্ষ বিছার দংশন। এই তরে শালী আজকাল হাজারো বাহানা তুলছে কিছো দিন ধরিয়া! কাছে ভিড়তে দিচ্ছেনি! ভিতরের কথা তেবে এই! বংশী ভঞ্জটার বড় বাড় বেড়েছে তো! হাড়ি পাড়ায় করিয়া খাচ্ছিল। সে ফের হানা দিচ্ছে বাণেশ্বর ঘোষের বেড়্-ধারে! অত সাহস!

বলে, 'তন্ত্র-মন্ত্র যা চলছে চলুক। শালা ঘুরিয়া আইলে তুই একটা বিচার দিয়া দে'না দেশে। শালার গাঁটগুলো ছেঁচিয়া দিই।'

বাণেশ্বর ঘোষ রাগে স্পষ্টতই কাঁপতে থাকে নিশি কামারের সামনেই। চোখের তারা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ঘন ঘন নীচের ঠোঁট দংশন করতে থাকে সে।

নিশি কামার বলে, 'কবে বিচার দিয়া দিতাম, দাদা। কিন্তু এ হইল ঘরের কেলেংকারী। শুনিয়া শত্রু হাসবে।' নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে নিশি কামার, 'মোর হইচে চোরের মা'র অবস্থা। চোরের মা লুকিয়া কাঁদে।'

হায়েনার মত জ্বলছিল বাণেশ্বরের চোখ দুটো। মতিয়া হাড়ির কেসটাতে এক্কেবারে ফাঁসিয়া গেছলি শালা। পাখির মা'র মতন পাখনা ঢাকা দিয়া বাঁচালাম। শালা, এই প্রতিদান দিলি তার!

'আগে থাকতে বুঝতে পারলে, অর ওষোধ মোর পাশেই ছিল রে নিশি।' বাণেশ্বর ঘোষের গলায় গভীর আক্ষেপ, 'দাদার খুনীদিগের সাথে অর নামটাও জুড়িয়া দিতাম। মরতো শালা হাজত বাস করিয়া। কেসে প্রমাণ হইলে যাবজ্জীবন!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বাণেশ্বর ঘোষ। ক্রোধ সংবরণ করবার আপ্রাণ

চেষ্টা করছে সে। বলে, 'শালার বাঁ-পায়ের কড়ি আঙুলের নখ চাই এক টুকরো? পায়াবি যা।'

বাণেশ্বর ঘোষের বরাভয় পেয়েও সন্দেহ ঘোচে না নিশি কামারের। কি করে ঘোষ এনে দেবে ওর পায়ের নখ? সন্দেহটা চাপা থাকে না নিশি কামারের চোখে মুখে।

সেটা বুঝতে পেরে বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'সুনীল মানাকে কয়া দিবো যা। শালার নখ-চুল কাটার টাইমে এক টুকরা ঐ নখ সরিয়া রাখবে সাবধানে। পায়াবি যা। ভাবিস নি।'

বংশী ভঞ্জর শক্তিক্ষয়ের দায়িত্বটুকু প্রায় নিজের ঘাড়েই তুলে নিল বাণেশ্বর ঘোষ। শালাকে একেবারে ধ্বংস না করিয়া শান্তি নাই।

রাত বাড়ে। উঠতে চায় নিশি কামার। বিদায়কালে বাণেশ্বর ঘোষ আসল কথাটি পাড়ে। 'হোম করাচ্ছু কর্। চিকিৎসা করাচ্ছু কর্। শক্তি বর্ধন, শক্তি হরণ, সব কর্। কিন্তু ঐ শ্যাম চক্রবর্তী লোকটা বেজায় ধড়িবাজ। সর্বদা পাতায় পাতায় চলে। অন্য কুনো কথা ভুলেও কইবি নি অর পাশ। দাদার খুনের এক নম্বর সাক্ষী তুই। ওসব ব্যাপারে মুটি খুলবি নি কিছোতেই। যদি একটা কথাও ফাঁস হয়, শালা সবংশে লোপ পায়াবি। তোর সব সম্পত্তি, মায় ভিটাটুকুর দলিলও মোর সিন্দুকে। খিয়াল থাকে যেন কথাটা। এ বাদে, তুই মন্তর দিয়া বংশী ভঞ্জর যন্তর খসিয়া দে, মোর আপত্তি নাই অতে।'

॥ বার ॥

শীতলা পুজো শুরু হয়েছে ডিহিপার লোধাপাড়ায়।

বিকেল বেলায় ইস্কুলের হোস্টেলে প্রণবের সঙ্গে গল্প করতে করতে গীতালী বললো, 'চল, ডিহিপারের শীতলা পুজো দেখে আসি।'

'হঠাৎ?' প্রণব অল্প অবাক হয়।

'এমনি। মধু বলেছিল যেতে। আজ আবার বলেছে। ইচ্ছে করছে। বড় আন্তরিকভাবে বলেছে ছেলেটা।'

প্রণব হাসে। বলে, 'মধু ছেলেটা বড় ভালো।'

একটু বাদে ওরা বেরোলো।

স্কুলের উত্তরদিকেই ডিহিপার গাঁ। সামান্য দূরে। গাছ-গাছালির আড়াল না থাকলে হোস্টেল থেকেই শীতলা-তলা দেখা যায়। পায়ে পায়ে শীতলা-তলার দিকে হাঁটতে লাগলো দু'জনে।

পাড়ার মধ্যিখানে এক টুকরো চটান্ জমিন। ওপরে একরাশ ডাল-পালা ছড়িয়ে একত্রে একজোড়া বট-অশত্থের গাছ। গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে

আছে সে গাছ, বহু যুগ ধরে। ঐ জোড়া গাছের তলায় খড়ের আটচালা বেঁধে মা শীতলার থান পাতা হয়েছে! শ্যাম চক্রবর্তী এসে ঘট স্থাপন করেছে দুপুরের আগে। আজ দিনটা নমোনমো করেই কাটবে। বড় পুজো কাল। পরশু ভাসান।

ন্যাকা-সুধীরের চারপাশে ছোট ভীড়।

মাঘেতে মাধব কৈল

মথুরায় গমন

দশ দিক শূন্য হেরি

লব বিন্দাবন গো ললিতে—

কে হরিয়া লিলো মোর—

পানোনাথে ॥

শরীরে তিন কুড়ি উত্তর ধারণ করে, দেবীর ঘট থেকে বেশ খানিক তফাতে বসে, চাঙু বাজিয়ে গান ধরেছে সুধীর কোটাল। সবাই ডাকে ন্যাকা-সুধীর। ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়।. সহজ-সরল কথাটাও তিনবার বুঝিয়ে না দিলে বুঝতে পারে না। অথচ এতল্লাটের সবাই তো জানে, কি ক্ষুরধার বুদ্ধি ওর! মানুষ হাঁ করবার আগেই সে তার পেটের ভাষা বুঝে ফেলে। এলাকার কেউ ন্যাকা-সুধীরকে বিশ্বাস করে না একতিল। চাঙু বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ানোর সুবাদে সে তল্লাটের সবাইয়ের হাঁড়ির খবর জোগাড় করে এবং বাগেশ্বর ঘোষদের নিয়মিত জোগান দেয়। মনে মনে ওকে তাই ঘেন্না করে পাড়ার মানুষ। দুয়োরে উঠতে দেয় না। আজকের ব্যাপার অবশ্য স্বতন্ত্র। আজ হলো উৎসবের দিন।

গীতালীরা পেঁছোনো মাত্রই সোরগোল পড়ে গেল সারা পাড়ায়। ছুটে এলো মধু মল্লিক এবং পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ যুধিষ্ঠির মল্লিক। কি করবে, এদের কোথায় বসাবে, এই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলো সবাই। মধুর নির্দেশে একখানা খেজুরপাতার চাটাই এলো তৎক্ষণাৎ। দু'জনকে সসম্ভ্রমে বসানো হলো। শ্যাম চক্রবর্তী ছুটে এসে শান্তিজল ছিটিয়ে দিল দু'জনের মাথায়।

বড় অস্বস্তি লাগছিল গীতালীর। বলে, 'থামো তো তোমরা। বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছ।'

আয়োজন নিতান্তই সাদামাটা। বাহুল্য তো নেইই, বরং সর্বত্রই অনটনের ছাপ। সত্যি, এদের এই তীব্র অনটনের সংসারে চাঁদা করে উৎসব-পার্বন করা নিতান্তই বিলাসিতা। কিন্তু মা শীতলা হলেন বসন্ত, মহামারীর দেবী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, চরম অপুষ্টির মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, ঐ সব রোগকে তারা যমের চেয়েও বেশি ডরায়। কাজেই মা-শীতলার পুজো বছরে অন্তত একটিবার এ পাড়ায় হবেই। ন্যাকা-সুধীর গান থামিয়ে গীতালীদের ভুলভুল করে দেখছিল। অতি নির্বোধ চাউনি। ব্যাপারটা শ্যাম চক্রবর্তীর নজর এড়ায় না।

ইলচি করে বলে, 'কি গো, সুধীরকা, বিটিশ চলিয়া গিয়া ভালো হইচে, না খারাপ হইচ্চে?'

এই হোল ন্যাকা-সুধীরের এক চিরন্তন ক্ষতস্থান। ওর বাপ মাণিক্য কোটাল নাকি থানার ইনফর্মার ছিল সেই ব্রিটিশ যুগে। খোদ মহারানীর লোক হিসেবে তার গর্ব আর দাপটের অন্ত ছিল না। মুখে সে দাপট প্রকাশ করতো না কোনওদিন। কিন্তু এলাকার লোক তাকে সমীহ করেই চলতো। বলা যায় না, ক্ষেপে গেলে কার নামে কি লাগাবে থানায় গিয়ে। বৃটিশ যুগের থানা! ভোগান্তির একশেষ হবে শেষমেষ। লোধাদের সঙ্গে থানার যেখানে চিরন্তন ইঁদুর-বেড়াল সম্পর্ক, সেখানে মাণিক্য কোটাল ছিল থানার অতি আপনজন। ন্যাকা-সুধীরের ঐ নিয়ে আজীবন আক্ষেপ, ব্রিটিশরা থাকলে বাপের পদটা নির্ঘাৎ পেতো সে। চাঙল-গান গেয়ে ভিখ মাগতে হত না তাকে। দেশী দারোগাগুলো ন্যাকা-সুধীরকে পাত্তা দেয় নি। কি করে দেবে? লালমুখোদের মত বুদ্ধি কোথায় যে ন্যাকা-সুধীরের কদর বুঝবে! শ্যাম চক্রবর্তীর কথার জবাব দেয় না ন্যাকা-সুধীর। গুম মেরে থাকে। এই মানুষগুলোর মুখে-চোখে চিরন্তন বিষাদ। গীতালী সবদিনই লক্ষ্য করেছে তা। আজ ঐ মুখগুলোতে একটা খুশী-খুশী চকচকে ভাব। মেঘের আড়ালে যেন রোদ্দুর উঠেছে।

মধু মল্লিক সামনে দাঁড়িয়ে গদগদ গলায় বলে, 'ভাবতে পারিনি, তুমরা আইসবে।'

'কেন?' কপট চোখ পাকায় গীতালী, 'আমরা কি কলেরা না বসন্ত যে দেবীর কাছে আসতে ভয় পাবো?'

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে।

যুধিষ্ঠির মল্লিকের বয়েসের গাছ-পাথর নেই। কানে শোনে না, চোখেও খুব কম দেখে। বসে বসে ঢুলছিল সে অল্প তফাতে। শরীরের ঝুলে পড়া চামড়াগুলোকে শুকনো আমসির মত লাগে। সারা মুখে, কপালের বলিরেখার খাঁজে-খাঁজে অসংখ্য ভাঁজ, আঁকিবুকি, কারুকার্য। কথাবার্তা বড় একটা বলে না সে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। তবুও, তার ঐ নীরব বসে থাকা এবং মাঝে মাঝে ইতিউতি তাকানো দেখে মনে হয়, আজ কোনও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, এবং তার নায়ক সে স্বয়ং।

দিনের পুজো শেষ হয়েছে। আরতির দেরি আছে।

শ্যাম চক্রবর্তী এবং মধু মল্লিক সহ সকলে ঘিরে বসলো গীতালীদের। গল্পগুজব শুরু হলো হরেক কিসিমের। লোধাপাড়ার সমস্যা, রোগ-ব্যাধি, অপরিসীম দারিদ্র্য, অশিক্ষা সব কিছুকেই এরা পূর্বজন্মের অভিশাপ বলে ভাবে।

'ঈশ্বরের অসীম করুণা, দৈত্যকুলে এই প্রহ্লাদটি জন্মিছে। এই আমার মধু, মধুসূদন—' আবেগে গাঢ় হতে থাকে শ্যাম চক্রবর্তীর গলা। সহসা মধুর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে পরম মমতায় চুক্ করে আওয়াজ তোলে, 'বাঁচিয়া

বাঁচিয়া' থাক্ বাপ। বংশের, গোটা জাতের মু' উজ্জ্বল কর্।'

শ্যাম চক্রবর্তীর কথায় নৈতিক সমর্থন জানায় গীতালী এবং প্রণব। নিঃশব্দে। কেবল অভিব্যক্তির দ্বারা। সারা পাড়ার বাচ্চা-বুড়ো সগর্বে তাকায় মধু মল্লিকের দিকে। মধু তখন মাটিতে মুখ নাবিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

'তবে শালা মানুষ জাত তো— ।' যেউ পাতে খায়, সেউ পাতে হাগে।' সহসা গলার স্বর বেমালুম বদলে যায় শ্যাম চক্রবর্তীর, 'পেটে দু' অক্ষর পড়লেই, ডানা ছটফটিয়া উড়িয়াবে। যে সম্প্রদায়ে জনম, যারা কোড়ে-পিঠে করিয়া মানুষ কল্ল, তাদের বেমালুম ভুলিয়াবে। হয়ত লজ্জায় লধা বলিয়া পরিচয়ই দিবে নি ভদ্র সমাজে। 'এপিঠ-ওপিঠ' করিয়া পদবি বদল করিয়া লিবে।' একটু আগের স্নেহপ্রবণ নরম মানুষটি দ্রুত বদলে যেতে থাকে গীতালীদের চোখের সামনে। এখন তার চোখে বিষ, গলায় বিষ, জিহ্বায় বিষ। বলে, 'আর, পদবী বদলাবারই বা দরকার কি? মল্লিক, সে তো লধারও হয়, কায়স্থেরও হয়। জানুছে কে'টা?'

সারা পাড়া উপভোগ করছিল শ্যাম চক্রবর্তীর রুদ্র ভাষণ। তাদের স্বপক্ষেই চলছে ভাষণ। মধু মল্লিকের সম্ভাব্য সম্প্রদায়-ত্যাগের আশঙ্কা ক্রিয়া করছে সবাইয়ের মধ্যে। হঁ, এটা হইত্তে পারে খোব। কত্ত দেখলাম! পড়া লেখা শিখিয়া, চাকরি পাইয়া, নিজের মা-বাপকে ছাড়িয়া দিচ্ছে লোক!

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপটি করে বসে থাকে মধু। আগন্তুকদের সম্মুখে অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

তাও বিড়বিড়িয়ে বলে, 'তুমি মোকে অমনটা ভাবো, জ্যাঠা?'

'ভাববো নি তো কি রে?' দ্বিগুণ চটে যায় শ্যাম চক্রবর্তী, 'যদি ওরকমই নয় তুই, তবে, কত করিয়া কইলাম, তাও সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার ছা-গুলাকে পড়ালু নি ক্যানে? বল্? তোর চাইতে শিক্ষিত হয়্যাবে অরা? তোর মাতব্বরি মানবে নি, সেই কারণে? বল্!'

শ্যাম চক্রবর্তী অনেকদিন ধরে এ প্রস্তাব রেখে আসছিল মধুর কাছে।

দেখা হলেই বলতো, 'বাপ্, তুই ত' কিছোটা আগাইলু, অন্যগুলাকেও টানিয়া লিয়া চল্। বাপোরে, সেই যে মাটিয়াল ইস্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন পদ্য পড়ছিলু তুই! যে তুমারে নীচে ফ্যালে, না না, তুমি যারে নীচে ফ্যাল, সে তুমারে টানিবে যে নীচে— । মনে নাই, ভুলিগেলু অত জলদি?'

মধু মল্লিকের কবিতাটা মনে পড়ে যায় আগাগোড়া। বলে, 'ভুলি নি জ্যাঠা। তবে মুই তো মাঝে মধ্যে আইসি। দৈনিক আইলে তবো একটা কথা ছিল।'

'ওতেই হবে।' শ্যাম চক্রবর্তী বলে, 'যে ক'দিন থাকু এখানে, লিয়া বস না সক্কলকে। যেটুকু পারু শিখা না। টুকে পড়তে, লেখতে আর দুয়ে-দুয়ে চার হিসাব কত্তে পাল্লেও এদের জীবনে ঢের।' শ্যাম চক্রবর্তীর আবেগ বাধা মানে না, 'তা'পর ধর্, মকর ভক্তার ব্যাটা ফোরে উঠল এবার। সামনের বচ্ছর ফাইভে। পরের বচ্ছর সিক্স-এ। তোর অবর্তমানে উ হাল ধরবে টুকে আধে।

শুরুটা কর্ না তুই। ক্যাঁকড়া ধরা হাতে শিলেট-খড়িটা ধরু না শালারা পয়লা!'

বেশ কয়েকবার কথাটা বলেছিল শ্যাম চক্রবর্তী। এক-আধবার সব্বাইকে জোটাবার চেষ্টাও করেছিল মধু মল্লিক। দেখা গেল, মধু মল্লিককে দেখলেই জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে বাচ্চার দল। মধুও নিজেকে নিয়ে একেবারেই জেরবার। সঠিক অর্থে লড়াইই চলছে তার জীবনে। 'বিদিশা' থেকে খড়্গপুর কলেজ, বাঁরকাঁড়, ডিহিপার—সে শুধু দৌড়ুচ্ছে, অবিরাম দৌড়।

শ্যাম চক্রবর্তী এসব মানতে চায় না। আবেগের তাড়নায় সে সমানে গাল পাড়তে থাকে মধুকে।

'শালা, মানুষ হইল বেমানের জাত। লিবে চতুর্গুণ, দিবে নি এক ছাদাম। বরং সুযোগ পাইলেই ছুরি বসিইবে পিঠে।' ক্রমশ লাল হতে থাকে শ্যাম চক্রবর্তীর মুখ। টানটান হয়ে ওঠে ত্বক। কপালের শিরা ফুলে ওঠে, 'শালা, চারপাশে মুর্খ, বোকচন্দের দল ঘুরিয়া বুললে, তোর শিক্ষা-দীক্ষার বহর বুঝবে কে রে? রাঁধা-বাড়া কল্লি। সুস্বাদু পরমান্ন। চাখিয়া দেখবার লোক তিয়ার কর্। লচেৎ কে বুঝবে তোর হাতের গুণ!'

বক্তৃতা হয়তো আরো চলতো। সহসা মূর্তিমান রণভঙ্গ হয়ে হাজির হল সুকুমার পান্ডা। ফিরছিল নারাণগড়ের হাট থেকে। পথের ধারে পুজো দেখে দাঁড়িয়ে গেছে দু'দন্ড।

বড্ড ঠোঁট কাটা সুকুমারটা। তার ওপর শ্যাম চক্রবর্তীর ওপরে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করে। বিদ্বেষের কারণটা সুকুমারের কাছেও খুব একটা স্পষ্ট নয়। বাইরে সুকুমার লোধা-যজানোর একেবারেই বিরুদ্ধে। কিন্তু সামাজিক মর্যাদার বিনিময়ে শ্যাম যে চারপাশের আট-দশটা গাঁয়ের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে বসে আছে, এর জন্য মনের গভীরে বোধ হয় ঈর্ষা-জাতীয় কিছু কাজ করে সুকুমারের। হোক না লোধাপাড়া, হোক না গরীব, ধারে-নগদে, ফল-ফুলারিতে, কাঠে-বাঁশে, ঝাঁটি-পালায় এমন কি কম আয় শ্যাম চক্রবর্তীর?

মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গে মুখ ফসকে বেরিয়েও গেছে দু'একবার, 'ধুত্তেরি, মান লিয়া কি ধুইয়া খাবো হে। শ্যাম চক্রবর্তীর কি ক্ষতিটা হইচে? হাত-পা খসিয়াছে? নাকি পাছায় লেজ গজিয়াছে। আজকাল আর জাত অত দেখলে চলে না।'

ইদানীং মাঝেমাঝেই জাতিভেদের অসারতা নিয়ে মন্তব্য করে সুকুমার। আড্ডায়, মজলিশে, বিচারের থানে প্রসঙ্গ পেলেই সে শুরু করে।

'বামন, বামন! ব্রাহ্মণত্ব লিয়া কি জল খাবো ধুইয়া? হাল ধত্তে পাচ্চি নি, গেঁড়ি-কাঁকড়া খাইতে পাচ্ছি নি, চাকরি-বাকরি পাচ্ছে নি ছেলা-পুলা। জমি চষতে খচ্চা, মাছ-মাংসে খচ্চা, অথচ চাকরি-বাকরি সব নীচু জাতের লোকের। এ অবিচার কবে বন্ধ হবে হে?

মাঝে মাঝে বুঝদার কোনও লোক দেখলেই সে ঠাট্টাচ্ছলে শুধোয়, 'হুঁ হে,

অনেক ত' খবর রাখ, বল ত' সিডুল কাসট্ কি করিয়া হবা যায়? অথবা সিডুল-টাইব?'

সবাই শুনে হাসে।

'না, না, হাসি নয়। সত্যি জিগাই, বল না। আচ্ছা, আমরা তো পান্ডা, যদি 'এপিট-ওপিট' করিয়া পান্ডী করি? ছেলা-পুলারা পান্ডী লেখলো কিছো দিন। তারপর বড় খোকাটাকে ব্যা করিয়া আনবো শিবু মান্ডির একটা ঝি'কে— ।'

'তারপর?' মজা পায় শ্রোতার দল।

'তারপর পান্ডী আর মান্ডী মিলিয়া যে জনম্ লিবে, সে হয়্যাবে মান্ডী। চাকরি পাবে, লোন পাবে, আরো কত সুযুগ সুবিধা পাবে। শুধু মুদু এ ঢঁড়া সাপটাকে গলায় ঝুলিয়া রাখিয়া কি হবে বল দেখি?' ময়লা পৈতা-গাছি খানা দু'হাতে ঘন ঘন ঘসাঘসি করতে থাকে সুকুমার পান্ডা। ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলে বটে, কিন্তু কেউ কেউ বিশ্বাস করে, সুকুমারের এগুলো পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। এস-সি, এস-টি হবার জন্য সে কিঞ্চিৎ পাগলামী জুড়েছে ইদানিং। ব্লক অফিসে গিয়ে নাকি কবে ট্রাইবাল অফিসারের সঙ্গে গোপনে বার্তাচিত করে এসেছে। ডি-আই সাহেব এসেছিলেন স্কুল ইনসপেকশনে। সুকুমার পান্ডা তাঁর পিয়নের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। এবং খচ্চা কল্লে 'সিডুল-কাস্ট সার্টুপিকেট' বের করে দেবে, সদরে এমন কোনও লোক আছে কিনা, খোঁজ খবর নিচ্ছিল। একথা প্রকাশ হয়ে গেছে পরে।

শ্যাম চক্রবর্তীকে দেখে দন্ত ছিরকুটি হাসে সুকুমার পান্ডা, 'শীতলা-পুজায় চর্ম'বাদ্য কুথা হে? কেমন পুরোহিত তুমি? চর্ম'বাদ্য ছাড়া শীতলা পুজা হয়?'

পেতলের ঘড়ি-কংসালগুলো রাখা হয়েছে একপাশে। তাই দেখে, হাতের পুঁটলিখানা পাশে নামিয়ে রাখলো সুকুমার পান্ডা।

যুধিষ্ঠির মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ'গো মুরুব্বির পো, তুমরা মাকে তুষ্ট কত্তে পুজা কচ্ছ? নাকি রুষ্ট কত্তে?'

'রুষ্ট কত্তে কো ফের পুজা করে বাপ?' যুধিষ্ঠির মল্লিক বিড়বিড়ায়।

'তেবে কাংস্য বাদ্য ক্যানে?' আড়চোখে শ্যাম চক্রবর্তীকে একটিবার দেখে নেয় সুকুমার, 'শীতলা পুজায় যে কাংস্য বাদ্য বারণ, মা যে ধাতু বাদ্য একদম সইতে পারে না, সেটা ত গো-মুখ্যুও জানে হে— !'

সবাই ভেবেছিল, শ্যাম চক্রবর্তীর যা চড়া মেজাজ, এক্ষুণি না শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেধে যায়। কিন্তু ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো।

শ্যাম চক্রবর্তী মুচকি হেসে বলে, 'তুই এ পুজাটা ধরবি? বল্ না, ছাড়িয়া দিই। একটা জালি গামছা আর আড়াই-পুয়া আতপ-চাউল পাবি। তিনদিনের যজমানি বাবদ ঐ। লিবি?'

অকস্মাৎ যেন মর্ম'মুলে আঘাত লাগে সুকুমার পান্ডার। কেমন থতমত খায় সে। নুন খাওয়া জোঁকের মতন গুটিয়ে যায় সে নিমেষে।

বলে, 'মুই কি ঐ কথা বলছি নাকি, যে পূজোর যা নিয়ম। সেটাই বলতে চাইছলেম্।'

দু'পা এগিয়ে এসে ততোধিক নরম গলায় শ্যাম চক্রবর্তী বলে, 'জানি বাপ্। শীতলা পূজোয় চর্মবাদ্য, লক্ষ্মী পূজোয়, সত্যনারায়ণ পূজোয় কাংস্য বাদ্য, সব জানি বাপ্। কিন্তু একটা ঢাকি বিদায়ের খরচ জানু? ইয়ারা আড়াই পুয়া চাউল আর একটা জালি-গামছায় মায়ের আরাধনা কচ্ছে। এদের কাছে মাকে আর চর্মবাদ্য শুনতে হবে নি। দু'দিন বাদে ফুলগেড়্যায় ফের হবে পূজা। ভূঞ্যারা সে পূজার মাথা। তুই আছু পুরোহিত। মায়ের চারপাশে চারটা ঢাক মজুত করিয়া রাখিবি তিন দিন-তিন রাত। এ অভাগার দল ঢাক কুথা পাবে বাছা?'

সবাইয়ের চোখে বিষাদ যত না, বিদ্রূপ তার চতুর্গুণ। দেখে শুনে রণে ভঙ্গ দেয় সুকুমার পাণ্ডা।

'নাহ্। বেলা গেল। ঘরে যাই। গরু ঘুরবার টাইম হয়্যালো।' হনহনিয়ে হাঁটা দেয় সে। সবাই পেছন থেকে দেখতে থাকে ওকে। শ্যাম চক্রবর্তী হাসতে থাকে নিঃশব্দে।

'দেবতা হিসেবে এই যে বাজনার হেরফের, এটা কেন হয়েছে জান?' গীতালী সহসা শুধোয় প্রণবকে। বিষয়টি প্রাসঙ্গিকও বটে, তার চেয়েও বড় কথা, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া দরকার। সুকুমার পাণ্ডা খামোখা খানিকটা বিষাদের কালি মাখিয়ে দিয়ে গেল প্রত্যেকটি মুখে।

প্রণব মুখ ফিরে তাকায়। বলে, 'এরও কোনও সত্যিকারের কারণ আছে নাকি?'

'কেন? তুমি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড় নি? ও, তুমি তো আবার সায়েন্সের ছাত্র।' ঠোঁট ওলটায় গীতালী, 'মঙ্গলকাব্য পড়লেই বুঝতে এটা। শিকারী অরণ্যচারীদের কাছে পশুচর্ম সুলভ ছিল। ওদের পুজোয় তাই চর্মবাদ্যের ব্যবহার। লক্ষ্মী কিংবা নারায়ণ আর্যদের পূজা। আর্যরা ধাতুর ব্যবহার জানতো। সেই কারণেই তাদের পূজায় ধাতু বাদ্য।'

শালপাতায় কিছু ফল-মূল নিয়ে এলো মধু। 'লিন, প্রসাদ খাউন।'

ঠোঙা দুটো নিয়ে প্রসাদ খেতে থাকে গীতালীরা। খেতে খেতে শুধোয়, 'আচ্ছা, এই পুজোটাকে আর একটু ভালো করে করা যায় না? আরো একটু ধুমধাম করে?'

সে কথায় নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে সকলে। মধু বলে, 'বাপ্রে! এই কত্তেই আমরা হিমশিম খাই। ঘরে ভাত নাই কারো। তার উপরে এই পূজার খচ্চা।'

গীতালী বলে, 'ধর, তোমরা যদি বিঘে দুয়েক জমি পাও? চাষ করে পুজোর খরচ তুলতে পারবে না?'

'তা পারি। কিন্তু কুথা পাবো জমিন?'

প্রসাদটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ায় গীতালী। বলে, 'আমি তোমাদের দু'

বিঘা জমি দেবো। দানপত্র করে দেবো ঠাকুরের নামে।'

চারপাশে তুমুল কলরব ওঠে। অপ্রত্যাশিত এই সুযোগটির স্বরূপ বিশ্লেষণে তৎপর হয়ে ওঠে সবাই।

শ্যাম চক্রবর্তী এগিয়ে এসে গীতালীর সামনেটিতে দাঁড়ায়। গদগদ গলায় বলে, 'তুমার বাপকে মুই চিনতাম মা। বড় উদার মনের লোক ছিল। তুমিও পাইছ অর মতন বড় মন। ভগবান তুমার মঙ্গল কর্বন্।'

প্রবল আবেগে শ্যাম চক্রবর্তীর ঠোঁট কাঁপতে থাকে তিরতিরিয়ে।

পায়ে পায়ে ওদের পাড়া থেকে বেরিয়ে আসে গীতালী আর প্রণব।

পেছন থেকে ন্যাকা-সুধীর নির্দোষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে। একসময় চাঙ্-এর গায়ে বোল তুলতে শুরু করে।

ফাগুনে দ্বিগুণ জ্বালা
শীমতীর বুকে
মোকে ছেইড়ে কি করিয়া
আছে কালা সুখে, গো—লালিতে,
কে হরিয়া লিলো মোর পানোনাথে।'

পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রণব শুধোয়, 'জমি যে দান করবে বললে, তোমার জ্যাঠা ছাড়বেন ঐ জমির দখল?'

'কেন ছাড়বেন না? জমি আমার! আমি দান করতেই পারি।' গীতালীর গলায় উষ্মা চাপা থাকে না।

'দিলেই ভালো!' প্রণব মৃদু গলায় বলে, 'তবে যা বজ্জাত লোক—।'

'আমি আজই জ্যাঠাকে বলবো। এই বর্ষায় যেন দু'বিঘা জমিনের দখল দিয়ে দেয় এদের।'

গীতালী যখন ঘরে ফিরলো, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

উঠোনে বসে বাণেশ্বর ঘোষ, চপলাকান্ত আর জনাকয়েক মজুর শ্রেণীর লোক। গীতালী এদের মুখে চেনে। সবাই বাণেশ্বরের ঘরে খাটে-বাটে। জড়িয়ে থাকে এদের হাজারো কাজে-কর্মে। বারো মাস, তিরিশ দিন। নিতান্তই বশংবদ অনুগত লোকজন সব। গীতালী ওদের এক পলক দেখেই ভেতরে চলে গেল।

সমবায় সমিতি লোন বিলি করলো আজ। সেই উপলক্ষ্যে আজও খানা-পিনার ব্যবস্থা ছিল। লোন পেয়েছে বাণেশ্বর, সুদেব, কুলদা ডাক্তার আর কালাচাঁদ আইচের মুনিষ মাইন্দার আর অনুগত লোকজন। দিনের শেষে সবই ঢুকে গেছে যে যার 'মালিকে'র সিন্দুকে। এই টাকা দিয়ে বাণেশ্বর চড়া সুদে মহাজনী চালাবে সম্বৎসর। বৎসরান্তে শোধ করে দেবে সমিতির টাকা। মুনিষ-মাইন্দারগুলো শুধু টিপসই ধার দেয়। তার বিনিময়ে অনটনের মুহূর্তে ওরাও কর্জ পায় চড়া সুদে।

বাণেশ্বর ঘোষ এক এক করে ধরছিল। পাশে বসে সাহায্য করছিল

চপলাকান্ত। এক-একজন এগিয়ে এসে ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দিচ্ছিল বাণেশ্বরের দিকে।

'ফটিক হাজরার লোন কত?' হেঁকে চলে বাণেশ্বর।

'এগারো শো।' খাতা দেখে বলতে থাকে চপলাকান্ত।

নোটগুলো গুনে বুঝে নিয়ে কাঠের বাক্সে ফেলে দেয় বাণেশ্বর। 'ঠিক আছে।' হাত নেড়ে ফটিক হাজরাকে বিদেয় করে দেয় বাণেশ্বর, 'নগেন কামিল্যা— ।'

'চাষের পর পরই কিছো লাগবে মোর।' বিদায় মুহূর্তে মিনমিনে গলায় বলে ফটিক হাজরা, 'শ' দু'তিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' বিরক্তিতে মুখ নামিয়ে নেয় বাণেশ্বর। 'আগে থাইক্‌তে বলবি। নগেন কামিল্যা কুথা গেল হে—। আসছ নি ক্যানে?'

বিরক্তি ঝরে পড়ে বাণেশ্বরের মুখে।

নগেন কামিল্যা দাঁড়ায় এসে সামনেটিতে। ট্যাঁকের মধ্যে হাত চালাচালি করতে থাকে নিঃশব্দে।

॥ তের ॥

মনটা ইদানিং বড় উচাটন।

পঞ্চমী যেন সারাক্ষণই টানছে এক অদৃশ্য রশি দিয়ে। ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয় চলিয়া যাই অর পাশ। সর্বক্ষণ থাকি। দু'চোখ দিয়া বাঁধিয়া রাখি অর শরীরটাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। আশথ গাছের কোটরে গা' লুকিয়ে ডেকে চলেছে ধান-বোনা পোকা, চিঁ-ই-ই-ই-ই। গোক্ষুরের বুকের মধ্যেও একটা ধান-বোনা পোকার অবিরাম ডাক।

ইদানিং গোক্ষুরকে দেখলেই পঞ্চমী মুখ টিপে হাসে। বাঁকা চোখ আড়ে। চলে আসতে চাইলে, চুটা-মতিহার, গুড়-চা কিংবা 'ঐ গল্পটা ত শেষ হইল নি' —কোনও না কোনও অজুহাতে আটকে রাখতে চায় কিছুক্ষণ। বিদায়কালে সহসা বিষণ্ন হয়ে যায়।

গোক্ষুরেরও মনটা ইদানিং পড়ে থাকে পঞ্চমীর পাশে।

পারিজাতপুর গেছলো গোক্ষুর বিকেল বেলায়। হারি পিসির একটা কালা-কঁকা ঝি আছে। তাকে বিদেয় দিয়েছে ওখানে। মাঝে মাঝে অবুঝ বায়না ধরে হারি পিসি। যা বাপ, একটিবার দেখিয়া আয় অদের।

'অত ঘন ঘন কি দেখার আছে পিসি?'

'তা হউক। যা বাপ্, দেখিয়া আয়! মনটা বড় খুঁড়ছে।'

বিপদে আপদে বড় করে বুড়ীটা। গোক্ষুরকে ব্যাটার তুল্য ভালোবাসে।

কথা ঠেলতে পারে না গোক্ষুর। যেতে হয়।

গিয়েছিল সেই কারণেই। ফিরতে রাত হলো। সন্ধ্যেপহরে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। নাগাড়ে ঘণ্টাটাক চললো বৃষ্টি। আকাশ যখন ফরসা, তখন এক ঘড়ি রাত। চাট্টি ভাত খাইয়েই ছাড়লো হারি পিসির ঝি। গেঁড়ির ঝোল আর ভাত।

পচা খাল পেরিয়ে যমুনার জঙ্গলের ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মনের মধ্যে খালি ঘাই মারছিল পঞ্চমীর মুখখানি।

পঞ্চমীর দোরে আজ যাবেই ফিরবার পথে, ঠিক করাই ছিল গোক্ষুরের। শ্যাম চক্রবর্তীর কাছ থেকে নিয়েছে পিত্তের ওষুধ। ঐ ওষুধটা মুরলী কোটালকে দিতে যাবে আজ। একটা উপলক্ষ্য ত চাই। দিনদিন কোন্ অছিলায় যাবে গোক্ষুর পঞ্চমীকে দেখতে!

ট্যাঁকের মধ্যে ওষুধের পুঁটলিখানা খসখস করছে। পচাখালের পাড়ে সিঁদুর-মুড়ি আমের গাছটার মগডালে তিন-চারটা আম ঝুলছিল। কাঠ-বেড়ালীর মত তরতরিয়ে উঠে গিয়ে আমগুলো পেড়েছে গোক্ষুর। কোঁচড়ে ভরে নিয়েছে পঞ্চমীর জন্য। যাবার বেলায়। বুকের মধ্যে চষি পোকার ডাকটা তীব্র হচ্ছে ক্রমশ। পোকাটা অস্থির হয়ে উঠেছে এখন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। কৃষ্ণা পঞ্চমীর স্বাস্থ্যবতী চাঁদ। চারপাশের জঙ্গল, মাঠ, গাছ-গাছালির গায়ে পাতলা রুপোর জল মাখিয়ে দিয়েছে। হাওয়া বইছে ফুরফুরিয়ে। যমুনার ডাঙা পেরিয়ে গোক্ষুর বাঁক নিলো মুরলীর বাড়ির দিকে।

জঙ্গলের ধার ঘেঁসে পায়ে চলা পথ। খানিক আগে চান করে গাছ-গাছালগুলি তরতাজা। পাতায় পাতায় ঝিকমিক করছে জল, চাঁদের আলোয়। দরজার আগড়ে ঘা মারতে গিয়ে সামলে নিল গোক্ষুর। ভেতরে ফিসফিসানি কথা চলছে। কেমন যেন খটকা লাগলো গোক্ষুরের। অত রাতে মুরলীর ঘরে কে? ফিসফিসিয়েই বা কথা বলছে কেন? আগড়ের গায়ে কান পাতলো গোক্ষুর। কথা বলছে তিনজন। তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? কোনও কুটুম এলো নাকি মুরলী কোটালের ঘরে!

অল্পক্ষণ খাড়া থেকে আগড়ে মৃদু টোকা মারলো গোক্ষুর। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থেমে গেল। ঘরের-মধ্যে একখানা ডিবরি জ্বলছিল। ঝুপ্ করে নিভে গেল নিমেষে। সন্দেহটা গাঢ় হলো গোক্ষুরের। তৃতীয় ব্যক্তিটি পুরুষ মানুষ। নীচু গলায় কথা বললেও গোক্ষুরের কানকে ফাঁকি দেওয়া মুসকিল। দ্বিতীয়বার দরজায় ঘা মারে গোক্ষুর। এবার কিঞ্চিৎ জোরে।

'কে?' ভেতর থেকে ভেসে আসে মুরলী কোটালের গলা।

'মুই গোক্ষুর ভক্তা।'

ভেতর থেকে বাপ-বেটির গুজুর গুজুর শুনতে পায় গোক্ষুর। সন্তর্পণে কিছু বলছে দু'জনে।

'দাঁড়া। খুলি।' হাই তোলে মুরলী।

একটু বাদে দরজা খোলে।

'কি বেপার ?' মুরলী কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে শুধোয়, 'অত রাতে ?'

'তুমার তরে পিত্তর ওষোধ লিয়া আইলাম।' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোক্ষুর। অনুমতির অপেক্ষা না করেই।

মুরলী যেন স্বাভাবিক হওয়ার ভান করে। 'দাঁড়া আলোটা নিভিয়া গেল। জ্বালি।' দেশলাইতে খচাখচ আওয়াজ তুলে ডিব্রি জ্বালে মুরলী।

এতক্ষণে পঞ্চমীকে দেখতে পায় গোক্ষুর। কুঠরীর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ট্যাঁক থেকে ওষুধের পুঁটলিটা বের করে এগিয়ে দেয় গোক্ষুর। 'এই হইলো তুমার গা জ্বলুনির ওষোধ।'

পঞ্চমীর দিকে তাকায় গোক্ষুর। ঘুমে ছোট হয়ে আসা চোখ। যেন ঘুমুচ্ছিল এতক্ষণ। গোক্ষুরের ডাকে ভেঙে গেছে। কিন্তু গোক্ষুর স্পষ্ট বুঝতে পারে, ঘুমঘুম ভাব করছে বটে, তবে চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। কোঁচড়ের আমগুলো পঞ্চমীর দিকে এগিয়ে দেয় গোক্ষুর।

এমনিতেই জৈষ্ঠোর আম-পাকানো গরম। তার ওপর দরজা আঁটা এই ঘরখানির মধ্যে গুমোটটা দ্বিগুণ। অনেকখানি হেঁটে আসার সুবাদে গোক্ষুর এমনিতেই ঘামছিল। এই নিশ্ছিদ্র ঘরের মধ্যে গলগলিয়ে ঘামতে লাগলো সে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যে দু'আড়াই পহর রাত অবধি নেহাৎ ঝড়-বৃষ্টি না হলে গরীব-গুরবোরা উঠোন ছেড়ে ঘরে ঢোকে না কদাপি। এরা বাপ-বেটি ঘরের মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছে কেন ? বৃষ্টি তো থেমে গেছে কখন !

সবচেয়ে বড় কথা, কুঠরীর ভেতরে আরো একজন কেউ আছে। চোরের কান। মিছা বলবে নি কদাপি। একজন আছে। মানুষ। এবং পুরুষ মানুষ। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে গোক্ষুর। মগজের মধ্যে একরাশ সন্দেহ নিয়ে এখন কি করে চলে যায় গোক্ষুর ! পঞ্চমীর প্রতি প্রেমটা সবে গাঢ় হয়েছে। এই অবস্থায় সন্দেহের সূক্ষ্ম কাঁটাটি বিঁধিয়ে চলে যাওয়া যায় ?

গোক্ষুর বসে থাকে। এটা ওটা প্রসঙ্গ তোলে। কিন্তু কান দুটিকে খাড়া রাখে সর্বক্ষণ। মুরলী আর পঞ্চমীর প্রতিক্রিয়া সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ করে। আশঙ্কা জমে রয়েছে দু'জনেরই চোখে। ভাবটা, কখন বিদেয় হয় গোক্ষুর। গোক্ষুর আরো জাঁকিয়ে বসে। বলে, 'শালপাতা আর মশলার পুঁটলিটা কুথা ? দাও তো। চুটা খাই নি অনেকক্ষণ।'

তাক থেকে মতিহার আর শালপাতা এনে মেঝের ওপর রাখে পঞ্চমী। গোক্ষুর পরিপাটি করে চুটা বানাতে বসে।

মুরলী অকারণে হাই তুলতে থাকে বারংবার। হুশ-হাশ করে মশা তাড়ায়। ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে ঘাম পুঁছতে থাকে গায়ের।

সহসা মৃদু কাশির আওয়াজ আসে ঘর থেকে। গোক্ষুরের কোনই সন্দেহ ছিল না। তাও একটা উপলক্ষ্য পায় সে।

'কাশে কে ? ঘরে ?'

'কে কাশবে ? কোউ নয়।' মুরলী আগ বাড়িয়ে জবাব দেয়।

'মুই গলা ঝাড়লাম।' পঞ্চমী জবাব দেয় এবং আর একবার গলা ঝাড়ে।

'তুই?' প্রচণ্ড সন্দেহ আর ঘৃণা নিয়ে তাকায় গোক্ষুর। একটা গূঢ় ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে সে। মনের মধ্যে অবিরাম চলছে সাত-সতের উবুর-ডুবুর খেলা।

এমনি সময় সজোরে কাশির শব্দ। পর পর দু'বার। ভয় পেয়ে যায় বাপ-মেয়ে। তবুও চমকে ওঠার ভান করে। 'ঠিক ত। গলা ঝাড়লো কে? খিড়কির দিক থেকেই আইলো আওয়াজটা।' ফিস ফিস করে বলে মুরলী, 'পুলুশ-টুলুশ নয় তো?'

'পুলুশ আইসবে কার খোঁজে?' পঞ্চমী শুধোয়।

'আইলে গোখরার খোঁজেই আইসবে!' মুরলী রায় দেয়। 'মুই ত এ কাজ ছাড়িয়া দিছি বিশ-তিরিশ বচ্ছর। মোর দোরে রাতে-ভিতে পুলুশ আসা বন্ধ হইচে আজ দশ-পনদরো বচ্ছর।' গোক্ষুরের দিকে সরাসরি তাকায় মুরলী কোটাল, 'পালিয়া যা শালা। অরা খিড়কির দিকে আছে। তুই নিঃশব্দে আগড় খুলিয়া অন্ধকারে হাওয়া হয়্যা যা এইবেলা। ফাঁদে একবার পাড়িয়া গেলে মারা পড়বি।'

শুনতে শুনতে চোখ-মুখ কঠিন হয়ে আসে গোক্ষুরের।

শক্ত গলায় বলে, 'আওয়াজ আসতেছে ঘরের ভিতর থিকে। চোরের কান কেমন, তুমি জান নি মুরলী জ্যাঠা? শুধু-মুদু তখন থিকে ছিনারি কথা বলছো। ঠিক করিয়া কও তো, কাকে ঢুকিইছ ঘরে?'

মুরলী কোটাল জোরে জোরে মাথা নাড়ে। দিব্যি করে, কিরা কাড়ে। গোক্ষুর পাথরের মতো বসে বসে ডুবে যায় অতল ভাবনায়। হাজার সংশয় আর সম্ভাবনার কথা মনে হয় তার। মুরলী কোটাল তো বুড়া হয়েছে। খাটা খাটা কত্তে পারে না। এদের সংসার তেবে চলে কি করিয়া? তবে কি, তবে কি রাতের বেলায় ঘরে লোক ঢুকিয়েই এদের সংসার চলে? ক্রমে ক্রমে ভাবনার ডাল-পালা গজায়। সে রাতে পঞ্চমীর আচার ব্যবহারগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে। গোক্ষুরকে কেমন আড়ষ্টহীন টেনে নিয়েছিল সেদিন। কেমন নিঃসঙ্কোচে মিশিয়ে দিয়েছিল নিজের শরীরের সঙ্গে। কেমন মুখ-খানা গুঁজে দিয়েছিল গোক্ষুরের বুকের মধ্যে। যেন প্রতি রাতের অভ্যস্ত ব্যাপার-স্যাপার।

ধীরে ধীরে ট্যাঁকে হাত রাখে গোক্ষুর। ক্ষুদে টর্চখানা বের করে। আচমকা টর্চখানা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে ঢুকে পড়ে কুঠরীর মধ্যে। ফোকাস ফেলে ঘরের কোণে। এবং পর মুহূর্তেই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে।

নিতাই মাস্টার। গুটি সুটি বসে রয়েছে ঘরের এক কোণে।

বিস্ময়ে থ হয়ে যায় গোক্ষুর। দীর্ঘ দিন ফেরার থাকবার পর লোকটা এলাকায় ফিরেছে। সেদিন রাতে মোলাকাত হয়েছে গোক্ষুরের। নিতাই

মাস্টার সেটা জানে না। বাণেশ্বর ঘোষ লোক লাগিয়েছে। নিতাই মাস্টারের ডেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। পুলিশকেও জানিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা।

ঘরের এক ধার ঘেঁষে চাটাইয়ের ওপর বিছানা পাতা। ঠিক ঐ দিনের মত! বিছানা আলু-থালু। দেখতে দেখতে সন্দেহে কুটিল হয় গোক্ষুরের মন। দু'চোখ ছোট হয়ে আসে।

'তুই যে চোর-সাধু সব্বাইকে ঘরে ঢুকাউ রে, পঞ্চমী! ঠিক যেন গঙ্গা নদীটি! চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান, সক্কলে সিনান করিয়া লেয়, তোর জলে।'

পঞ্চমীর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। মুরলীর চোখের ওপর চোখ রাখে সে। মুরলীর চোখ-মুখ বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। নাকের পাটা ফুলে উঠছিল বার বার।

দু'চোখ ছোট করে বলে, 'বইস চার কুড়ির উপর বটে। তা বলিয়া তোকে যে এক লাথে ঘরের বাইরে বার করিয়া দিতে পারবো নি, অমনটা ভাবিস নি গোখরো।' হিস হিসিয়ে ওঠে মুরলী, 'শালা, নিমক হারাম, সেদিন বুকে জাপটিয়া তোর জীবন বাঁচালো বলিয়া আজ মেয়াটাকে খোঁটা দিলি। হ্যাঁ রে শালা, সেদিন উ তোকে বিছানায় না ঢুকালে, এ্যাদ্দিনে খাল ধারে তোর মড়াচীরে ঘাস গজিয়া যাইতো নি?'

'আরে রাগ-অ ক্যানে জ্যাঠা? রাগের কথা কি কইলাম?' পঞ্চমীর বিছানার উপর থাবড়ে বসে গোক্ষুর, 'শুধু বলছিলাম, চোর-সাধু সক্কলের নিমন্তন পঞ্চমীর দোরে।'

'বেশ কইরেছি।' সহসা ফণা তোলে পঞ্চমী, 'চোর-ছ্যাঁচোড়কে বাঁচিইতে যদি বিছানায় ঢুকাইতে পারি, তো নিতাই কাকার মতন দেবতুল্য মনিষ্যিকে দরকার হইলে আজীবন ঢুকিয়া রাখবো ঘরে।'

বাগ-বিতণ্ডা বাড়ে। কথা বাড়ায় গোক্ষুর। এবং পঞ্চমীর চরিত্র নিয়ে আর একটিবার স্থূল ইঙ্গিত করবাব সঙ্গে সঙ্গে মুরলী উঠে এসে হাতের লাঠির এক ঘা বসিয়ে দেয় ওর পিঠে।

গোঁ—গোঁ করতে করতে পঞ্চমীর বিছানাতেই নেতিয়ে পড়ে গোক্ষুর। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নিতাই মাস্টার উঠে এসে দাঁড়ায় গোক্ষুরের পাশটিতে। জলদি জল আনতে বলে পঞ্চমীকে।

ছুটে গিয়ে কলসী থেকে জল গড়িয়ে আনে পঞ্চমী। গোক্ষুরের মুখে-চোখে ছাট মারে জলের। মুরলী কোটাল গর্জাতে থাকে সমানে। ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে বিজলী মারে ঘনঘন।

খানিক বাদে চোখ মেলে গোক্ষুর। উঠে বসে। সামনে নিতাই মাস্টারকে দেখেই জড়িয়ে ধরে ওর পা। 'পাপী মুই। পাপ কথা কইছি। পক্কা পড়বে মুহে।'

নিতাই-মাস্টার শান্ত করে গোক্ষুরকে। দু' ঢোক জল খাওয়ায়। গোক্ষুরের চোখে-মুখে গাঢ় অপরাধ। পঞ্চমীর দিকে তাকায় সে। পঞ্চমীর

চোখ-মুখ নরম হয়ে এসেছে ততক্ষণে। সে পুব-বারান্দার দিকে পা বাড়ায়! কাঁটা-খোঁচা জেবলে উনুন ধরায়! এনামেলের বাটিতে জল চড়ায়। দুধ ছাড়া গুড়-চা বানায় তিন-জনের জন্যে। তিনবাটি চা গোক্ষুরদের সামনে বসিয়ে দিয়ে অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাথাটা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় শালপাতা আর মতিহার নিয়ে বসেছে মুরলী কোটাল। চায়ে চুমুক মারতে মারতে সে চুটা পাকাতে থাকে নিবিষ্ট মনে।

গোক্ষুর কথা বলছিল না। গুম মেরে বসেছিল সে। নিতাই মাস্টারের ত্যাগ আর মহত্বের নানান ঘটনা ঘাই মারছিল মনে। মানুষটা সেই কবে থেকে গরীবের হয়ে লড়াই চালাচ্ছে নাগাড়ে। প্রত্যেকেই সুসময়ে যার-যার মতো গুছিয়ে নিয়েছে। এক এই নিতাই মাস্টারই তার ব্যতিক্রম। আজও সে পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বনে-জঙ্গলে গোপন-বৈঠক করে চলেছে! অন্তরাল থেকে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন, বর্গা চাষীদের ন্যায্য ভাগ ইত্যাদির জন্য লড়াই চালাচ্ছে। অথচ সামান্য আপোশ করলেই সে অন্যদের মত বহাল তবিয়তে ঘরবাস করতে পারতো।

যুক্তফ্রণ্টের আমলের কত উঠতি নেতা, মাতব্বর তো সব ছেড়ে-ছুড়ে বসে গেছে একেবারেই। কেউ কেউ আছে আলগা-আলগা, ওপর-ওপর। কেউ কেউ তো উল্টো রাজনীতিও ধরেছে। অথচ এই লোকটা— !

সহসা যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে গোক্ষুর! মাস্টারের দিকে ঘন হয়ে চাপা গলায় বলে, 'তুমি এই এলাকা ছাড়িয়া পালাও মাস্টার। পুলুশ তুমাকে খুঁজছে।'

'পুলিশ!' নিতাই মাস্টার বেজায় চমকে ওঠে, 'পুলিশ জানলো কি করিয়া, আমি এলাকায় আছি ?'

'বাণেশ্বর ঘোষ থানায় গিয়া খবর দিয়া আসুসে।'

'বাণেশ্বর ঘোষ! সেই বা জানবে কি করিয়া ?'

গোক্ষুর একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। তারপর মৃদু গলায় বলে, 'মুই কইছি।'

'তুই ? তুই কি করিয়া জানলু, মুই এই তল্লাটে আছি ?' নিতাই মাস্টারের বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল উত্তরোত্তর।

গোক্ষুর ধীরে ধীরে সে রাতের ঘটনা প্রকাশ করে।

বলে, 'চোরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন মাস্টার। তুমি হয়তো চিনতে পার নি মোকে, মুই ঠিক চিনছি।'

মুরলী কোটাল গোক্ষুরকে এই মারে তো সেই মারে। নিতাই মাস্টার শান্ত করে মুরলীকে। নরম গলায় বলে, 'থাউ, থাউ। অকে মারিয়া আর কি হবে ? তবে, হ্যাঁ রে গোক্ষুর, তুই কি সত্যি-সত্যিই চাউ, মুই এ তল্লাট ছাড়িয়া চলিয়া যাই ?'

গোক্ষুর নিঃশব্দে মাথা নামায়।

ঘন ঘন কাশছে নিতাই মাস্টার। সর্দি-কফে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠছে

বুকে। ঠাণ্ডা লেগেছে এন্তার। প্রচণ্ড অনিয়মে শরীরখানা খারাপ হয়ে গেছে বেজায়। ডাক্তার না দেখালে কেস জটিল হয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে নিতাই মাস্টারও। তারপর শুধোয়, 'এই যে মোকে দেখলি এখানে, এটাও কি বাণেশ্বর ঘোষকে বলিয়া দিবি ?'

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই মাস্টারের পা'দুটো জড়িয়ে ধরে গোক্ষুর। কাঁদতে থাকে অঝোরে।

'এখন তুমি পালাও মাস্টার।' কান্না থামিয়ে গোক্ষুর বলে, 'পুলিশ সত্যিই বেজায় নজর রাখছে মাটিয়াল, ডিহিপার, কোটালচক আর যমুনার উপর। ন্যাকা-সুধীর গাঁয় গাঁয় ঘুরছে তুমার সন্ধানে। এখন ক'দিন তুমি যাও। মুই ফের সময় বুঝিয়া ফিরিয়া আনবো তুমাকে।'

'তুই ?' নিতাই মাস্টার বিস্মিত, 'তুই ফিরিয়া লিয়া আইসবি মোকে ?'

'হুঁ। পথের কাঁটা লিকাশ করিয়া মুইই ফিরাবো তুমাকে।'

গোক্ষুরের চোখে-মুখে অপরিসীম ব্যাকুলতা।

নিতাই মাস্টার হাসে।

বলে, 'মোর তরে ভাবিস নি। নিজের কথা ভাব। কি পাইলি জীবনে! চুরি কত্তে গিয়া বউকে হারালি। বাণেশ্বর ঘোষের দল লাল হয়্যালো, আর তুই পুলিশের ভয়ে দিনরাত খেদাড়-খাওয়া মুষার মতন গাড়-গত্তে লুকিয়া বেড়ালি, ধরা পড়িয়া অশেষ নির্যাতন সইলি, আর বারে বারে জেল খাটলি। তোর কষ্টের ধন অন্যে ভোগ কল্ল।'

নিতাই মাস্টার থামে।

গোক্ষুর তখন গভীর ভাবনায় মগ্ন। সত্যি কথাই বলেছে নিতাই মাস্টার। পুলিশের ভয়ে কম দিন জঙ্গলে বাস করে নি গোক্ষুর। পুলিশের তাড়া খেয়ে ইঁদুরের মত দৌড়ুতে হয়েছে কত দিন। শীতের রাতে কেলেঘাইর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। কনকনে জলে ডুবে থাকতে হয়েছে যতক্ষণ না খাঁকির দল স্থান ত্যাগ করে। ধরা পড়ে, কত মারই না খেয়েছে গোক্ষুর। শুধু কি থানায় ? গাঁ'র লোকের হাতে ধরা পড়লে তো আর রক্ষে থাকে না। বাণেশ্বর ঘোষরাই বসিয়ে দেয় বিচারের আসর। তখন বাণেশ্বর ঘোষেরই কি দাপট, হম্বিতম্বি ' দড়া আন্, বিছাতি আন্, মালসায় আগুন ভরিয়া আন্…। মার খেতে খেতে হেগে-মুতে ফেলে গোক্ষুর। ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জলের ছিটা দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হয়। জ্ঞান ফিরলেই বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'শালাকে ফের টাঙিয়া দে। শালার চুরি করা জন্মের মতন ঘুচিয়া যাউ।'

এইখানেই বড় তাজ্জব লাগে গোক্ষুরের। অন্যেরা পারে, অবশ্যই পারে। কিন্তু বাণেশ্বর ঘোষ কিংবা থানার বড়বাবু, যারা কিনা গোক্ষুরের মুল মুরুব্বি, তারা কি করে অমন নিষ্ঠুর হয় ? কোন্ হিসেবে তারা গোক্ষুরকে অত নির্যাতন করে ?

মাড়োতলায় ঝুলন্ত অবস্থায় গোক্ষুর যখন ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে, তখন

চেয়ারে বসে বাণেশ্বর ঘোষ একটা কথাই শুধু বলে বারংবার, 'আর চুরি করবি ? বল্, আর চুরি করবি ? বল্ ?'

প্রাণের তাগিদে গোক্ষুর শেষ অবধি কবুল করে, 'আর চুরি করবো নি গো—, ছাড়িয়া দও। তুমি মোর বাপ গো—ছাড়িয়া দও।'

ছাড়া পেয়ে গোক্ষুর ঘরে যায়। শুয়ে থাকে নিঃসাড়ে। সারা শরীর বিধ্বস্ত। শরীরের কোষে কোষে, প্রতিটি রোমকূপে, অসহ্য ব্যথা। দু'তিন দিন পাশ ফিরতে পারে না।

কয়েকদিন বাদেই ডেকে পাঠায় বাণেশ্বর ঘোষ! বলে, 'কি বে শালা, গা'র বেদনা কমল ?' বলে, 'জ্যানা-গেড়িয়ার অনন্ত জ্যানা নাকি জমিন কিনবে ? কালই নাকি রেঁস্ট্রি। দাঁওটা মারতে হইলে, আজ রাতেই। কাল সকালে গরুর গাড়ি চড়িয়া সোনার পাইখ হাওয়া।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গোক্ষুর। বাণেশ্বর ঘোষের মুখের দিকে। ভারি রহস্যময় লাগে লোকটিকে। কেন এমন করে এরা ? কিই বা মনস্তত্ত্ব !

বাণেশ্বর ঘোষের মেজাজ খুশ থাকলে কোনও কোনও দিন একটু আধটু খোশগল্প জোড়ে গোক্ষুরের সঙ্গে। ঐ মুহূর্তে বহুবার বাণেশ্বর ঘোষকে প্রশ্নটা করেছে গোক্ষুর। তুমরাই চুরি কত্তে পাঠাও, তুমরাই মাল লও, ফের ধরা পড়লে তুমরাই বেশি দাঁত কিঁড়িমিড়ি কর, ক্যানে ঘোষদা ?'

'তুমরা, মানে ?' বাণেশ্বর ঘোষ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত। গোক্ষুর ভক্তা ভেতরে ভেতরে আরো কোনও মনিব পাকড়েছে নাকি !

'তুমরা মানে, তুমি, থানার বড়বাবু, দু'জনারই দেখি একই ব্যাভার। চুরি করাবে, মাল ঘরে তুলবে, ফের সক্কলের চাইতে বেশী পিটাবে।'

বাণেশ্বর ঘোষ মুচকি হেসে এড়িয়ে যায় কথাটা বারবার। কিছুতেই খোলাখুলি জবাব দেয় না। কেবল রহস্যময় গলায় বলে, 'আমরা হইলাম মশার জাত। বুঝলি গোখ্‌রো ! যার রক্তে জীবন বাঁচাই, তাকেই হুলের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলি।'

নিতাই মাস্টারের কথাগুলো একনাগাড়ে ঘাই মারছে মনে। দিনকতক আগে মুরলী কোটালও ঠিক এই ধরনের কথাবার্তা বলছিল। এদের কি তবে গোক্ষুরের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে আগে ? নিতাই মাস্টার কি তবে মাঝে মাঝেই যাতায়াত করে মুরলী কোটালের দোরে !

নিতাই মাস্টার ক্রমাগত কাশছিল।

গোক্ষুর বলে, 'তুমি ওষোধ খাও মাস্টার। কফে ভরিয়া আছে তুমার ছাতি, নাক···। সেদিন রাতে কালিয়াঘাই'র পাড়ে বহুত দূর থিক্যা তুমার নিঃশ্বাসের সাঁই-সাঁই আওয়াজ আর ছাতির ঘড়ঘড়ানি শুনতে পাচ্ছিলাম মুই।'

নিতাই মাস্টার শুনছিল আর মিটি মিটি হাসছিল।

গোক্ষুর বলে, 'শ্যাম ঠাকুর সর্দি-কফের ভালো ওষোধ জানে। তুমি কুথায় থাকবে, বল। আমি নিজে গিয়া পেঁছিয়া দিয়া আইস্‌বো ওষোধ।'

গোক্ষুরের পিঠে হাত রাখে নিতাই মাস্টার। বলে, 'মোকে লিয়া ভাবিস

নি। তুই এ পথ থিক্যা ফিরিয়া আয়। গোক্ষুর, তোকে দিয়া একটা জাত-অস্ত্র তিয়ার করি।' বলতে বলতে রুগ্নমুখের আড়ালে নিতাই মাস্টারের চোখ দুটো হীরের কুচির মত জ্বলে ওঠে।

মুরলী আর পঞ্চমীর মুখের দিকে তাকায় গোক্ষুর। মুরলী ঢুলছে। আর পঞ্চমী পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে গোক্ষুরের দিকে। সে চোখে শুধু অসহায় ব্যাকুলতা। যেন, বলছে, মানিয়া লও, মানিয়া লও গো, মাস্টারের কথাগুলা। তুমার দু'পায়ে পড়ি, মানিয়া লও।

গোক্ষুর উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'তুমার সব কথা মোর মনে রইবে মাস্টার। চলি। রাত হইল।'

গোক্ষুর বেরিয়ে আসে উঠোনে।

মুরলী কোটাল বলে, 'বেড়ের আগড়টা বাঁধিয়া দিয়া আয় পঞ্চমী। সাবধানের মার নাই।'

পঞ্চমী আগড় অবধি যায় গোক্ষুরের পিছু পিছু।

আগড় পেরোবার আগে সহসা পিছু ফেরে গোক্ষুর। অন্ধকারের মধ্যে পঞ্চমীর চোখে চোখ ফেলে। ভারি রহস্যময় লাগছিল পঞ্চমীর চোখ দুটি। এক দৃষ্টিতে গোক্ষুরকে দেখছিল সে।

আগড়ের বাইরে পা বাড়ায় গোক্ষুর। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ওর ছেঁড়া গেঞ্জির খুঁট খামচে ধরে পঞ্চমী। টেনে নেয় নিজের দিকে। গোক্ষুর হকচকিয়ে যায় মুহূর্তের তরে।

পঞ্চমী ওর ডান হাতখানা পুরে দেয় গেঞ্জির ভেতরে। গোক্ষুরের পিঠময় ঘুরে বেড়াতে থাকে পাঁচটি নরম আঙুল। খুঁজে বেড়ায় কিছু। সহসা লম্বাটে ফুলে ওঠা দাগটির ওপর থেমে যায় আঙুলগুলো। মুরলী কোটালের লাঠির ঘায়ে ফুলেছে। এতক্ষণ তেমন সাড় পায় নি গোক্ষুর। পঞ্চমীর হাতের ছোঁয়ায় চিনচিন করে ওঠে। ফোলা জায়গাটা ঈষৎ টিপে টিপে দেখে পঞ্চমী। মোলায়েম আঙুল বোলায় নিঃশব্দে।

গোক্ষুর যেন ভেসে যাচ্ছিল এক তুমুল স্রোতের টানে। শরীর জুড়ে কেবল অবিরাম কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ···।

সহসা পঞ্চমীকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরে সে।

পঞ্চমী বাধা দেয় না এক তিল। বরং গোক্ষুরের বুকের মধ্যে কপোতুর পাখিটির মত লুকিয়ে থাকে সে। শুধু গভীর রাতের উদ্দাম হাওয়ায় তার লালচে রঙের চুল আরো এলোমেলো হয়ে যায়।

সহসা ঘরের ভেতর থেকে ডাক পাড়ে মুরলী কোটাল, 'পঞ্চমী, কুথা গেলি রে?'

পঞ্চমী এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় গোক্ষুরের দু'হাতের বাঁধন থেকে। কাপড়-চোপড়, ঠিক-ঠাক করে নেয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিয়ে জবাব দেয়, 'দাঁড়াও গো, আঁধারে খুঁজিয়া পাচ্ছি নি আগড় বাঁধার দড়িটা।'

গোক্ষুর ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে আঁধারে।

॥ চোদ্দ ॥

আজ রাখী-পূর্ণিমা। বামুনদের আনন্দের দিন। দিনভর প্রাপ্তিযোগ। পেটে ও নগদে।

রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে রাখী বাঁধতে যায় বামুনেরা। এ ব্যাপারে তল্লাটের আট-দশ খানা গাঁয়ের সম্পন্ন মানুষগুলিকে বেছে নেয় ওরা। বেরিয়ে পড়ে বাড়ির বুড়ো-ছেলে সবাই। এদিনে যে যাবে না, তার সমূহ ক্ষতি। সাতদিন আগে থেকে সাজো-সাজো রব পড়ে যায় প্রত্যেকটি বামুন ঘরে। তুলো, রঙ, সুতো ইত্যাদি দিয়ে রাখী-বানানোর হিড়িক চলে। বাচ্চাগুলোর উৎসাহ বেশি। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে পড়ে। দিনভর প্রতি ঘরে ফলার। সন্ধ্যে বেলায় কিছু নগদ পয়সা নিয়ে বাড়ি ফেরা। তিন-চার দিন আগে থেকে রাখী নিয়ে তৈরী হয় সবাই। বড়রা যাবে একা একা। বুড়ো দাদুর দল যাবে কাঁচ নাতিগুলিকে নিয়ে। গুটি-গুটি হাঁটবে! একটি কি দুটি গাঁ' ঘুরতে না ঘুরতেই সন্ধ্যে। স্কুলে পড়া ছেলে-পুলেরা নিজেদের মধ্যে দল বানিয়ে নিয়েছে। যার সঙ্গে যার পটে। দু'-জনের বেশি নয় একটি দলে। দলে বেশি থাকলে খাদ্যও কম পড়ে ভাগে, দক্ষিণাও। প্রতি দল অন্যাদের টেক্কা দিতে চায় গ্রাম পরিক্রমায় এবং অর্থ সংগ্রহে! পরের দিন কোন্ দল ক'টা গাঁয়ের মোট কত ঘর ঘুরতে পেরেছে এবং কত টাকা সংগ্রহ করেছে, তার হিসেব নিকেশ চলে। সবচেয়ে ভালো দলটি পায় বামুন ঘরের মেয়েদের সাধুবাদ এবং সব চেয়ে অসফল দলটি পায় ঠাট্টা-টিটকিরি। ফলে রোখ বাড়ে। পরের বচ্ছর দেখিয়া লুবো হে!

সকাল থেকে মেঘ জমেছে আকাশে? ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে দলে দলে বেরিয়ে পড়ছে মেট্যাল, কোটালচক, আর যমুনার সব ক'টি বামুন ও বামুনের ছা। গজ পন্ডার ব্যাটা মাধব পন্ডা মেট্যাল স্কুলে ক্লাস সিক্‌সে পড়ে। তার দলে রয়েছে তারই মাসতুতো ভাই যমুনার পচা নন্দ। গেল বারে প্রায় টাকা দুয়েকের জন্য প্রথম হতে পারে নি। কি করবে ওরা। শেষমেষ রাখী ফুরিয়াল যে! এবারে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছে এই জুটি। বাড়তি প্রস্তুতি হিসেবে দাদুর কাছে শিখে নিয়েছে পচা রাখী পরানোর মন্ত্রটা। 'দানে বদ্ধ বলি রাজা, দানকেন্দ্র মহাবল; তেনত্বাং প্রতিবধ্নামি, রক্ষে মা চল, মা চল।' মন্ত্র পড়ে রাখী বাঁধলে দক্ষিণাটা বেশি মেলে। একটা ভক্তিভাব উদয় হয় গেরস্থের মনে। চার লাইনের মন্ত্র, কিন্তু বেজায় খটো মটো। কিছুতেই মনে থাকছে না। এই বলছে, এই ভুলে যাচ্ছে। মহা মুশকিল। মাধব বলে, 'খবর্দার। মন্ত্র তার চাইতে নাই পড়বি, ক্ষতি নাই। কিন্তু বলতে বলতে ভুলিয়ালে গিরস্থ হাসিয়া গড়িয়াবে।'

পচা কান চুলকে বলে, 'কিন্তু মন্ত্রটা পড়তে পাল্লে ভালো হইতো রে! দক্ষিণাটা বেশি মিলতো নির্ঘাত।'

শ্যাম চক্রবর্তীর হাতে কোনও ভদ্দর-সজ্জন রাখী পরে না। সে ঘুরছে লোধা পাড়াগুলোতে। পুবে বীর-কাঁড় থেকে ডিহিপার, যমুনা, পারিজাত-পুর, খেজুরকুটি, হাতে সময় থাকলে রাংটিয়া অবধি চষে বেড়ায়।

মন্ত্র তন্ত্রের ধার ধারে না শ্যাম চক্রবর্তী। দুয়োরে ওঠে। ইনজেকশন দেবার ভঙ্গিতে টেনে ধরে হাত। বেঁধে দেয় রাখীর সুতো। হাত পাতে। দে, পইসা দে। কি কইলু? পইসা নাই? ধার রইল। সামনের হপ্তায় লিয়াবো। রাখী-বাঁধার পইসা, ছাড়াছাড়ি নাই। উঠোন পেরিয়েই দৌড়ুতে শুরু করে। অনেক ঘর ঘুরতে হবে তাকে।

'বামন-ঠাকুর মন্ত্র পড়্‌লে নি?' কেউ কেউ রগড় জোড়ে।

'মন্ত্র?' কপট রোষে গাল পাড়ে শ্যাম চক্রবর্তী, 'মন্ত্র শুনিয়া কি হবে তোদের? শালা, ক্যাঁকড়া খাবা জাত, মন্ত্র শুনলে মহাপাপ হবে।'

কেউ কেউ তাও কচলাতে চায়, 'না, না। মন্ত্র বলতে হবে। মন্ত্র নাইলে পইসা দিবো নি।'

'মন্ত্র শুনবি? ত' শুন্।' শ্যাম চক্রবর্তী ও কম যায় না রগড়ে। বলে, 'দানে বদ্ধ বলিরাজা, মাকে বলিয়া পইসা আন্ যা। মা কইলো, পইসা নাই : পয়সা নাই তো রাখীও নাই।' শুনলি তো মন্ত্র। দে, এবার। বিদায় কর্ জলদি। বহু ঘর বাকি।'

রাখী পরানোর ফাঁকে ফাঁকে লোক বুঝে আরো একটি গুপ্ত মন্ত্র শুনিয়ে যায় শ্যাম চক্রবর্তী।

'আজ রাতে, ভুঁড়্‌রবনির জঙ্গলে নিতাই মাস্টারের মিটিং। অবশ্যই যাবি।'

ডিহিপার গাঁয়ে গোক্ষুরের বাড়িতে এসেছিল শ্যাম।

রাখী পরাতে পরাতে বলেছিল, 'ভুঁড়ুর বনির জঙ্গলে আজ মিটিং ডেকেছে নিতাই মাস্টার। তোকে অবশ্যই যেতে বলেছে।'

সেই সংবাদে দুপুর পড়তির মুখে বেরিয়ে পড়েছে গোক্ষুর। মিটিং যদিও রাতের বেলায়, আগে ভাগে বেরিয়েছে অন্য কারণে। যমুনা পেরিয়ে ভুঁড়ুরবনির জঙ্গল। যাবার আগে পঞ্চমীর বাড়িতে একটু গল্প গুজব করে যাবে।

আপন মনে হাঁটছিল গোক্ষুর। পঞ্চমীর কথা ভাবছিল। লহরী দীঘিতে পদ্মফুল ফুটেছে অগাধ। সারা দীঘি যেন আলো হয়ে রয়েছে। গোক্ষুর জলে নামলো। অল্প জল থেকে তিন-চারটি পদ্ম তুলে উঠে এলো পাড়ে। আর তখনি সে দেখতে পেলো বাণেশ্বর ঘোষকে। বোধ করি যমুনার অঘোর দে'র বাড়িতে এসেছিল, মেয়েকে দেখতে।

বাণেশ্বর ঘোষ দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে গোক্ষুরকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে সে। দৃষ্টিখানি তাক করা গোক্ষুরের দিকে। এই পদ্ধতিতে টিকটিকি পোকা ধরে! নড়তে পারে না কীট-পতঙ্গ।

চার পাশটা নির্জন। কেমন গা ছুমছুম করে গোক্ষুরের। ইচ্ছে থাকলেও

পা'দুটো নাড়াতে পারে না।

সাপের মত থির পলকে তাকিয়ে ছিল বাণেশ্বর ঘোষ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'কি গো, গোক্ষুরবাবু, মোকে চিনতে পাচ্ছ? নাকি নাম-ধাম বলতে হবে?'

বাণেশ্বর ঘোষের টিটকিরি গায়ে না মাখবার চেষ্টা করে গোক্ষুর। বোকা বোকা মুখে হাসে।

বাণেশ্বর ঘোষ ফের বলতে থাকে, 'দেখা নাই, সাক্ষাৎ নাই, গোক্ষুরবাবু যে ডুম্বুরের ফুলটি! শালা সন্ন্যাস-টন্ন্যাস লিবি নাকি রে?'

'কি যে বল ঘোষদা!' গোক্ষুর লজ্জায় শরমে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

'তোর ভাব-গতিক দেখিয়া তাই তো মনে হয় রে।' রুষ্ট গলায় হিসহিস করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। পাঁচ-ছ'টি মাস, খালি ফিরকিয়া বেড়ালি। কত করিয়া কইলাম, সুদেব মিদ্যার ঘরটা নামা। এ কানে শুনিয়া, ও কান দিয়া বার করিয়া দিলি! মুখামুখি হইলে লুকিয়া পড়ু। ডাকিয়া পাঠিলে আইসু নি! সত্যি করিয়া ক'ত, কাজ-কাম কি সত্যি ছাড়িয়া দিলি তুই?'

গোক্ষুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুকনো গোছের এক চিলতে হাসি হেসে জবাব দেবার দায় এড়ায়!

'কয়লা, দুধে ধুইলেও, না যায় ময়লা। এ হইল শাস্ত্রের বচন।' বাণেশ্বর ঘোষ ঠোঁট ভেঙিয়ে বলে, 'তুই কি শাস্ত্র-পুরাণও উল্টিয়া দিবি নাকি রে?' বলতে বলতে অল্প ঘন হয়ে আসে বাণেশ্বর। বলে, 'তোর লৈতন মহাজনটি কেরে?'

'ছি, ছি। কি যে বল ঘোষদা।' দাঁত দিয়ে জিভ কাটে গোক্ষুর, 'তুমাকে ছাড়িয়া আবার লৈতন মহাজন?'

শুনে দু'চোখ কপালে উঠে যায় বাণেশ্বর ঘোষের। ভক্তির বহরটা কিঞ্চিৎ অধিক ঠেকছে। গোক্ষুর ভক্তার দিকে চোখ ছোট করে তাকায় বাণেশ্বর।

ফের শুধোয়, 'সত্যি করিয়া ক' দেখি, তোর লৈতন মহাজনটি কে?'

'লৈতন মাহাজন কোউ নাই ঘোষ দা। বিশ্বাস কর।' বিষণ্ন গলায় বলে গোক্ষুর।

বাণেশ্বর ঘোষ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গোক্ষুরের দিকে। কথাগুলো সত্যি বলছে কিনা পরখ করবার চেষ্টা করে।

বলে, 'তেবে তুই মোর পাশ আইসিস্ না ক্যানে? রাতে ভিতে কাজে-কামে যাচ্ছু নি তুই?'

'না ঘোষদা, সত্যি বলছি। একদিনের তরেও যাই নি।'

এ শালা বলে কি? পাঁচ-ছ'টা মাস, এক দিনও চুরি করতে বেরোয় নি?

'সত্যি সত্যি, শালা বৈরাগী-টৈরাগী হয়্যালু নাকি রে?'

বেদম লজ্জায় পড়ে গিয়ে গোক্ষুর ভক্তা অন্য অজুহাত খাড়া করে। বলে, 'মিটিং করিয়া পাহারা চালু কল্ল তুমরা। কি করিয়া কাজ-কাম

নামাই বল? তুমাদের দেখাদেখি চারপাশের গাঁ'গুলাতেও পাহারা চালু হইচে। সেদিন অঘোর দে'র ঘরে গিয়া ধরা পড়তে পড়তে বাঁচিয়া গেছি।'

'শালা, মেনিমুয়ার কথা শুন না!' বাণেশ্বর ঘোষের গলায় পুরোনো শ্লেষ্মার মত গাঢ় শ্লেষ, 'শালা, রাত-পাহারার ভয়ে কে কবে চুরি বন্ধ করিয়া দিছে রে, এ দুনিয়ায়? মনসার ভয়ে সাপের দল দেশান্তরী হইচে, শুনছু কুনোদিন অমন কথা?'

গোক্ষুরের ক্রমশ অসহ্য লাগছিল এসব কথাবার্তা। রোজ রোজ বাণেশ্বর ঘোষ ওকে ফাঁকায় খুঁজে বেড়াবে। দেখা হলেই খালি চুরি করবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। আর গোক্ষুর ভক্তা সারাক্ষণ বাণেশ্বরের নাগাল থেকে পালিয়ে বেড়াবে। এই ইঁদুর-বেড়াল খেলাটা আর মোটেই ভালো লাগছিল না গোক্ষুরের। সোজা কথাটা এবার সোজাসুজি বলে দেওয়াই ভালো। নিতাই মাস্টার সেই পরামর্শই দিয়েছে। গোক্ষুর বেশ স্পষ্ট গলায় বললো, 'চুরি-চামারি আর করবো নি ঘোষদা। মোকে তুমি ছাড়।'

'সতীর ব্যাটা!' বাণেশ্বর ঘোষ ফুঁসে ওঠে, 'তা, কে কয় তোকে চুরি করতে? চুরি করা মহা পাপ। একথা কে না জানে এ দুনিয়ায়? কিন্তু আমার কর্জের টাকাগলো শুধবি কবে? টাকাতো আমি আর একদিনও ফেলিয়া রাখতে পারবো নি। সুদে-আসলে প্রায় পাঁচশো টাকা পারিয়া গেছে।'

গোক্ষুর স্পষ্টতই বিপন্ন বোধ করে। এই মুহূর্তে পাঁচশো টাকাতো, দূরের কথা, পাঁচটি টাকাও নেই ওর কাছে। কাঞ্চন বুড়ির ঘর চুরির বাবদ যে ক'টা টাকা মিলেছিল, বউটা মরে যাবার ফলে তা আর হাসপাতালের খরচে লাগে নি। ঐ দিয়ে কিছুদিন চলেছিল। ধান-কাটার মরসুমেও দিনকতক মজুর খেটেছিল এর-ওর ক্ষেতে। ছোট-খাটো দু'একটা চুরি করে হাঁস-মুরগী, ছাগল, ধান-চাল মিলেছিল যৎকিঞ্চিৎ। এখন হাত তার প্রায় ফাঁকা। কি করে কর্জের টাকা শুধবে সে?

বাণেশ্বর ঘোষ ওর অবস্থাটা বুঝতে পারে পুরোপুরি। মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, 'উঁহু, উটি হবে নি। তুমি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হইতে চাও, হও। কেউ মানা কচ্ছে নি। কিন্তু মোর টাকাটি এবার শুধতে হবে। বলু, কবে মোর টাকা দিবি?'

গোক্ষুর ভক্তার অবস্থা তখন, যেন ফাঁসে পড়া মুষাটি। যতই ঢিলে করতে চাইছে, ফাঁস তত এঁটে যাচ্ছে গলায়। তাই দেখে মনে মনে উল্লাসে ফেটে পড়ে বাণেশ্বর ঘোষ।

বলে, 'আরো শুনিয়া রাখ্, তোর ভিটাটা যে বন্ধকী-দলিল করা আছে মোর নামে, সাত দিনের মধ্যে কর্জের টাকা সুদ সহ না মিটালে, ঐ ভিটার দখল লিবো মুই। তোর কুনো বাপ ঠেকিয়া রাখতে পারবে নি।'

নামের ঝুলির মধ্যে ক্রমাগত আঙুল নাচাতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। গোক্ষুর পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় বাণেশ্বর ঘোষ। দু পা এগিয়েই পিছু ফিরে বলে,

'আর একটা কথা। বড়বাবু তোকে থানায় দেখা কত্তে কইছে। জলদি যাবি।'

বাণেশ্বর ঘোষ চলে যাবার জো করতেই পিছু ডাকে গোক্ষুর।

বলে, 'তুমি ত' খালি ধমক-ধামকই দিলে। একটা দরকারী কথা কইবার ছিল, তার ফুরসুতটাই দিলে নি।'

ভ্রূ-কুঁচকে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ।

'কি কথা?'

অল্প ঘন হয়ে আসে গোক্ষুর।

চাপা গলায় বলে, 'কাল নিতাই মাস্টারকে দেখছি মুই।'

'এ্যাঁ! বাণেশ্বর ঘোষ তাজ্জব বনে যায়, 'কুথায়?'

'মকরাম পুরের হাটে। মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া হাটের মধ্যে ঘুরছে! সাথে মাগুরিয়ার ক'জনা লোক।'

মকরামপুর বহুৎ দূর। নারানগড় থেকে খড়্গপুর লাইনে পাঁচ-ছ মাইল। মাগুরিয়া আবার মকরামপুর থেকে সাত-আট মাইল পুবে। সেই কোতাইগড় পেরিয়ে।

শুনে দু চোখ চক চক করে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষের। বলে, 'তুই মকরাম-পুর হাটে গেছলি?'

'ঠিক হাটে নয়, মকরামপুরে মোর মামুর দোর। জানই ত। গেছলাম ওই খানে। ফিরতি পথে হাটের মধ্যে ঢুকলাম টুকে।' গোক্ষুর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে গেল কথাগুলো।

শুনতে শুনতে দু চোখ কুটিল হয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষের। সহসা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

বলে, 'আচ্ছা, তুই যা। বড়বাবুর সাথে ভেট করবি কিন্তু। বেজায় ক্ষেপিয়া আছেন্ তিনি।'

চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নাবলো। বাণেশ্বর ঘোষ হাতের ছাতাখানি খুলে বাগিয়ে ধরলো সপাটে। রওনা দিল বাড়ির দিকে।

গোক্ষুর দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো পুরোনো বট গাছটার তলায়! বৃষ্টি একটুখানি না থামলে রওনা দেবার উপায় নেই।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দু পায়ে ধুপ ধাপ আওয়াজ তুলে গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো একজন।

গোক্ষুর মুখ ফিরিয়ে চিনতে পারলো। মতিয়া হাড়ির বউ। সারা শরীর ভিজে গেছে তার। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা ছোট একটি পুঁটলি। আটা জাতীয় কিছু হবে।

এককালে শরীর-স্বাস্থ্য ভালোই ছিল মতিয়ার বউয়ের। হাড়ি ঘরের মেয়ে হলে কি হবে, গায়ের রঙটি ছিল ফর্সা। কপালে উল্কি। চিবুকেও। বেশ নেশা জাগানো ব্যাপার-স্যাপার। গোক্ষুর লক্ষ্য করলো মেয়েটা শুকিয়ে গেছে একেবারেই। ঢিলে ঢালা হয়ে পড়েছে শরীরের বাঁধন। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। গায়ের ত্বক বিবর্ণ। গালে পুরু ছাতা পড়েছে।

বড্ড শুকনো লাগছে মেয়েটিকে। গোক্ষুর বোঝে, বংশী ভঞ্জর জন্যই আজ মেয়েটার এই পরিণতি। মতিয়া হাড়ির পুরো সংসারটা ভেসে গেছে ওই শালার তরে। চোর-বৃত্তি গোক্ষুরের। ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার কিছু অজানা নেই তার।

বেশ ছিল মতিয়া হাড়ি। ঢাক-টাক বাজাতো, পুজো-পার্বণে। পালকি-টালকি বইতো বিয়ে-সাদিতে। অবসর সময়ে খাটা-বাটা করে কোনও গতিকে চালিয়ে নিত সংসার। গাঁয়ের গরু-বাছুর মরলে, খবর পাওয়া মাত্র ছুটে যেত ভাগাড়ে। ছালটা ছাড়িয়ে নিত! মাংসও নিতো খানিকটা। গরীব সংসারে ভোজ জমে যেতো বহুদিন বাদ-বাদ। চামড়া বেচে দিতো নারান-গড়ের ব্যাপারীকে। বেশ ছিল। বংশীই একদিন তাকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে নিয়োগ করলো বাঁকা কাজে।

ধান কাটার মরশুম শেষ হলেই গাঁ-ঘরের গরু-ছাড়ের ঢ্যাঁড়া পড়ে। আগামী রোববার থিক্যা গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী, ছেলি, সব কিছো ছাড়্—। গিরস্থ সাবধা—ন। ব্যস, গাঁ-ঘরের পশু-পাখি অবাধে চরে বেড়াবে ক্ষেতে-বিলে, যদ্দিন না বর্ষা নামে। ক্ষেতে জল জমে যদ্দিন না ভেসে ওঠে গোবর সারের বড় বড় ঢেলাগুলি। ঐ ছাড়ের মরসুমেই বংশী ভঞ্জ মতিয়াকে দিল এক সর্বনাশা বুদ্ধি। ঐ বুদ্ধির বশে মতিয়া জোগাড় করলো গরু মারা বিষ। ঘাস পাতার মধ্যে পুরে খাইয়ে দেয় গরুকে, ফাঁকা মাঠে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

চরে বুলে ফিরে যায় গরু, ঘরে। রাতের মধ্যে মরে যায়। মতিয়া হাড়ি থাকে তক্কে তক্কে। ভাগাড়ে ফেলা মাত্রই সে ছুরি আর বস্তা নিয়ে হাজির। এমন হলো, দিনে তিন-চারটে গরু মরতে লাগলো এক এক পাড়ায়। সংখ্যাটা বাড়তে লাগলো ক্রমশ। মতিয়া হাড়ির পুলক আর ধরে না। দিনে আট-দশটি গরুর চামড়া বিক্রি করে সে। বংশীকে কমিশন দিয়েও তার পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে রোজ। দেখতে দেখতে সংসারটার হাল ফিরে গেল। বউটা খেয়ে দেয়ে ফর্সা হলো আরো। বাচ্চাগুলোর শরীরে এলো ছিরি ছাঁদ।

গাঁয়ের মানুষের মনে দারুণ খটকা। গাঢ় সন্দেহ। প্রতিদিন এতগুলো গরুর স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না। কি ঘটছে অন্তরালে? কে ঘটাচ্ছে এ সব? সব গরু কেন মুখে গ্যাঁজলা তুলে মরে?

ন্যাকা-সুধীর দিল এক লাখ-টাকা মূল্যের খবর। এত যে গরু মরছে, রোজ যে এত এত গরুর ছাল ছাড়াচ্ছে মতিয়া হাড়ি, এক টুকরো মাংস কিন্তু মুখে তোলে না। অথচ আগে একটা গরু মরলে, মতিয়া হাড়ির ঘরের থেকে ভেসে আসা গোমাংসের গন্ধে নিজেদের পাড়ায় থাকা দায় হতো ভদ্দর-সজ্জনদের।

তক্কে তক্কে থাকে গাঁয়ের লোক। এবং একদিন বিষ খাওয়ানোর কালে হাতে-নাতে ধরা পড়ে মতিয়া হাড়ি। মাড়োতলার পাশের নিমগাছে টাঙিয়ে তাকে অমানুষিকভাবে পেটানো হয়। তার সারা গায়ে জল-বিছুটি দেওয়া

হয়। বুকে চাপানো হয় আগুন ভরা মাটির মালসা। ত্রাহি-ত্রাহি রব তোলে মতিয়া। অবশেষে কবুল করে সব কিছু। বংশী ভঞ্জর নামও বলে দেয়।

বেগতিক বুঝে বংশী পালিয়ে যায় গাঁ-ছেড়ে। সোজা গিয়ে হাজির হয় থানায়। বড় বাবুর একান্ত পেয়ারের লোক সে। তাঁরই পরামর্শে দিন-দশ-পনের লুকিয়ে থাকে অন্যত্র। মতিয়া হাড়ি তদ্দিনে তিন-চার দিন থানা হাজতে কাটিয়ে চলে গেছে জেল-হাজতে। জামিন পায় নি কিছুতেই।

দিন-পনের বিশ বাদে, বড়বাবুর একখানি চিঠি নিয়ে গভীর রাতে বাণেশ্বর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বংশী ভঞ্জ। বড়বাবু অনুরোধ জানিয়েছেন, বংশীর ওপর গাঁয়ে যেন কোনও জুলুম না হয়। কারণ সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। মতিয়া হাড়ি মারের চোটে দিক-জ্ঞান হারিয়ে আগডুম বাগডুম বলেছিল বংশীর নামে। থানা হাজতে সে স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেছে যে, বংশী ভঞ্জর সঙ্গে এ ঘটনার কোনও যোগ নেই। চিঠিখানা ধরিয়ে দিয়ে বংশী ভঞ্জ বাণেশ্বর ঘোষের পা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদে। শেষে একশো টাকার দু'খানি নোট তার পায়ের তলায় রেখে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করবার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর।

বংশী ভঞ্জ বেঁচে গেছে সে যাত্রা। গাঁয়ের লোকের রোষ থেকে সে যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বাণেশ্বর ঘোষ। আর, সুযোগটি বুঝে, বংশী ভঞ্জ-নামের গভীর পাঁকের রুইমাছটি পাঁক ঠেলে ঠেলে এগিয়েছে মতিয়া হাড়ির সংসারের দিকে। মতিয়া সদরে হাজতে পচছে। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দিনে একবেলা অন্ন জোটে না বউয়ের। চোখের জলে ভেসে যায় বুক। দেখে ভারি মায়া জাগে বংশী ভঞ্জর মনে। আহা রে, যৌবতী মায়া-মানুষ, অবলা জাত, তার কি দোষ? যার দোষ, সে তো হাজতে পচছে। বংশী ভঞ্জ এগিয়ে আসে। চাল-ডাল, নুন-তেল কিনে দেয়। হাল-হদিশ নেয় রোজ সন্ধ্যেবেলা, কাজ কর্ম সেরে ঘরে ফেরার পর। এই সন্ধ্যেবেলাটা ধীরে ধীরে রাত্রিবেলা এবং শেষ মেষ রাত্রিবাসে পরিণত হয়।

মাস দুই বাদে হাজত থেকে ঘরে ফেরে মতিয়া। বিগত দু'মাসের নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক পীড়নে মাথাটাই কেমন বিগড়ে গেছে তার। ভালো করে খায়-দায় না। কথাবার্তা বলে না। সারাক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে আর আকাশ-পাতাল ভাবে। বংশী সেই ফাঁকে তিল তিল করে দখল নিয়ে ফেলে মতিয়ার বৌয়ের। সন্ধ্যেটি হ'লে হাজির হয় মতিয়া হাড়ির দোরে। মতিয়ার শরীরের খোঁজ খবর নেয় প্রথমে। সংসারের খরচ পত্র বাবদ দেয় দু'চার টাকা। তারপর মতিয়ার বউয়ের শরীর খানির মধ্যে ডুব মারে। মতিয়া তাকিয়েও দেখে না এসব। সে সারাক্ষণ কি এক গূঢ় চিন্তায় বিভোর। হাগতে গিয়ে বসে থাকে ঠায়। খেতে বসে শুধু ভাত খেয়ে ফেলে। তরকারির কথাটা খেয়াল থাকে না। মাসে মাসে কোর্টের দিন পড়লে বংশীই তাকে নিয়ে যায় খচ্চাপাতি করে।

এইভাবেই চলছিল। ধীরে ধীরে নেশাটা পাতলা হল বংশী ভঞ্জর।

নিশি কামারের বউ মালতীর দিকে চললো মন। ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেল মতিয়ার বউ। এখন মালতীই বংশীর জান-প্রাণ আগলে বসে আছে!

গোক্ষুর ভক্তার কিছুই অজানা নেই। এ দুনিয়ায় রাতের বেলার কোনও কিসিমের কাজ কারবারই তার নজর এড়াতে পারে না।

গোক্ষুর তাকায় মতিয়ার বউয়ের পানে। একটা নীল রঙের সস্তা তাঁতের শাড়ি পড়েছে মেয়েটা। পাতলা, জালি-জালি। শাড়ির আঁচল বেয়ে সপ-সপিয়ে জল ঝরছে।

আঁচলে বাঁধা পুঁটলি খানা প্রাণপণে বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল মতিয়ার বউ। বৃষ্টিটা অল্প থামতেই সে দৌড় মারে ঘরের দিকে। পেছন থেকে ওকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে গোক্ষুর ভক্তা। এক সময় সেও রওনা দেয় ভুঁড়ুরবনির জঙ্গলের দিকে।

।। পনের ।।

কাল সন্ধ্যেবেলায় বাণেশ্বরের বাড়িতে এসেছে গীতালী। জ্যাঠার সঙ্গে একটা এস্পার-ওস্পার হওয়া দরকার। যতবারই কথাটা তুলছে, ততবারই এটা-ওটা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে বাণেশ্বর। কাল রাতে শুয়ে শুয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে গীতালী। সকাল হলেই কথাটা পাড়বে।

কালীপুজো আসছে। বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে ঘটা করে কালীপুজো হয়। পাঁঠা বলি হয় অনেক। অনেক বাবু-ভায়া পাত পাড়েন শেষ রাতে। থানার বড়বাবুও আসেন। বারান্দায় বসে বসে পুজোর একখানা ফর্দ বানাচ্ছিল বাণেশ্বর। গীতালী দেখলো, বাণেশ্বরের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাও গীতালীকে দেখে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে।

'কি রে মা, রাতে ঘুম-টুম হইচে ত?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় গীতালী।

'এ তো শহর জায়গা নয়। এ হইল গিয়া, গণ্ডগ্রাম।' বাণেশ্বর বলে।

'জ্যাঠা, একটা কথা বলতে চাই তোমায়!'

গীতালীর গলার স্বরটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে বাণেশ্বরের কানে। ঘাড় ঘুরিয়ে গীতালীর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে।

গীতালী বলে, 'আমার জমিনগুলোর দখল চাই এবার। একটা এসপার-ওসপার করতে চাই আজই। বার বার আসছি, ফিরে যাচ্ছি। তুমি কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছ।'

বাণেশ্বর তাকায় আকাশের দিকে। আকাশে ছানা কাটা মেঘ। অনেক উঁচুতে গোটা কয় চিল। মাছির মত লাগে।

'এসপার-ওসপার?' বাণেশ্বর ঘোষ শব্দদুটোকে মুখের মধ্যে নাচায়। বার

কয়েক। কপালের রেখায় সূক্ষ্ম ভাঙচুর হয়। বলে, 'কি এসপার-ওসপার করবি ?'

'আমার জমিন, আমাকে দিয়ে দাও তুমি। ফুরিয়ে গেল কথা। ঝগড়া-ঝাঁটিতে কাজ কি ?' বেশ তেতো গলায় কথাগুলো বলে গীতালী।

'ফুরিয়ে গেল কথা ?' বাণেশ্বরের গলায় তীব্র ব্যঙ্গ, 'অত সহজে কথা কি ফুরিয়া যায় রে, মা ? তুই সকালে খাবা-দাবা কিছো কচ্ছু ?'

'না।' গোমড়া মুখে জবাব দেয় গীতালী।

'সকালে উঠিয়া বাসি মুহে জ্যাঠার সাথে ঝগড়া কত্তে চলিয়া আসসু!' বাণেশ্বর ঘোষের কপালের শিরা ফুলে ওঠে, 'যা, খাবা-দাবা কর্। উসব কথা পরে হবে।'

ডিবা খুলে একটা পান মুখে পোরে বাণেশ্বর।

'না। খাবনি আমি। যে কাজে এসেছি, সে কাজ শেষ হোক আগে। খাওয়া-দাওয়ার কথা পরে।' চোখে মুখে গোঁয়াতুর্মী ফুটে ওঠে গীতালীর।

গীতালীর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় বাণেশ্বর ঘোষ। ঐটুকু পুঁচকে মেয়ে, তার মুখের ওপর এমন করে কথা বলতে পারে, তা যেন বিশ্বাসের অতীত ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে বাণেশ্বর। মুখের তাবত রেখা কঠিন হয়ে যায়। চাপা গলায় বলে, 'বেশ। তেবে শুনিয়া লে। জমিন লিবার তরে ত' জিদ ধচ্ছু খোব। তুই যে ঐ জমিনের মালিক সেটা প্রমাণ কত্তে হবে নি ?'

'মানে ?' তাজ্জব হয়ে যায় গীতালী 'জমিগুলো আমার বাবার। বাবা খুন হয়েছেন, মা মারা গেছেন। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান—।'

'এ্যাই। একমাত্র সন্তান—।' নিজের উরুর ওপর চাপ্পড় মারে বাণেশ্বর ঘোষ, 'কিন্তু প্রমাণ কি তার ?'

'প্রমাণ ?' গীতালী যেন বাণেশ্বরের কথার মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারে না।

'হ্যাঁ, প্রমাণ।' চোখ নাচায় বাণেশ্বর, 'তুই যে রামেশ্বরের ঝি, তার প্রমাণ কি রে ?' নিতান্ত তাচ্ছিল্য সহকারে শেষের কথাগুলি বলে বাণেশ্বর।

গীতালী ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাণেশ্বরের দিকে। বাণেশ্বরের কথাগুলো যেন ঠিক ঠিক মাথায় ঢোকে না। বলে, 'আমি যে রামেশ্বর ঘোষের মেয়ে, সেটা আমাকে প্রমাণ কত্তে হবে ?'

'আলবত হবে।' আবার উরুতে চাপড় মারে বাণেশ্বর ঘোষ। পচাং করে পিক ফেলে বাইরে।

'চিরটা কাল যাকে বাপ বলে ডাকলাম, আজ প্রমাণ করতে হবে সে আমার বাপ কিনা ?' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় গীতালী।

'ডাকলেই বাপ্ হয়্যাবে ? অমন কত লোকই কত লোককে বাপ বলিয়া ডাকে।' বাণেশ্বর ঘোষ ঝানু উকিলের মত সওয়াল শুরু করে, 'বিশেষ করিয়া সে বাপের যদি একগাদা জমিন-জায়গা থাকে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ।

তারপর বলে, 'তুই তো মোকে জ্যাঠা বলিয়া ডাকু। তা বলিয়া মুই কি সত্যি সত্যি তোর জ্যাঠা।' গলাটা অকস্মাৎ খাদে নামায় বাণেশ্বর। 'সত্যিকারের জ্যাঠা ভাবলে সামান্য ক'বিঘা জমিনের তরে তুই অমন করিয়া কথা কউ মোর সাথে? আজ এক যুগ ধরিয়া চোখের মণির মতন আগুলিয়া রাখছি ওগুলোকে। তখন কুথা ছিলি? দু' দু'টা যুক্তফ্রণ্টের সময়ে কত ঝড়-ঝাপটা সামাল দিয়া রক্ষা কচ্ছি অই জমিনগুলা। তখন ছিলি কুথা? আজ দাদা মরিয়া যাবার পর ভাইঝি সাজিয়া হাজির হয়্যালু জমিন দখল করতে!'

উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরায়।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে গীতালী। মুখ দিয়ে কথা সরে না। বাণেশ্বর ঘন ঘন টান দিতে থাকে বিড়িতে।

খানিক বাদে গীতালী বলে, 'তাইলে আমার জমিন তুমি ফেরত দিবে নি?'

'এক কথা কতবার কইবো?' বাণেশ্বর ঘোষ রুষ্ট গলায় বলে, 'তুই যে রামেশ্বরের ঝি, সেটা প্রমাণ কর্ আগে।'

'দুনিয়া শুদ্ধ লোক জানে তা।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে গীতালী।

'দুনিয়া শুদ্ধ লোক মানে তো, তোর মামার গুষ্টি?' শ্লেষ ঝরে পড়ে বাণেশ্বরের গলা থেকে, 'কিন্তু এ গাঁয়ের লোক অন্য সন্দেহ করে।'

'কি সন্দেহ করে? খুলে বল।' গীতালী যেন একটা মরণ-খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিলগুলো উঠে গিয়েছে আরো উঁচুতে। এখন তারা এক-একটি কালো বিন্দু। প্রত্যেকটি বিন্দু এককভাবে নিঃসঙ্গ।

'খুলিয়া কইতে পারি। তাতে কষ্ট পাবি তুই।' পোড়া বিড়িখানা মাটিতে ঘসে নিভিয়ে ফেলে বাণেশ্বর। বলে, 'রামেশ্বর ব্যা হবার পর পরই ক্যানে মিলিটারীতে চলিয়াল? তোর মা-ই বা ক্যানে শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া সারাটা জীবন বাপের দোরে রইল? সাত-সমুদ্র থিকে রামেশ্বর এক যুগ বাদে ফিরিয়া আইল দেশে। কিন্তু নিজের বৌ আর নিজের ঔরসজাত সন্তানকে রইতে দিলো নি ক্যানে ঘরে? বার বার ক্যানে প্রত্যাখ্যান কল্ল অদের? কি রহস্য আছে এর মধ্যে?' মিটি মিটি হাসছিল বাণেশ্বর ঘোষ। বললো, 'তারপর ধর্, তোর মামারা অর স্বামীকে খুন করা সত্ত্বেও তোর মা ক্যানে টুঁ শব্দটি কল্ল নি? এসব প্রশ্ন লোকের মনে জাগে বই কি!'

'তুমি আমার মায়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলছো?' থর থর করে কাঁপছিল গীতালী। দু'চোখে সীমাহীন রোষ। অসহায় রোষ।

'মুই কি একলাই বলছি রে মা? দুনিয়াশুদ্ধ লোক বলছে। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যম্, দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। কে বলতে পারে, কার মনে কি আছে?' জপের থলিখানি টেনে নেয় বাণেশ্বর। কিছুক্ষণ চুপ করে মালা নাচায়। তারপর বলে, 'তুই যে অত রামেশ্বরের ঝি বলিয়া গলা ফাটাচ্ছু, অর রক্ত তোর শরীরে রইলে, অর খুনটাকে এভাবে মানিয়া লউ তুই?

যারা অমন পৈশাচিক ভাবে খুন কল্ল তোর বাপকে, তাদের ঘরে একদণ্ড রইতে পারু ? তাদের অন্ন-জল মুহে তুলতে রুচি হয় তোর ?'

'মামারা খুন করে নি বাবাকে।' সহসা ফুঁসে ওঠে গীতালী।

গীতালীকে এক ঝলক দেখলো বাণেশ্বর। জপের থলি ঠিক করে নামিয়ে রাখলো। বললো, 'তবে কে খুন কল্ল ? বিলাত থিকে লোক আইল ? নাকি মুই খুন কচ্ছি মা'র পেটের ভাইকে ?' বাণেশ্বরের চোখে-মুখে উথলে ওঠে রোষ।

'কে খুন করেছে জানি না। তবে মামারা এ ব্যাপারে নির্দোষ।' খুব স্পষ্ট গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলো গীতালী।

'হুঁহু' বাণেশ্বর ঘোষ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, 'দোষী না নির্দোষী. কোর্টে'ই তার ফায়সালা হবে। দু'দিন সবুর ধর। স্বচক্ষে দেখছে যারা. তারা সাক্ষী দিবার তরে হাত ধুইয়া বুসিয়া আছে।'

ফের মালা জপতে শুরু করে বাণেশ্বর ঘোষ। ঠোঁট জোড়া নড়তে থাকে নিঃশব্দে। গীতালী চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সহসা কেমন একলাটি লাগে নিজেকে। কেমন, অসহায়।

'ডিহিপারের শীতলা বুড়ির নামে দু'বিঘা জমি দিবো। বলে দিয়েছি ওদের।' বেশ খানিকক্ষণ বাদে মুখ খোলে গীতালী।

থলির মধ্যে আঙুল নাচানো থেমে যায়। বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'আগে আইনত মালিক হ'। তারপর দান-ধ্যান করবি, না কইবো নি। তার আগে নয়।'

এত বেলায়ও শিউলি ফুল ঝরছে। এইমাত্র একটা ঝরে পড়লো গাছের তলায়। গীতালী নির্নিমেষ দেখলো ফুলটাকে।

সহসা বুক জুড়ে কান্না এলো। আঁচলে মুখ চেপে এক দৌড়ে অন্দর মহলে চলে এলো সে।

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যেতে চাইছিল গীতালী। আর এক মুহূর্ত বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে থাকবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না তার। কেঁদে-কেটে জামা-কাপড় গুছিয়ে যখন তৈরী, পথ আটকালো বিষ্ণুপ্রিয়া।

'ছিঃ মা, এই অত বেলায় কোউ যায় ? সকালে থিকে কিছো খাউ নি।' হাঁফাচ্ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

কান্নায় ভেঙে পড়লো গীতালী। তাকে বেজন্মা বলেছে তার নিজের জ্যাঠা। বলে কিনা, ওর মা ছিল চরিত্রহীন ! ঐ দুঃখেই নাকি বাবা চলে গিয়েছিল মিলিটারীতে ! মা নাকি অন্য মধুর লোভে বাপের ঘরে গিয়ে বসবাস করতো !

গীতালীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বিষ্ণুপ্রিয়া, 'তার কথায় কিছো মনে করিস নি মা। তার মাথার ঠিক নাই। কিছুদিন ধরিয়া লেবার-বয়কট গেল। কাদো করা জমিন আঁটিয়ালো। ব্যাহেন-চারা শুকিয়া গেল। সে

মিটলো। ফের বাছার টাইমে লেবার বয়কট। আবার গতকাল ন্যাকা-সুধীর খবর লিয়া আসছে, এবারে ধান কাটায় নাকি জোর বয়কট হবে। দশ টাকা আর এক সের চাউল না লিয়া ছাড়বে নি অরা। মেজাজটা ভালো নাই তোর জেঠার। কাল থিকে একে উকে কথায় কথায় খিচাচ্ছে।'

শিউলি থালিখানা কেড়ে নেয় গীতালীর হাত থেকে। বলে, 'মুড়ি বাড়িয়া রাখছি ঠাকুর-ঝি, খাবে চল।'

রাজুকে গীতালীর বুকের ওপর ফেলে দিয়ে দ্রুত-পায়ে রান্নাঘরে চলে গেল শিউলি। গীতালী ওকে চেপে ধরে বুকে। বার কয়েক চুমু খায় ওর ঠোঁটে গালে। বংশের একমাত্র পুত্র-সন্তান। গীতালী ওর একমাত্র পিসি।

রাজু কিন্তু এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে গলা ফাটিয়ে। প্রবল বেগে হাত-পা ছুঁড়ছে। কান ঝালা-পালা!

বিষ্ণুপ্রিয়া এগিয়ে এসে টেনে নেয় নিজের কোলে। হরেক শব্দ তুলে ভোলায়। কান্নাটা অল্প থামে। তাই দেখে সহসা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে গীতালী। চাপা গলায় উচ্চারণ করে, 'তুই ও আমায় পর ভাবিস রে?'

পুকুর ঘাটে দুপুর বেলায় চান করছে দু'জনে। শিউলির মুখ থমথমে। অল্প তফতে খিড়কির বারান্দায় বসে কুলোয় করে চাল বাছছে বিষ্ণুপ্রিয়া। গীতালী জানে, চাল বাছবার অছিলায় ছেলের বৌকে পাহারা দিচ্ছে। বার কতক এদের বাড়ীতে থেকে গীতালীর সন্দেহ হয়, কিছু একটা রহস্য আছে এদের। কিছু কথা আছে, যা গীতালীর কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। এ ব্যাপারে শিউলিকে এরা একদম বিশ্বাস করে না। সেই কারণেই, ওকে গীতালীর সঙ্গে একদণ্ড একলাটি রাখে না। কেউ না কেউ নানান ছলে পাহারা দেয়।

পুকুরের জলখানি বড় স্থির আজ। মাঝপুকুরে কয়েকটা হাঁস। ডুবে ডুবে গুগলি তুলে খাচ্ছে।

গা ঘসতে ঘসতে চাপা গলায় শিউলি বলে, 'তুমি কি আজও ইস্কুল-হোস্টেলে যাবে ঠাকুর-ঝি?'

'কেন?' চকিতে শিউলির দিকে মুখ ফেরায় গীতালী, 'যেতেও পারি।'

চুপ করে থাকে শিউলি। আড়চোখে তাকায় শাশুড়ীর দিকে।

বলে, 'আজ না গেলেই পারতে।'

গীতালী জানে, প্রণবদাকে এ বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে, গীতালী ওর কাছে আনা গোনা শুরু করবার পর, প্রণব হয়েছে এদের চোখের বালি। এর আগের বারে হোস্টেল থেকে ফেরার পর বাণেশ্বর ঘোষ গীতালীকে মিষ্টি করে কথা শুনিয়েছিল ঐ নিয়ে। গীতালী ফুঁসে উঠতেই কথা পালটে ফেলেছিল তাড়িঘাড়ি।

বলেছিল, 'তোর ভালোর জন্যই বলি মা। এসব গাঁয়ে-ঘরে, চারপাশে অশিক্ষিত মানুষের বাস। সোমত্ত মেয়া তুই, একলাটি ফাঁকা হোস্টেলে, একটা

জোয়ান ছোকরার ঘরে— । পাঁচ জনায় পাঁচ কথা কইতে পারে । এই জন্যেই বলা । ছেইলা-পিলা লিয়া বাস কত্তে হয় মোকে— ।'

গীতালী আর কথা বাড়ায় নি ।

আজ, শিউলির কথা শুনে কেমন জেদ বেড়ে গেল গীতালীর । সকাল থেকে মাথাটা জ্বলছে । ঠাণ্ডা জলে বার বার ডুব দিয়েও ঠাণ্ডা হচ্ছে না ।

গীতালী বললো, 'যাবো বৈ কি । নিশ্চয়ই যাবো ।'

খিড়কি পুকুরের চারপাশে গাছ-গাছাল । আম-জামের বাগান । গাছের ছায়া পড়ে সর্বদাই জলের রঙ ঝিম কালো । বর্ষাকালে আকাশে মেঘ সাজলে কালো রঙ ঘোর হয়ে ওঠে । আজ পুকুরের জলে মেঘের ছায়া পড়েছে ।

ভুষো কালির মত জলের রঙ । হাঁসগুলো এতক্ষণ মাঝ পুকুরে ডুব মারছিল । এখন ঘাটের কাছাকাছি চরছে । হাঁসগুলোর দিকে কেমন অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে শিউলি । ঠোঁট জোড়া কেমন কাঁপতে থাকে তার । শাশুড়ীর ভয়ে কিংবা অন্য কোনও কারণে, আর কথা বাড়ায় না । ভিজে কাপড়ে চলে যায় ভেতর উঠোনে ।

বিকেলে একেবারে তৈরী হয়ে নিয়েই বাণেশ্বরের ঘব ছাড়লো গীতালী । আজই বেলদায় ফিরে যাবে সে । যাবার আগে প্রণবদার সাথে একটিবার দেখা করে যেতে চায় । আজ সকালের কথাগুলো ওকে বলা দরকার । ওর পরামর্শ মতো পরবর্তী ধাপ এগোতে চায় সে ।

স্কুল হোস্টেল যথারীতি ফাঁকা । ছাত্ররা যে যার মত খেলছে, বেড়াচ্ছে । গীতালী সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল ।

প্রণব বিছানায় শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিল । গীতালীকে দেখে উঠে বসলো ।

হেসে বললো, 'কি ব্যাপার, আজ খুব গম্ভীর লাগছে ?'

শুকনো মুখে বিছানার ধার ঘেঁসে বসলো গীতালী । ধীরে ধীরে খুলে বললো সকালের কথা, আদ্যপ্রান্ত ।

শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল প্রণব । একটু বাদে বললো, 'বাণেশ্বর ঘোষ নোংরা লোক' তা জানি । কিন্তু অতখানি নোংরা, তা আমার জানা ছিল না ।'

গীতালী কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'এখন আমি কি করবো ?'

প্রণব বসে বসে ভাবতে থাকে ।

বলে, 'খুব সহজে তোমার জমি-জায়গা ফিরিয়ে দেবে না ও । সম্ভবত তোমাকে মামলায় যেতে হবে ।'

গীতালী ভাবনায় পড়ে যায় ।

বলে, 'মামলা করলে তো এইসব প্রসঙ্গ তুলবে জ্যাঠা । প্রকাশ্য কোর্টে মা'র চরিত্র আর আমার জন্ম-ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি চলবে । সে ভারি লজ্জার হবে ।'

'বাণেশ্বর ঘোষ সেটা পারে। নোংরামীতে তার জুড়ি পাওয়া দায়।' প্রণবের চোখে মুখে গভীর ভাবনার ছাপ, 'তার চেয়ে এক কাজ কর। ছেড়ে দাও এই অভিশপ্ত জমি। লেখাপড়া শিখেছ, চেষ্টা চরিত্র করে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিলে, কি হবে তোমার এসব জমি জায়গা?'

গীতালী চুপটি করে ভাবে।

'দ্যাখো, জমি-জায়গার জন্য আমি মোটেই লালায়িত নই।' গীতালী শক্ত গলায় বলে, 'দরকার হলে আমি বিলিয়ে দেবো সমস্ত সম্পত্তি। কিন্তু কেবল গা-জোরী করে, আর মায়ের নামে বদনাম দিয়ে ও আমার সবকিছু কেড়ে নেবে, এটাই আমার অসহ্য লাগছে।'

উঠে দাঁড়ায় গীতালী।

বলে, 'আমি আজ ফিরে যাচ্ছি। একটু ভেবো ব্যাপারটা নিয়ে। বড় মামার শালা সদর কোর্টের উকিল। তার সঙ্গেও পরামর্শ করি। তারপর, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।'

সহসা দরজার মুখে একাধিক পায়ের আওয়াজ। প্রণব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

দরজায় শেকল তুলে দিয়েই তারস্বরে চেঁচাতে থাকে গনেশ মিদ্যার দল। 'কে আছো, দ্যাখো, দেখিয়া যাও, ইস্কুল হোস্টেলের মধ্যে কি সব চলছে।'

ওদের চিৎকারে সুভাষ ক্লাবের ছেলেরা ছুটে আসে। ছুটে আসে ইস্কুলের ছেলেরা। পাশাপাশি দোকানের খদ্দেররাও ছুটে আসে।

গণেশ মিদ্যার দল তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, 'ইস্কুলটাকে কেলি-কুঞ্জ বানিয়া ছাড়ছে এরা। সন্ধ্যাবেলা, কোউ কুথাও নাই, এদিকে এক বিছানায় জড়াজড়ি করিয়া—কম্মো সারা হচ্ছে। ডাক গাঁ'র লোকজনকে। দেখুক সবাই। এটা কি ইস্কুল, না কি বেশ্যাখানা?

খবর শুনে ছুটে আসে মেট্যাল, ডিহিপার আর কোটালচকের লোক। স্কুলের সামনে জনারণ্য। সবাইয়ের সামনে চিৎকার করে খিস্তি-খেউড় দিচ্ছে গণেশ মিদ্যার দল। 'মার্, মার্ শালাদের। মারিয়া খেদা।'

'ইস্কুল কত পবিত্র থান। মা-সরস্বতীর মন্দির। সিখেনে কিনা এমন তরো পাপ-কাজ!'

'ঢেমনা-ঢেমনি কি কচ্ছে ভিতরে? জোড় খাচ্ছে, নাকি ছেড়েছে?'

আধঘণ্টাটাক বাদে, প্রবল উত্তেজনার মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় বাণেশ্বর ঘোষ। ওকে দেখে জনতা আর একবার অশান্ত হয়ে ওঠে, বিচার চাই। এদের দুজনারই বিচার চাই। বাণেশ্বর ঘোষ বহু কষ্টে শান্ত করে সবাইকে। দরজার শেকল খুলে ভেতরে ঢোকে। দুজনকেই দেখতে থাকে অপলক।

গীতালী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর মুখ। প্রণবকে কেমন বিহ্বল লাগছিল। পুরো ব্যাপারখানা যেন বোধগম্য হচ্ছিল না তার।

বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'আর কাঁদিয়া কি হবে? পই পই করিয়া বারণ

কল্লাম। ইস্কুলের বোর্ডিং, ব্যাটা-ছেলাদের জায়গা। একলা সোমত্ত যুবতী, ভর সন্ধ্যায়, যাইস্ নি। বারণটা শুনলি মোর? নিজের মু পুড়ালি, মোর মু পুড়ালি, বংশের মু পুড়ালি।'

গীতালী তাকায় বাণেশ্বরের দিকে। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা বইছে তার।

বাশেবর ঘোষ বলে, 'চল্। চল্ মোর সাথে। মান-মর্যাদা সব ধুলোয় লুটিয়া দিলি!'

জনতা কিন্তু গীতালীকে ছেড়ে দিতে নারাজ। বাণেশ্বর বলে, 'অকে ঘরের মধ্যে আটকিয়া কি হবে? মায়া-মানুষ ও, এখানে থাকিয়া কিছো একটা হয়্যালে তখন সারা গাঁ দায়ী হবে। যা দেখবার দেখ্‌লে ত' সকলে। লুকা-ছাপার কিছো নাই। বিচারের আসরে কি মুই অস্বীকার যাইতে পারবো। ছাড়িয়া দও একে। মুই এর জামিন রইলাম।'

গীতালীকে নিয়ে ভীড় ভেঙে বেরিয়ে আসে বাণেশ্বর ঘোষ। পেছনে, ছোকরার দল অশ্লীল খিস্তি করতে থাকে গীতালীকে নিয়ে।

দোতলার ঘরে বন্দী থাকে প্রণব।

॥ ষোল ॥

ন্যাকা-সুধীর চাঙ বাজিয়ে গান ধরেছে ভুঞ্যাদের বাখুলে।

হায় গ', মাঘেতে মকর মিঠা, আর মিঠা সীম
ফাগুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্তাকুতে নিম।
চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম,
বৈশাখেতে শশা মিঠা, ষোল মাছেতে আম।

ফুল গেড়্যার ভূঞ্যা-বাড়ির বৌ-ঝিরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে উঠোন জুড়ে। দুপুর গড়িয়ে এসেছে প্রায়।

পাশ দিয়ে টেস্ট রিলিফের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে গোক্ষুর। পঞ্চমীর দোরে খানিক সময় কাটিয়ে, সে যাবে ভুঁড়ুরবনির জঙ্গলে। নিতাই মাস্টার সেখানে আজ মিটিং ডেকেছে।

বড় অনটন পড়েছে দেশে। কার্তিকা টান। ক্ষেতে-বিলে কাজ নেই। সরকারী কাজও না। স্বচ্ছল গেরস্থরাও ঝিমিয়ে পড়ে এ সময়টাতে। আর, যারা আধি-বর্গায় চাষ করে, কিংবা খাটা-বাটা করে খায়, তাদের দুর্দশা আর কহতব্য নয়। ঘরে দানা নেই। পেট ফাঁকা থাকে দুদিন তিন-দিন। অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছে। দু'একসের ধান দাদনের জন্য সম্পন্ন গেরস্থের দোরে দোরে ঘুরছে কুকুরের মত। মান-মর্যাদা শিকেয় তুলে ভিক্ষের থলি ঝুলিয়েছে

অনেকে। হাহাকার উঠেছে দেশময়। হায় ভগবান, এই একটা মাস কি কাটবে নি? অঘ্রাণ মাসেই পাকা ধান। নৈতন চালের ভাত। হায় ভগবান!

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালো গোক্ষুর। কয়েক পলক ভাবলো। তারপর ধপ করে বসে পড়লো ধারে ঢাক-কদম গাছটার তলায়।

উচ্চগ্রামে গান ধরেছে ন্যাকা-সুধীর। চাঙ-বাজছে তালে তালে। সঙ্গে সঙ্গে বেজে চলেছে চাঙের গায়ে বাঁধা ঘুঙুর।

জৈষ্ঠ্যেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল,
শ্রাবণেতে খই-দই, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনে ঝুনা নারকোল, কার্তিকেতে ওল
অঘ্রানেতে লবান্ন আর চিংড়া মাছের ঝোল।

গোক্ষুর জানে, ন্যাকা-সুধীর শুধু গানই গাইছে না। তার গলা চলছে, হাত চলছে, চোখ দুটোও ছুটে বেড়াচ্ছে চার পাশে। খবর-শিকার করছে ন্যাকা-সুধীর। দুনিয়ার যাবতীয় গুহ্য খবর। এ সব খবর সে দিনান্তে বেচবে যোগ্য খদ্দেরের কাছে, উপযুক্ত মূল্যে।

পোষেতে মুলো-মুড়ি খেতে লাগে মিঠা,
ঘন-আউটা দুধের সাথে বাসি পুড়া পিঠা গো—
বাসি পুড়া পিঠা ॥

চাঙ থামায় ন্যাকা-সুধীর।

হাঁক পাড়ে অন্দরের দিকে: দও গো মা-জননী, চ্যাঙ্গল্ বুড়াকে কিছো দও।

ভূঞা বাড়ির ছোট বউ কাঠাতে করে মুঠো তিন-চার চাল এনে ঢেলে দিল ন্যাকা-সুধীরের কাঁধের ঝুলিতে। উঠে দাঁড়ায় ন্যাকা-সুধীর। পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে রাস্তার দিকে।

গাছের তলায় প্রস্তুতি নেয় গোক্ষুর। উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে থাকে দক্ষিণ-মুখো শুঁড়ি রাস্তা ধরে। ভুঁড়ুরবনির জঙ্গলের ঠিক উল্টো দিকে।

হঠাৎ যেন ন্যাকা-সুধীরকে নজরে পড়ে। ঘুরে দাঁড়ায় গোক্ষুর।

'মামু, কুন্ দিকে যাও?' গলায় মধু ঢেলে শুধোয় গোক্ষুর।

'ঘর ফিরছি, বাপ!' ক্লান্ত গলায় জবাব দেয় ন্যাকা-সুধীর। সর্বদা পিট পিট করছে চোখ। যেন বালি ঢুকে আটকে গেছে চোখে।

দৌড়ে কাছে আসে গোক্ষুর।

'হারি পিসিকে একটা কথা বলিয়া দিবে?'

'কি কথা?'

'বলবে যে, মুই পারিজাতপুর যাচ্ছি। আজ রাতে ফিরবো নি।'

'বলিয়া দুবো!' গোক্ষুরের চোখের ওপর চোখ রাখে ন্যাকা-সুধীর, "হঠাৎ এই পড়ন্ত বেলায় পারিজাতপুর যাচ্ছু ক্যানে রে, বাপ?'

'শিখুনে আজ নিতা—।' বলতে বলতে কথাটা গিলে ফেলে গোক্ষুর,

'একটা দরকার আছে মামু। পরে বলবো তুমাকে। বেলা পড়িয়াল। চলি। হারি পিসিকে কথাটা বলতে ভুলো না যেন।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে শুঁড়িপথ ধরে অদৃশ্য হয়ে যায় গোক্ষুর।

কয়েক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঠুকুর ঠুকুর পা চালায় ন্যাকা-সুধীর। চোখে-মুখে ধূর্ত শিয়ালের নিস্পৃহতা। গোক্ষুর শুঁড়িপথের শেষ প্রান্তে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু বাদে ফিরে এসে আগের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে ভুঁড়ুরবনির জঙ্গলের দিকে। সারা মুখ চাপা হাসিতে ভরে যায়।

লহরী পুকুরের পাড় ধরে হাঁটছিল গোক্ষুর। বিশাল উঁচু পাড়। লতা-পাতা, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে লোধাপাড়ার মেয়েগুলো। কন্দ-কচু খুঁড়ছে। এখন এই কার্তিকে দেশ জুড়ে তীব্র অনটন। ক্ষেতে-বিলে কাজ নেই। কাজ নেই গেরস্থের ঘরে-দোরে। সরকারী কাজ-বাজও বন্ধ। ধান পাকতে এখনো এক মাস। গরীব-গুরবো মানুষগুলো অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। শাক-পাতা, কন্দ-কচু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়েরিয়ায় ভুগছে। মরছে দু' চারজন।

গোক্ষুর দেখলো, জনা দশ-বারো লোধাকে নিয়ে বংশী ভঞ্জ হেঁটে আসছে লহরীর উঁচু পাড় ধরে। জোয়ান লোকগুলো কেমন কাঠি সার হয়ে গেছে। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো বংশী।

'এই গোখরা, শুন্।' বলতে বলতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো বংশী ভঞ্জ, 'তুই অপারেশান করাউ নি?'

'অপারেশন' বস্তুটির সঙ্গে গাঁয়ের গরীব মানুষগুলোর পরিচয় ছিল না। বংশী ভঞ্জর কল্যাণে এরা জেনেছে তা। সরকার নাকি উঠে পড়ে লেগেছে, দেশ-গাঁয়ের তাবত পুরুষকে 'অপারেশন' করাবার জন্য। বংশী ভঞ্জই এ তল্লাটে প্রথম বয়ে আনে খবরটা। দেশের মানুষ নাকি বাড়ছে। সেই জন্যেই এত অভাব-অনটন। সরকার নাকি সেই কারণে দপ্তর খুলেছে। 'অপারেশন' করেই দুধ আর ফল দিচ্ছে খেতে। সঙ্গে একশোটি করে নগদ টাকা। শুনেও গা করেনি গাঁয়ের মানুষ। বউ-ঝি'রা গাল পেড়েছে বংশীকে। ধীরে ধীরে অনটনের দিন যত ঘনিয়ে এসেছে, বংশী ততই ঢুকেছে লোধাদের পাড়া-গুলোতে। 'অপারেশন' করিয়েই ফিরিয়ে নিয়ে আসছে দু'দিন বাদে। নগদ টাকার সিকি অংশ দিতে হচ্ছে বংশীকে।

বুড়ো-থুড়োদের ক্ষেত্রে আধাআধি। তা হোক। তাও তো পঞ্চাশ টাকা হাতে পাচ্ছে মানুষগুলো। এই ঘোর কার্তিকে দিনের পর দিন অন্ন বিহনে ধুঁকতে থাকা মানুষগুলোর সামনে যেন আচানক খুলে গেছে স্বর্গের দুয়োর। দলে দলে বংশীর পিছু পিছু ছুটে চলেছে ওরা বেলদা হাসপাতালের দিকে। ফিরে এসে দু'দিন পেট ভরে ভাত খাচ্ছে। ছা-ছাওয়ালের মুখে

তুলে দিচ্ছে অন্ন। গোক্ষুর দেখলো, এই দলে এমন অনেকেই আছে। যাদের বিয়েই হয় নি।

গোক্ষুরের দু' চোখে পলক পড়ে না। শুধোয়, 'তোরাও চলালি খাসি হইতে?'

ছোকরাগুলো অন্যদের পেছনে আড়াল খোঁজে। গোক্ষুরের বুকের ভেতরটা সহসা মোচড় দিয়ে ওঠে। বংশী ভঞ্জর কথার জবাব না দিয়ে সে হাঁটতে থাকে জঙ্গলের দিকে।

ক্ষুধার্ত মানুষগুলো টলমল পায়ে রওনা দেয় বংশী ভঞ্জর পিছু পিছু। এক টুকরো মেঘ, ঢেকে দিয়েছে বিকেলের সূর্যকে। ছায়া-ছায়া মাঠ-ঘাট, লহরীর পাড়। বৃষ্টি নামবে নাকি এই অদিনে? কার্তিকা ধানের বারোটা বেজে যাবে তাহলে।

ভুঁড়ুরবনি জঙ্গলের মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বানানো চাতাল একটা। ওর ওপর বসেছে জনা বিশেক লোক। ঠিক মধ্যিখানে নিতাই মাস্টার।

চাঁদের আলোয় পুরো চত্বরটা আলোয় আলোময় হয়ে যাবার কথা। কিন্তু চারপাশে কুয়াশা থাকায় চাঁদের আলোটা ঘষা ঘষা।

চাপা গলায় কথা বলছিল নিতাই-মাস্টার। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন নিয়ে কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল সবাই।

নিতাই মাস্টার বলে, 'আসছে ঘোর ধান কাটার মরশুম। এখন যদি মজুরীর সরকারী রেট চাউ তুরা, মালিক দিতে বাধ্য হবে।'

'যদি না দেয়।'

'মজুর দেওয়া বন্ধ করবি তাইলে।'

'খাবো কি?'

'দু'তিন দিন কষ্টে-সৃষ্টে চালাবি। জঙ্গলে ঝাঁটি-কাঠ বিকিয়া এক বেলা আধপেটা খাবি। ধানকাটা ফুরিয়া গেলেতো ঐ ভাবেই চলবে তোদের দিন। তখন মাসের পর মাস চালাবি, এখন তিন দিন চালাতে ভয়? আমার বিশ্বাস তিন-চার দিন নাগাড়ে চালিলে কেতরিয়া পড়বে জোতদারগুলা। এমনিতে এবার ধানে পাক আলসে জলদি। শেষ বর্ষা তেমন হইলো নি। অর্থাৎ জলদি এলিয়া পড়বে পাকা ধরনের কাঁদি। স্বাভাবিক কারণেই যত জলদি সম্ভব কাটার কাজ শেষ কত্তে চাইবে জোতদাররা। এটাই তো মোক্ষম সময়!'

মানুষগুলো দ্বিধায় দোলে? বর্ষার মরশুমে নাগাড়ে পাঁচ দিন ধর্মঘট করে এক পোয়া চাল বড় কষ্টে বাড়ানো গেছে। আবার এ মরশুমে শুরু করলে ফল উল্টা হবে না তো?

নিতাই মাস্টার বোঝায়, 'চাষের মরশুমে তোদের ঘরে অভাব ঢের বেশি। এখন নতুন ফসল, মাঠে। কারো কারো ঘরে, যারা ভাগে-ভিতায় দু'এক

কাঠা চাষ করে, দ্'চার দানা আছে। দ্'চার দিন কাজ বন্ধ করবার এই তো মোক্ষম সময়। অন্যদিকে, এ মরশ্মে অদের চাড় থাইক্বে অনেক বেশি। পাকা ফসল পড়িয়া রইবে মাঠে। চোর-ছাচ্চোড়ে লিবে। শীষ কাটবে। পাখি-পাখাল, গর্-ছাগলে খাবে। এ মরশ্মে দ্'দিনও লাগবে নি অদের নোয়াতে।'

'যেদি পশ্চিম থিকে লেবার আনে অরা?' শ্যাম চক্রবর্তী বলে।

বাধা দিতে হবে সক্কলে মিলিয়া।' 'নিতাই মাস্টার গলায় জোর দিয়ে বলে, ব্ঝাইতে হবে প্রা পরিস্থিতি।'

অবশেষে রাজী হয় সকলে। প্র্ণাঙ্গ কর্মস্চী এবং দিনক্ষণ ঠিক হয়। পাড়া ধরে ধরে বোঝাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় কিছ্ বাছা বাছা লোককে। কোনও প্রকাশ্য মিটিং নয়। ঘরে ঘরে গিয়ে রাতের আঁধারে বোঝাতে হবে সমস্ত ক্ষেত মজ্রকে।

'মনে রাখতে হবে—।' নিতাই মাস্টারের শেষ সতর্কবাণী। 'আন্দোলন যেদি কত্তেই হয়, একটি লোককেও এর বাইরে রাখলে চলবে নি। তার চেয়ে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবাও ভালো।'

স্বীকার করে নেয় সবাই। মজ্রেরা যদি ভাগাভাগি হয়ে যায়, তবে একটা ছোট্ট অংশ লিয়াও অরা টেক্কা দিবে মোদের উপর। ভাঙিয়া দিবে ধর্মঘট।

সবশেষে নিতাই মাস্টার বলে, 'ধর্মঘট শ্র্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্ মল্লিক। শ্যাম ঠাকুর, ম্কুট মল্লিক, ভান্ দে আর চণ্ডী দাস সাবধান হয়্যাব। প্লিশ সেই বর্গার মরস্ম থিক্যা নজর রাখছে তুমাদের উপর।'

মিটিং শেষ হতে রাত হলো অনেক। নিতাই মাস্টারকে আজ রাতের মধ্যেই পেঁছ্তে হবে আহারম্ণ্ডায়। সেখানে জেলা-কমিটির অনিমেষদা আর লোকাল কমিটির নির্মল দে আসবে আজ রাতে। জর্রী মিটিং আছে ওদের সঙ্গে। ভুঁড়রবনির জঙ্গল থেকে আহারম্ণ্ডা প্রায় মাইল তিনেক। মাঝে পড়বে ধানের ক্ষেত, পাথরঘাটার খাল, আহারম্ণ্ডার জঙ্গল। অতখানি পথ এই রাতের বেলায় নিতাই মাস্টারকে একা একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। অন্তত একজনের যাওয়া উচিত ওর সঙ্গে। অনেকেই যেতে চাইছিল। কিন্তু নিতাই মাস্টার বেছে নিলো গোক্ষ্র ভক্তাকে।

বললো, 'কিরে গোক্ষ্র। যাইতে পারবি নি মোর সাথে?'

সানন্দে মাথা দোলায় গোক্ষ্র।

দ্জনে রওনা দেয় আহারম্ণ্ডার পথে। দ্'ধারে ভরভরন্ত ধানের ক্ষেত। মাঝে আলপথ। হিম পড়ছে আকাশ চুঁইয়ে। পাতলা কুয়াশা জমেছে চারপাশে। হাঁটতে হাঁটতে ম্দ্ গলায় কথা জোড়ে দ্'জনে।

গোক্ষ্র বলে, 'মাস্টারদা, যেসব লোধার ঘর নাই, তাদের তরে সরকার ঘর বানিয়া দিবে শ্নছিলাম, কি হলো তার, জান কিছো?'

'জানি।' নিতাই মাস্টার বলে, 'সরকার ঘর করিয়া দিবে, কিন্তু জমি

কিনবে নি নিজের পয়সায়। খাস জমিনে করতে চায় ঘর। বিডিওর তাতে প্রবল আপত্তি। সে পাঠালো জোত জমিন একুয়ার করার প্রস্তাব।'

'সরকার মানলো নি?'

'প্রথমে মানতে চায় নি। তারপর চিঠি-চাপাটির পর মানলো। বিডিও প্রথমে বাণেশ্বর ঘোষের একটা ভিটা একুয়ার করবার প্রস্তাব পাঠালো। বাতিল হয়্যা ফিরিয়া আইল। তারপর পাঠালো সুদেব মিদ্যার একটা ডাঙা; বাতিল হয়্যালো সেটাও। ফের পাঠালো কালাচাঁদ আইচের একটা ভিটা।' নিতাই মাস্টার থামে।

'সরকার লিবে সেটা?' গোক্ষুর শুধোয়।

'পড়ধানের জমিন একুয়ার করবে, অত বুকের পাটা সরকারের?' তেতো হাসে নিতাই মাস্টার, অদের ঘর আর হইলো নি।' নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে দু'জনে। একটু বাদে প্রসঙ্গ বদলায় নিতাই মাস্টার।

হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তোকেই ক্যানে বাছিয়া নিলাম বল্ দেখি?'

এটা গোক্ষুরের কাছেও এক ধন্দ। মূলত এক চোর সে। নিতাই মাস্টারের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্ত হয়েছে ইদানিং। ওর মিটিং-এ আনাগোনা করছে। এই মাত্তর। কিন্তু তার নিশুত পথের সঙ্গী হওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা গোক্ষুরের সঙ্গে হয়েছে কি? এত বিশ্বাস অর্জন সে করলো কবে?

নিতাই মাস্টার হাসে। বলে, 'সত্যি করিয়া বলছি, অনেকের থিকে তোকে মুই বেশি বিশ্বাস করি। তোর এমন দুটি গুণ আছে, যা সৎপথে পড়লে—।'

'ক্যানে ঠাট্টা করছো মাস্টার?' গোক্ষুর মনে মনে আহত হয়, 'চুরি-চামারি করিয়া খাই। মোর আবের গুণ!'

নিতাই মাস্টার নিঃশব্দে হাঁটে। পাথরঘাটা পেরিয়ে যায় হাঁটু জলে। পচা খালেরই অংশ ওটা। এই জায়গায় খাল পারাপারের ঘাটখানা বেজায় পাথুরে বলে এর নাম, 'পাথরঘাটা।'

খালের ওপারে উঠে ফের মুখ খোলে নিতাই মাস্টার, 'তোর প্রথম গুণ হইলো মন্ত্রগুপ্তি। প্রত্যেক চোর-ডাকাতেরই এটা থাকে। পেটের কথা কিছোতেই ফাঁস হয় না। গুণটাকে ভালো কাজে লাগাতে চাচ্ছি আমি। আমার সাথে তেমন লোকই ঘোরাঘোরি করবে, যার পেটের কথা সহজে ফাঁস হয় না। আর দ্বিতীয় গুণ হইল—।'

সহসা পেছন থেকে নিতাই মাস্টারের জামার খুঁট খামচে ধরে গোক্ষুর। নিতাই মাস্টার দাঁড়িয়ে যায়। মুখ ঘুরিয়ে তাকায় গোক্ষুরের দিকে। গোক্ষুর নিঃশব্দে নিজের ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখে। নিতাই মাস্টারকে টেনে নিয়ে যায় ডানদিকের গাছের তলায়। সেখানে ছায়ার আঁধারে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। নিতাই মাস্টারের কানের কাছটিতে মুখ এনে গোক্ষুর বলে, 'কোউ আসতিছে।'

'কুনদিক থিকে?' নিতাই মাস্টার ফিসফিসিয়ে শুধোয়।

'খালের দিক থিকে। জলের মধ্যে কাবুর-কুবুর আওয়াজ পাইলাম।

খাল পারিয়া নির্ঘাৎ এদিকে আসতেছে কোউ।'

নিতাই মাস্টারের সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। একটু একটু করে গাছের গুঁড়ির দিকে সরে যায় সে।

একটু বাদে লোকটি ওদের পেরিয়ে চলে যায় সামনের রাস্তা দিয়ে। ঘসা জ্যোৎস্নার আলোয় ছায়ামূর্তিকে আবছা দেখতে পায় দু'জনে।

নিতাই মাস্টারের দু'চোখে রাজ্যের আশঙ্কা। পুলিশ আঁতিপাতি খুঁজছে ওকে। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক লাগিয়ে দিয়েছে নিতাই মাস্টারের সন্ধানে। ইদানিং মাঝে মাঝেই নিতাই মাস্টারের মনে হয়, কেউ যেন ওকে অনুসরণ করছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

ফিসফিসিয়ে নিতাই মাস্টার বলে, 'কে হইতে পারে, বলু ত?'

গোক্ষুর একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আগন্তুক লোকটির গতিপথের দিকে। সহসা বলে, 'টুকে দাঁড়াও তুমি। দেখিয়া আইসি।' বলেই পা চালায় সন্তর্পণে এবং খানিক্ বাদেই আলো-আঁধারিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিতাই মাস্টার হাজার দুর্ভাবনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার গাছের ছায়ায়।

বেশ খানিক বাদে ফিরে আসে গোক্ষুর। হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল সে। বললো, 'চল মাস্টারদা।'

'লোকটা কে?'

'সে আর শুনতে হবে নি তুমাকে। তুমি চল জলদি।'

তবুও পথ হাঁটতে হাঁটতে নিতাই মাস্টারের কৌতূহল মেটাতেই হয়।

গোক্ষুর বলে, 'নাম জিগাবে নি। শালা, আমাদের লাইনের কুলাঙ্গার একটি। দশ বচ্ছর লাইনে আছে, এখনো হাঁটা রপ্ত হয় নি। শালা কানেও খাটো। পিছন পিছন কতক্ষণ হাঁটছি বুঝতেই পারে নি। গলা খাঁকারি দিলাম অল্প। তাও হুঁশ নাই। শেষে নাম ধরিয়া ডাকতেই চমক খাইয়া, কাঁদিয়া-মাদিয়া একাকার।' গোক্ষুর যত বলে, তত হাসে।

'যাচ্ছে কুথা?'

'যাচ্ছে ধান্দায়। কইলাম, এই হাত-পা, চোখ-কান লিয়া এ লাইনে আসসু রে, জানে মরিয়াবি কুনোদিন। কাবুর-কুবুর শব্দ তুলিয়া খাল পারাউ কুন হিসাবে?'

'তোর কথা জিগায় নি?'

'জিগালো। কইলাম, মুইও চলছি এক ধান্দায়। বলতে বলতে সহসা ব্যস্ত হয়ে ওঠে গোক্ষুর, চল, চল, 'টুকে জোরে পা চালাও। দেরি হয়্যাল শালার তরে।'

'ইস!' নিতাই মাস্টার বলে, 'যদি পুলিশ কিম্বা পুলিশের চর হইত্তো? মুই তো বুঝতেই পারুতি নি।'

ওরা পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। আহারমুণ্ডার জঙ্গলের কাছাকাছি এসে গেছে।

চারপাশে নানা জাতের শব্দ। একটা বেয়াড়া আওয়াজ আসছে ডান-দিকের কুড়চি ঝোপ থেকে। শঙ্কিত মুখে থমকে দাঁড়ায় নিতাই মাস্টার।

গোক্ষুর মৃদু গলায় বলে, 'কিচ্ছো না। ফাঁদে খরগোশ পড়ছে।'

নিতাই মাস্টারের শঙ্কা ঘোচে না তাও। গোক্ষুরের দিকে তাকায়। গোক্ষুরের নিরুদ্বেগ মুখ। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় খরগোশের ফাঁদে পড়ার গল্প শোনায় সে। খালের ধারে দু'চার দাগে গম বুনেছে আহারমুণ্ডার চাষারা। কাঁচ গমের চারার লোভে জঙ্গল থেকে রোজ রাতে খরগোশের দল নির্দিষ্ট পথে আনাগোনা করে। সুযোগসন্ধানীরা ওদের আনাগোনার পথে ফাঁদ পেতে রাখে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আহারমুণ্ডার জঙ্গলে ঢোকে। নিশুত রাতে জঙ্গলের মধ্যে এক হাড়-কাঁপানো পরিবেশ। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শুয়ে শুয়ে নিশাচর প্রাণী, কীটপতঙ্গের অবিরাম হাঁটা চলা। খস্ খস্, মচর মচর আওয়াজ এখানে ওখানে। গাছে গাছে ভয়াতুর নিশাচর পাখির হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠা। মাথার ওপর পেঁচা আর বাদুড়ের ওড়াওড়ি। খুব সাহসী বুকও কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মনের অস্বস্তিটুকু কাটাবার তরে ওরা খুব চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে থাকে।

নিতাই মাস্টার বলে, 'তুই এসব এক্কেবারে ছাড়িয়া দে গোক্ষুর। তোর ভালো হবে।'

গোক্ষুর চুপ করে থাকে। ভাবতে থাকে আকাশ-পাতাল। একপাল বাদুড় সাঁই-সাঁই পাখনা চালিয়ে উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে।

নিতাই মাস্টার বলে, 'কি রে, চুপ করিয়া রইলি যে?'

গোক্ষুর বলে, 'ছাড়িয়া দিলে তো ভালোই হয় মাস্টারদা। কিন্তু খাবো কি?'

'দুনিয়ার সব গরীব লোক কি চুরি করিয়া খায় রে? ভগবান হাত-পা দিছনু, খাটিয়া খাবি।'

একটু থেমে নিতাই মাস্টার বলে, 'কিছো খাস্ জমির পাট্টা পাউ যদি, চাষ করিয়া খাইতে পারবি নি?'

'চাষ ত' করিনি কুনোদিন।' গোক্ষুর আমতা আমতা করে।

'শিখিয়া লিবি। রাতে-ভিতে চুরি করার চাইতে চাষ করা অনেক সোজা।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে গোক্ষুর ভক্তা। মৃদু গলায় বলে, 'সে বোধ করি হবার নয় মাস্টার। গা'য় গু' মাখলেও ভূত ছাড়বে নি। বাণেশ্বর ঘোষ দিন দু'বেলা ন্যাকা-সুধীরকে পাঠাচ্ছে মোর পাশ।'

নিতাই মাস্টার প্রতিবাদ করে না। চুপ করেই হাঁটতে থাকে দু'জনে।

একটু বাদে গোক্ষুর বলে, 'বাচ্চাটাকে লিয়া বৌদি একলাটি ঘরে থাকে। ভাবনা হয় না তুমার? তুমি ত লুকিয়া লুকিয়া বেড়াচ্ছ!'

'ভাবনা হয় বৈকি!' আবেগে ভারি হয়ে আসে নিতাই মাস্টারের গলা,

'কি আর করা যাবে।'

'মুই এবার থিকে খোঁজ-খবর লিবো বৌদির।'

'খবর্দার, ঐ কাজটি করবি নি। তাতে অরা বিপদে পড়বে। তুইও।' একটু থেমে নিতাই মাস্টার বলে, 'অকে লক্ষ্য-নজর রাখার বহুত লোক আছে। তোরা বুঝতে পারু নি, গোপনে অরা সর্বদাই নজরে রাখছে মোর বউ-বাচ্চাকে।'

ঝাঁ-ঝাঁ করছে শীতের রাত। নিস্তব্ধ পৃথিবী। সহসা অন্য প্রসঙ্গ তোলে গোক্ষুর। বংশীর সঙ্গে বিকেলের ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে নিতাই মাস্টারকে।

একটুক্ষণ কোনও জবাব দেয় না মাস্টার। একসময় বলে, 'অপারেশন জিনিসটা তো খারাপ না। কথাটা হইল এর প্রয়োগ লিয়া। গাঁয়ে গাঁয়ে যথেষ্ট প্রচার কল্ল নি সরকার। ভয় ভাঙাইল নি মূর্খ মানুষের। শুধু ভয় দেখাইতে রইল সরকারী অফিসারদের, আর টাকার লোভ দেখাইতে লাগলো অভাবী মানুষকে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। প্রমোটারির নামে বংশী ভঞ্জরা মালকাছা মারিয়া নামিয়া পড়ছে আসরে। পঞ্চাশ-একশো টাকার লালসায় উপাসে থাকা মানুষ ছুটছে অদের পিছু পিছু। পনেরো বচ্ছরের বাচ্চা থিক্যা নব্বই বচ্ছরের বুড়া অবধি কেউ বাদ যাচ্ছে নি। এক পিছু কোটা বাঁধিয়া দিছে। চিঠির মাধ্যমে, মিটিং-এ-বৈঠকে ধমক-চমক দিয়া রাখছে অনবরত। বিডিও ছুটছে। তার পিছু পিছু অন্য অপিসাররা ছুটছে। গ্রামসেবক, অঞ্চলপ্রধানরা ছুটছে। অবস্থাখানা বুঝ তেবে।'

গোক্ষুর বলে, 'কিন্তু মাস্টার, মুকুন্দ, ভীমা,—আইজতক ব্যা হয়নি অদের। অপারেশান হইলে তো বাচ্চা হবে নি।'

নিতাই মাস্টার সহসা কোনও জবাব দিতে পারে না। এক অসহায় যন্ত্রণায় ভরে ওঠে চোখের মণি। তাও বলে, 'কইলাম তো তোকে। ফেমিলি প্লেনিং ব্যাপারটা তো অতি উত্তম। তার প্রয়োগ লিয়া কথা। টাকার লোভে, আর কোটা পূরণ করিয়া হাততালির লোভে, যে সর্বনাশা খেলায় নামছে এরা, তার পরিণাম কদ্দুর গড়ায়, দ্যাখ।'

'অপিসাররা ত' বুঝে সব। তারা ক্যানে বুঝাচ্ছে নি সরকারকে?' গোক্ষুর অবুঝের মত শুধোয়।

'তারা বুঝাবে সরকারকে?' নিতাই মাস্টার তিক্ত হাসে, 'জরুরী অবস্থা চলছে না দেশে?' 'জরুরী অবস্থা'র মানে বুঝু? সব 'মিসা' হয়্যাবে উল্টা কথা কইলে— ।'

গোক্ষুর জরুরী অবস্থা নিয়ে তেমন কিছুই জানে না। সে শুধু লক্ষ্য করেছে গুটি কয়েক ব্যাপার। সাতষট্টি-উনসত্তরের সেই গরীব মানুষের রমরমার দিন আর তিলমাত্র নেই। বাণেশ্বর ঘোষদের প্রতাপ বেড়ে গেছে দশগুণ। আর থানার বড়বাবু তো দূরের কথা, টিকিওয়ালা বিহারী সিপাই রামভুজের দাপটও সহ্য করা কঠিন। আর গরীব মানুষের মিটিং-মিছিল, কাজের

দাবিতে ব্লক ঘেরাও, মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন--সবকিছুই কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রবলে, একেবারেই থেমে গেছে। সবাইয়ের চোখে কেমন চাপা ভয়। বেড়ালের গন্ধ পেয়েছে মুষা।

'মানুষের গলায় পা তুলিয়া দাঁড়িয়া আছে অরা—জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া কাটিয়া লিচ্ছে জিভগুলা।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল নিতাই মাস্টার। তার আগেই ফুরিয়ে গেল জঙ্গলটা। সামনে আহারমুণ্ডা গাঁ। গাঁয়ে ঢুকলো ওরা। নিতাই মাস্টার বললো, 'তুই এবার ফিরিয়া যা গোক্ষুর। এখান থিক্যা মুই মোর ডেরায় চলিয়াবো।'

গোক্ষুর তাও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝ রাস্তায় মাস্টারকে একলাটি ছেড়ে দিতে আপত্তি ওর মনে মনে।

নরম গলায় নিতাই মাস্টার বলে, 'কিছো মনে করিস নি, ডেরাটা এখনই তোকে দেখাতে চাচ্ছি নি।'

শেষ রাতে একলাটি নিজের ঘরে ফিরে আসে গোক্ষুর ভক্তা।

॥ সতের ॥

মটুক সিং হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিল, 'কাল রাতে গোখরাকে ধরিয়া লিয়া গেছে পুলিশ।'

মা-মনসায় চণ্ডী দাসের বাড়িতে মিটিং সেরে শেষ রাতে নারাণগড় ফিরে এসেছিল নিতাই মাস্টার! নারাণগড় বাজার থেকে বেশ খানিক তফাতে ভূমিজপাড়া। ঝুপড়ি ঝুপড়ি ঘর সব। চার পাশ থেকে ঝোপঝাড়ের আড়াল। ঐ ঝুপড়ির একটিতে সে মাঝে মাঝে আসে। দু'এক রাত থাকে। নিতাই মাস্টার যখন ঘুমোয়, মটুক সিং-এরা তখন হরেক ছলে পাহারা দেয় ওকে। গোপন ডেরায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মটুক সিং-এর চেঁচামেচিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

'ক্যানে? ধরিয়া লিয়াল ক্যানে?' নিতাই মাস্টার চোখ রগড়াতে রগড়াতে শুধোয়।

মটুক সিং সেটা জানে না। চুপ করে থাকে। নিতাই মাস্টার শুধোয়, 'তুই কার থিকে খবর পাইলু?'

'মধু মল্লিক আজ সকালে আইসিয়া খবর দিছে।'

'মধু কুথা?'

'সে গেছে নির্মল দে'র ঘরে, খবরটা দিতে।'

বাইরে ঝলমলে রোদ। ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে ঢুকছে দু'চার চিলতে। নিতাই মাস্টার উঠে দাঁড়ায়। বাইরে এসে জলদি হাতে মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। ছেঁড়া জামাখানি গলিয়ে নেয় গায়ে। ততক্ষণে ঘরে ঢোকে মধু।

মধুর মুখে ঘটনাটা আদ্য প্রান্ত শোনে নিতাই মাস্টার। কাল শেষ রাতে

একদল পুলিশ এসে আচমকা ঘিরে ফেলে গোক্ষুর ভক্তার বাড়ি। গোক্ষুর ভক্তা বোধ লেয়, ঘরে ছিল নি। শেষ রাতে ফেরা মাত্রই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে থানায়।

'কিন্তু ক্যানে?' আকুল গলায় শুধোয় নিতাই মাস্টার, 'সে তো ইদানিং আর চুরি-চামারিতে যাচ্ছে নি। যন্দুর জানি, গত দু'তিন মাসে সে একটিও চুরি করে নি।'

এর উত্তর মধুও জানে না। তবে এটা ডিহিপার লোধাপাড়ার মানুষ-জনের কাছে একটি পরিচিত দৃশ্য। আচমকা গভীর রাতে ওদের পাড়ায় পুলিশ ঢুকবে। দু'চারজনকে ধরবে। দু'দশটি ঘরের কপাটে লাঠি আছড়াবে। হাঁক মারবে, 'এই কাস্তা, গুয়া, রগড়া—, ঘরে আছিস?' ফিরে যাবে পুলিশ বাহিনী। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে পাঁঠা বাচ্চা, মুরগী, ঘরের চালের ফলন্ত লাউ—যার ঘরে যা মেলে। প্রতিবাদ করবার প্রশ্নই ওঠে না। ইদানিং বছর দু'তিন জুলুমটা খুব বেড়েছে। খাঁকির দল যেন রাজত্ব পেয়ে গেছে। যা খুশী তাই করছে। হাতে মাথা লিচ্ছে সবাইয়ের। রা-কাড়বার উপায় নেই। একটা নাকি আইন হয়েছে দেশে, পুলিশ যাকে খুশী ধরিয়া, পুরিযা রাখতে পারে জেলে! কিছু কইতে পারবে নি কোউ। দেখেশুনে থ' মেরে গেছে মানুষ জন। পুলিশ পাড়ায় ঢুকলে, কাটা কলা গাছের পারা আছড়ে পড়ে পায়ের তলায়।

উপস্থিত গোক্ষুর ভক্তাকে ধরে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তোলে নিতাই মাস্টারকে। লোকটা চুরি-চামারি ছেড়ে দিচ্ছিল। মিটিং-এ আসছিল নিয়মিত। বেশ দ্রুতগতিতে ভালো হয়ে উঠছিল। তাহলে আচমকা তাকে কেন ধরলো পুলিশ?

'নির্মল দে ত' এখনো আইলো নি।' নিতাই মাস্টারকে অস্থির দেখায়।

'সে থানা ঘুরিয়া আইস্‌বে।' মধু জানায়। চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে থাকে নিতাই মাস্টার। চিরকালই সে জেদী মানুষ। একটা লোককে নরক থেকে তিল তিল করে তুলছে সে। এখন মাঝপথে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারে না। গোক্ষুরের এই সংকটকালে তাকে মদত না দিলে, সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে নিতাই মাস্টারের প্রতি। পিছিয়ে যাবে ভয়ে। সেটা হতে দেওয়া যায় না।

শুধু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খচ্‌খচায়। আবেগের বসে উল্টো কাজ করছে না তো সে? গোক্ষুর ভক্তা যদি সত্যিই কোনও চুরির কেসে ধরা পড়ে আর নিতাই মাস্টার যদি তাকে মদত দিতে ছোটে, তবে সাধারণ মানুষের সামনে তার মুখ পুড়বেই। সবাই তাকে 'চোরের সর্দার' বলে ডাকবে। সেদিকটাও খতিয়ে দেখা দরকার। এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি গোক্ষুরকে বিশ্বাস করতে পারছে না নিতাই মাস্টার। কারণ লোকে বলে, চুরি বিদ্যা একবার ধরলে নাকি ছাড়া ভারি কঠিন! তার প্রথম কারণ, নিপুণ ভাবে কাজটা সারতে পারলে, একরাতে যা মাল-কড়ি আসে, মজুর মাইন্দাররা পনের

দিন খেটে তা পায় না। দ্বিতীয় কারণ, রাতের আঁধারে কাজ করে করে এবং দিনের বেলায় আঁধার কুঠরিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এরা রোদ্দুর একদম সইতে পারে না। নাগাড়ে রাত জাগার দরুন এদের পিত্তের দোষও হয়। পিত্তের দোষ থাকলে, সামান্য রোদ্দুরেই গায়ের চাম জ্বলতে থাকে। ফলে, চুরিবিদ্যা একবার ধরলে, দিনের আলোয় কাজ করবার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা দুটোই হারিয়ে যায় চিরতরে। তাই, স্রেফ পেটের দায়েই তাকে বার বার ঐ একই গাড্ডায় পড়তে হয়। এসব নিতাই মাস্টারের শোনা কথা। সত্যি-মিথ্যে জানে না। তবে নিতাই মাস্টার বিশ্বাস করে, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। মনের জোর থাকলে মানুষ অবশ্যই দীর্ঘদিনের কু-অভ্যাস ছাড়তে পারে। গোক্ষুর ভক্তার মনের সেই জোরটা কতখানি, তার পরীক্ষা এখনো হয়নি পুরোপুরি। নিতাই মাস্টারের যেটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্ব, তা এইখানেই।

রোদের ঝাঁঝ বাড়ছে। ঝুপড়ির মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে নিতাই মাস্টার। মধু মল্লিক পাশটিতে বসে থাকে বোবার মত।

নির্মল দে' এলো বেলা দশটা নাগাদ।

বললো, 'গোক্ষুর ভক্তাকে চালান দিচ্ছে মেদিনীপুর কোর্টে।'

'কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেস কি?'

'কেউ ত' কিছো পষ্ট করিয়া বলতে চায় না। খালি বেলা বাড়িয়া যায়। যাকে জিগাই, খালি বলে, কেস একটা নিশ্চয়ই আছে। পুলিশ এমনি এমনি কাউকে ধরে না। শেষ অবধি বড়বাবু ডায়েরীর খাতা খুলিয়া দেখানু, গত পরশুর রাতে কুশবসানে মান্নাদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি করেছে গোক্ষুর ভক্তা।' বিড় বিড় করতে থাকে নির্মল দে, 'কুশবসানের ডাকাতির ঘটনাটা মুখে মুখে খোব চাউর হইছে। এমন বড় সড় ডাকাতি এ তল্লাটে বহুদিন হয়নি। মুই আর বড়বাবুকে কি বলি? ডাকাতির কেসে ধল্লে ত' পার্টির কিছুই বলবার নাই। পার্টি ত' চোর-ডাকাতের পক্ষে লড়বে নি।'

শুনতে শুনতে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে যায় নিতাই মাস্টার, কি কও তুমি নির্মল! গত পরশু বেলাটি থিকে মা-মনসা অবধি গোক্ষুর মোকে পাহারা দিয়া লিয়া গেছে! অন্তত রাত তিনটা অবটি সে মোর সাথেই ছিল! মা-মনসা গাঁ থিকে কুশবসান কম করিয়াও আট দশ মাইল পথ। কি করিয়া সে ডাকাতি কত্তে যাবে? গতকাল রাতেও সে মোকে নারাণগড় পেঁছিয়া দিয়া গেছে অনেক রাতে।'

'এসব কথা ত' আর থানাকে বলা যাবে নি।' নির্মল দে বলে।

'তা বলা যাবে নি। কি আর করা যাবে। চালান দউ অরা। আমাদের জামিনের ব্যবস্থা কত্তে হবে।' নিতাই মাস্টার অসহায় হয়ে বলে।

সেটাই সাব্যস্ত হলো। কিন্তু নিতাই মাস্টারের পক্ষে দিনে-দুপুরে বাসে চড়ে প্রকাশ্য সদর কোর্টে ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়। নির্মল দে এবং মধু মল্লিকই যাবে সদরে। ওখানে গিরীন ঘোষ উকিল। পার্টির অনেক কেস বিনে পয়সায় চালায় সে। নিতাই মাস্টার বলে, 'গিরীনকে মোর কথা বলিব।'

জামিনের টাকা, রাহা খরচ ইত্যাদি জোগাড় করতে একটু দেরিই হয়ে গেল। মেদিনীপুর কোর্টে পেঁছিুতে বেলা দুটো।

দূর থেকে নির্মল দে এবং মধু মল্লিক দেখলো, গোক্ষুর কোর্ট চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য!

মধু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল গোক্ষুরের দিকে। এতক্ষণে যার জেল-হাজতে যাওয়ার কথা, সে কেন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়?

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হাসে গোক্ষুর। ঢলে পড়া সূর্যের মত ম্লান হাসি। চোখের কোণে সুপ্ত বিষাদ। বলে, 'মধু, তুই যে বড় মেদনীপুর কোর্টে?'

'তোর তবে আসুসি। তোকে জামিন করাইতে।' মধু বলে, 'নিতাই মাস্টার পাঠাইছে। হুই দ্যাখ, নির্মল দে, হুই গাছ তলায়।'

গোক্ষুরের চোখ-মুখ নিমেষের মধ্যে বদলে যায়। অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে মাথা। চোখের কোণা চিক চিক করে ওঠে। বলে, 'তোদের আগেই জামিন লিয়া লিছে অন্য লোক। এরা মোকে ভালো রইতে দিবে নি রে মধু।'

'জামিন হয়্যাল?' মধুর চোখে-মুখে সীমাহীন বিস্ময়।

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় গোক্ষুর ভক্তা। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'জামিন হইতে লাগলো একশো-বিশ টাকা। এরপর মাসে একদিন করিয়া দিন পড়বে। তার উকিল আর রাহা খরচ।' বলতে বলতে খোলা আকাশের দিকে তাকায় গোক্ষুর। তাকিয়ে থাকে পলকহীন।

'কিন্তু কে জামিন করাইলো তুমাকে?'

মধু মল্লিকের প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই বটতলায় চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলো বাণেশ্বর ঘোষ! মচমচিয়ে পান চিবোচ্ছিল। হাঁক পড়লো গোক্ষুরকে।

'চল্, চল্। দেরি হয়্যাল। ঘর পেঁছিতে সন্ধ্যা হয়্যাবে।'

গোক্ষুর ভক্তা জ্বলন্ত চোখে তাকায় বাণেশ্বরের দিকে। আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় সে।

বলে, 'তুমাদের পাশ কি দোষ কচ্ছি ঘোষদা? গরীব মানুষকে হয়রানি করিয়া কি লাভ হয় তুমাদ্যার?

'যাস্ শালা! এ যে উল্টা গায় রে।' বাণেশ্বর ঘোষ যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'পুলিশ ডাকাতির কেসে ধরিয়া লিয়াল-অ। চালান কল্ল সদরে। এক গাঁ'র লোক ভাবিয়া, নগদ একশো-বিশ টাকা খচ্চা করিয়া ছাড়ালাম! ফাটকের বাইরে আইসিয়া উল্টা ধমকায় মোকে!'

শুনতে শুনতে রাগে, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে গোক্ষুর ভক্তার মুখ। বলে, 'সাপ হয়্যা খাচ্ছ ঘোষদা, অঝা হয়্যা ঝাড়ছ। তুমাদ্যার মহিমা বুঝা দায়।'

'ঘোর কলি, ঘোর কলি।' বাণেশ্বর ঘোষের দু চোখ উঠে যায় আকাশে, যার তরে চুরি করি, 'সেই বলে চোর। বেলা যায়। যাবি কিনা ক'।'

'পরে যাব মুই।' গোক্ষুর ভাঙা খরখরে গলায় জবাব দেয়, 'তুমি চলিয়া যাও।'

বাণেশ্বর ঘোষ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গোক্ষুরের দিকে।

'বেশ। মুই তেবে চললাম।' ক্রোধে ফুলতে ফুলতে বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'ঘরে গিয়া মোর টাকাটা মিটিয়া দিবি। লচেত কথা খারাপ হবে। বিপদ দেখিয়া, বহু কষ্টে ধার-ধোর করিয়া টাকাটা জোগাড় কচ্ছি। টাকা ফেলিয়া রাখলে মোর চলবে নি।'

থলির মধ্যে আঙুল নাচাতে নাচাতে আর মুখে ভুট কাটতে কাটতে চলে গেল বাণেশ্বর ঘোষ।

পেছনে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে ওকে দেখতে থাকে গোক্ষুর। দু'চোখে তার অক্ষম ক্রোধ আর হতাশা ঝরে ঝরে পড়ে।

।। আঠার ।।

মেজাজটা হঠাৎ খিঁচড়ে গ্যাছে বাণেশ্বর ঘোষের। গোখ্‌রো শালার ব্যবহারটা দেখ দিকি! তিলমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নাই হে! যেউ পাতে খায় সেউ পাতে হাগিয়া দেয়! কত কষ্ট করে, অতখানি পথ উজিয়ে এসে, উকিল ধরে জামিন করানো হলো। তার ফল এই?

বিগড়ে যাওয়া মেজাজখানি নিয়ে বাণেশ্বর ঘোষ এগোতে থাকে দলের জেলা-অফিসের দিকে।

আচমকা সামনে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেল বাণেশ্বর ঘোষ। একখানা রিকশায় চড়ে সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রণব আর গীতালী। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের অপলক দেখতে থাকে বাণেশ্বর।

সেদিন সন্ধ্যেবেলার কথাটা মনে পড়ে যায়। গীতালীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় গণেশ মিদ্যাকে চোখ টিপে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিল বাণেশ্বর। অর্থাৎ প্ল্যান মতো আগিয়া যাও। যেতোও ওরা। প্রণব মাস্টারকে ন্যাড়া করবার জন্য ক্ষুর আর সাবানের টুকরা ট্যাঁকে গুঁজে জনতার মধ্যে হাজির ছিল সুনীল মান্না। চুল, তেল এবং ভুষো কালিও মজুত ছিল। কিন্তু আচমকা হেড্‌মাস্টার জ্যোতিশ্বর রায় এসে পড়ায় সব গুবলেট হয়ে গেল। জ্যোতিশ্বর গিয়েছিলেন মেদিনীপুর। স্কুলের কাজে, ডি. আই অফিসে আর ট্রাইব্যাল অফিসে। হপ্তায় একবার তাঁকে যেতেই হয় মেদিনীপুর। কাজ-কর্ম সেরে বাসে চড়তে বিকেল হয়ে যায়। নারাণগড়ে নেমে এতটা পথ হেঁটে পেঁছিতে প্রায় দিনই রাতটা আটটা-নটা বেজে যায়।

বাণেশ্বর পই পই করে বলেছিল, 'যা কইর্‌বার মাস্টার ফিরিয়া আইস্‌বার আগেই সারিয়া ফেলতে হবে।'

হচ্ছিলও তাই। গীতালীকে সরিয়ে আনার পর খুব দ্রুতগতিতেই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিল গণেশ মিদ্যারা। আচমকা মূর্তিমান রসভঙ্গটি হয়ে হাজির হলেন জ্যোতিশ্বর রায়। তাড়াতাড়ি কাজ মিটে যাওয়ার আগে-ভাগেই ফিরে এসেছেন।

স্কুলের সামনে এত ভীড় দেখে অবাক হয়ে গেলেন জ্যোতিশ্বর। ওঁকে দেখে গণেশ মিদ্যার দল দ্বিগুণ উৎসাহে স্লোগান দিতে লাগলো। এর ওর মুখ থেকে ঘটনাটা শুনলেন সংক্ষেপে।

জ্যোতিশ্বর রায়ের বয়স হয়েছে। এই স্কুলখানি গড়ার লগ্ন থেকেই তিনি পুরো কর্মযজ্ঞের শরীক। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোকরাগুলোর সবাই তাঁর ছাত্র। এই চরম ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার দিনেও জ্যোতিশ্বরবাবুকে কিঞ্চিৎ সমীহ করে এ তল্লাটের ছাত্র-যুবক-অভিভাবক-গ্রামবাসী।

ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল জ্যোতিশ্বরকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিরক্তি আর অপমানে চোখ দুটো অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

স্কুলের অফিস ঘর খুলে একটি বাড়তি তালা নিয়ে এলেন জ্যোতিশ্বর। তালাখানি লাগিয়ে দিলেন প্রণবের ঘরের দরজায়।

বললেন, 'যাও। ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের ডেকে নিয়ে এসো। আমিও একটুখানি চোখে-মুখে জল দিয়ে নিই। তারপর সবাই বসে বিচার করা যাবে প্রণববাবুর। যদি দোষ করে থাকেন, সাজা পাবেন।'

ব্যাপারটা ভারি অপ্রত্যাশিত গণেশদের কাছে। আর বার-দুই হুঙ্কার ছেড়ে দমাদম লাথি মেরে দরজার খিল ভেঙে ফেলবার প্ল্যান ছিল। স্কুলের দরজার খিল, এক লাথিতেই দু'টুকরো। কিন্তু হেড স্যার যে আচমকা দরজায় তালা লাগিয়ে দেবেন সেটা আশাই করে নি ওরা। মুহূর্তের জন্য কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় গণেশের দল।

সহসা মনে বল সঞ্চয় করে গণেশ মিদ্যা। বলে, 'অকে আমাদের হাতে তুলিযা দেন স্যার। অর মাথা কামিয়া, গালে চুন-কালি মাখিয়া, সারা গাঁ— ঘুরাবো আমরা। সারা গাঁ'র সিদ্ধান্ত এটা। কি ভাই—?'

'হ্যাঁ—।' পেছনের জমায়েত চিৎকার করে সায় দেয়।

নিজের ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন জ্যোতিশ্বরবাবু। ঘুরে দাঁড়ান এক লহমায়। গণেশ মিদ্যার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেন। পুরু কাঁচের আড়ালে এক জোড়া দুর্জ্ঞেয় চোখ। দেখেই কেমন অস্বস্তি লাগে গণেশের। চাকরীটা পেলে এই লোকটার অধীনেই কাজ করতে হবে। কথাটা পলকের তরে ঢেউ তুলে যায় মনে।

জ্যোতিশ্বরবাবু থমথমে গলায় বলেন, 'এ দেশে খুনীকেও বিচার করে, তবেই ফাঁসি দেওয়া হয় গণেশ। আমার মাথা গরম করো না। সরো, সরো সবাই এখান থেকে। সরো—।'

পেছনে যতই আস্ফালন করুক, একেবারে মুখোমুখি গিয়া কেতুরিয়া পড়ল গণেশের দল। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে হাহাকার করে

ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ। হায় হায়, শেষ রক্ষাটা কত্তে পাল্লু নি রে ভয়-কাতুরার দল! পিছিয়া আইলু বুড়াটার এক ধমকে। সামলাইতেই যদি না পারিবি, তবে কি লাভ হইলো ছ্যারকা গুয়ে লাঠি আছড়িয়া? হায়, হায়।

শেষ অবধি স্কুলের হল—ঘরেই হ্যাজাক জ্বালিয়ে, চললো বিচার সভা। এলেন অঞ্চল-প্রধান কালাচাঁদ আইচ, পঞ্চাত-সদস্য প্রমথেশ ভূঁঞ্যা, কুলদা-ডাক্তার। এরা সবাই কমিটির মেম্বার। প্রথমেই পুরো ব্যাপারটি শুনে বাণেশ্বর ঘোষের নেতৃত্বে ধিক্কারে ফেটে পড়লো সবাই। জ্যোতিশ্বর রায় ওদের মুখর হতে দিলেন। ওরা থামতেই তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। গীতালী এবং প্রণব দু'জনেই বেলদা স্কুলের ছাত্র। দু'তিন ক্লাস উঁচু নীচুতে পড়তো ওরা। গীতালী তার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে এসে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে যদি একটু গল্প-গুজব করে যায়—।

'গল্প-গুজব নয়—। বিছানায় শুয়্যা জড়া জড়ি কচ্ছিল অরা।' গণেশ মিদ্যা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমরা সক্কলে দেখ্‌ছি।'

গণেশ মিদ্যার দিকে তাকান জ্যোতিশ্বর। পুরু কাচের আড়ালে তাঁর চোখ দুটি বাঙময় হয়ে ওঠে।

বলেন, 'কি করে দেখলে তোমরা? দরজা কি খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল।' গণেশ বীর বিক্রমে বলে, 'ঐ দৃশ্য দেখিয়া আমরা দরজা টানিয়া শিকল তুলিয়া দিছি।'

মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। গণেশ ত লয়। এক্কেরে গোবর-গণেশ। লোকে যা বলে, সত্যি।

জ্যোতিশ্বর রায় অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল সকলের দিকে। 'তোমরা মিছে কথা বলছো বাবারা। ঘরের দরজা খুলে রেখে এসব কাজ করে না কেউ।'

এই নিয়ে কথা চালাচালি চলে। পেছন থেকে কুৎসিত শব্দগুলি বারবার ছুঁড়ে মারা হয় প্রণবের দিকে। স্লোগান চলে অন্ধকার থেকে—'প্রণব রায়, মেটাল ছাড়ো, আভি ছাড়ো জলদি ছাড়ো। চরিত্রহীন লম্পটের কাছে আমাদের ছেলেরা পড়বে নি। কিছুতেই পড়বে নি।'

প্রণব সারাক্ষণ টেবিলে মাথা গুঁজে বসে ছিল।

শেষ অবধি জ্যোতিশ্বর রায় বললেন, 'দেখুন, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রণববাবুকে যদি তাড়াতেই হয়, একটা, দুটো দিন অপেক্ষা করুন। পুরো ব্যাপারটা আমি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি।'

'কি দেখবেন খোঁজ-খবর লিয়া—?' ক্ষেপে ওঠে গণেশের দল, 'কি ক্ষতিটা কল্ল ইস্কুলের, ভাবছেন সেটা? এই খবর সারা দুনিয়া রাষ্ট্র হয়্যাবে। এ স্কুলে কুনো ছাত্রই আইসবে নি দূরের গাঁ থিকে।'

'বিশেষ করিয়া, ছাত্রীরা ত এ ইস্কুলে ভুলেও ভর্তি হবে নি!' চপলাকান্ত মুখ খোলে এতক্ষণে, 'ছাত্রীদের গার্জিয়ানরা তো, প্রণববাবু ইস্কুলে রইলে,

কাল থিকে পাঠাবেই নি অদের মেয়েদের। কি হে— ?'

একটা অস্ফুট রোল ওঠে পেছন থেকে। বাগেশ্বর ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে চপলাকান্তকে। কথা বলছে গণেশ মিদ্যা, তোর অত মাতব্বরি কেন। চুপ মার্, মাথা মোটা, বুদ্দু। সব জায়গায় মেনেজারী চলে? জ্যোতিশ্বর রায়কে উদ্দেশ্য করে বলে, 'মাস্টার মশায়, আপনি এই ইস্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা। এই ইস্কুলের প্রতি আপনার দরদ, কারো চাইতেই কম নয়। কিন্তু কয়েকটি কথা ভাবিযা দেখুন, ইস্কুলটার যদি একবার বদনাম হয়্যা যায় তো, ছাত্র আসা বন্ধ হয়্যাবে একেরে। কাল থিকে যদি ছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে, কি হবে বলুন দেখি? তাছাড়া প্রণববাবুর কথাটাও ভাবিয়া দেখুন। আমরা যদি একমত হয়্যা তাঁকে রাখতে রাজি হই ও, উনি কি করিয়া রইবেন গাঁয়ে? কি করিয়া পড়াইবেন ছাত্রীদের? রাস্তায় বারিলেই টিটকারি জুড়বে লোক। বলা যায় না, একলা পাইলে হেকেলও করিয়া দিতে পারে। এত সবের পর তিনিও মাথা উঁচা করিয়া আর রইতে পারবিন্ নি, ছাত্র-ছাত্রীরাও অঁকে আর মানবে নি। তার চাইতে ভাবিয়া দেখুন, অঁনার বইস কম, ছাত্র হিসাবে ভালো, একটু চেষ্টা কল্লে এক-দু'মাসের মধ্যে আর একটা ইস্কুলে চাকরি পায়াবেন তিনি। আমরা বরং তাঁকে তিন মাসের মাইনা অগ্রিম দিয়া দুবো।'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রণব। বলে, 'চাই না আমার তিনমাসের মাইনে। স্যার, আমি চলে যাচ্ছি। আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে। এসব নোংরামী আমার সহ্য হচ্ছে না।'

লম্বা লম্বা পা' ফেলে প্রণব গেল তার দোতালার ঘরে। জামাকাপড়-গুলো যত জলদি সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে নেমে এলো। ততক্ষণে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে সবাই।

থমথম করছিল জ্যোতিশ্বর রায়ের মুখ। বললেন, 'একটু সময় নিয়ে সিদ্ধান্তটা নিলে ভালো করতে প্রণব।'

'না, স্যার।' চোখে-মুখে তীব্র বিরক্তি ফুটিয়ে বলে প্রণব, 'যত সময় নেবো, ততই বেড়ে যাবে নোংরামী! তাছাড়া, বাগেশ্বরবাবুর কথাটাও তো ঠিক। আর আমি কেমন করে রাস্তায় বেরোবো, ক্লাসে ঢুকবো, বকা-ঝকা করবো ছেলে-মেয়েদের? কোন্ মুখে তাদের ভালো-ভালো উপদেশ দোব?' বলতে বলতে প্রণবের চোখ দুটি জলে ভরে যায়।

গণ্শার দল তখন ভুলভুল করিয়া প্রণব মাস্টারের নাটক দেখছে। আরে শালারা, দেখু কি? এই বেলায় রেজিগ্‌নিশানটা লিয়া লে। একবার ফিটকিয়া গেলে আর পাবি? ভিড়ের মধ্যে এক্ফাঁকে কোন গতিকে কথাটা গণ্শার কানে ফেলতে পারলো বাগেশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে রব তুললো গোঁয়ারের দল। প্রণব মাস্টার তখন এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। তারই মধ্যে গুটি তিন-চার সাদা কাগজে খস খস করে সই করে এগিয়ে দিল জ্যোতিশ্বরের দিকে।

'এই দিয়ে গেলাম সই করা কাগজ। যা খুশি লিখে নিও।'

ব্যস্, ব্যস্। থাম্, থাম্ দেখি তোরা। বাণেশ্বর প্রচণ্ড ধমক মারে গণশাদের। লোকটা কেমন হাপুস-নয়নে কাঁদছে। আর বায়না ধরিস নি বাপ। ওকে শান্তিতে বিদায় লিতে দে। হুজোর হউ কিছো দিন শিক্ষা তো দিছন এই গাঁয়ের ছেইলা-পুইলাদের। চিন্তা করবন্ নি, আমরা আপনার তিন মাসের মাইনা মানি-অর্ডার করিয়া পাঠিয়া দুবো। অত অমানুষ আমরা নই। মুখে যা বলি, কাজে তাই করি।

বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু পরে খোঁজ-খবর নিয়ে বাণেশ্বর দেখেছে, রাতে শ্যাম চক্রবর্তীর ঘরে ছিল প্রণব-মাস্টার। ভোর বেলায় গেছে। যারা দেখেছে তারা বলে, স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বল-খেলার মাঠের ওধারে তেঁতুল গাছের তলায় চুপচাপ বসেছিল প্রণব মাস্টার। শ্যাম চক্রবর্তী প্রথম থেকেই খেয়াল রাখছিল, মাস্টার কোথায় যায় এতো রাতে! সে প্রণবকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেছে নিজের ঘরে। শাকে-ভাতে খাইয়েছে। ভোর বেলায় ও আর মধু-মল্লিক সঙ্গে গিয়ে নারাণগড়ে তুলে দিয়ে এসেছে বাসে।

সাত দিনের মধ্যেই কমিটির জরুরি মিটিং ডেকে প্রণব রায়ের রেজিগ্‌নেশন লেটার সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় এবং ভ্যাকেন্সীটি অবিলম্বে পূরণ করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কাগজপত্র বানিয়ে নিয়ে বাণেশ্বর স্বহস্তে দিয়ে এসেছে ডি-আই অফিসে। দলের সদর-অফিসে গিয়ে রমণীমোহনকে বিশেষ ভাবে বলে এসেছে। যেখানে যে পুজো প্রয়োজন, চড়ানো সারা। সবই চলছে ঠিক ঠিক। হিসেব মতই। কিন্তু আজ জেলা-সদরে প্রণব আর গীতালীকে একই রিকশায় দেখে ভুরু জোড়া অজান্তে কুঁচকে ওঠে বাণেশ্বরের। মনে হলো, কোর্টের দিকেই যাচ্ছে। কি দুরভিসন্ধি নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? গীতালীর বড় মামার একটি শালা আছে। সদর কোর্টের উকিল। সে ওদের এ ব্যাপারে নাচাচ্ছে কিনা ভগবানকে মালুম।

একটা মৃদু দুর্ভাবনা নিয়ে বাণেশ্বর ঘোষ হাজির হলেন জেলা-অফিসে। মেট্যাল স্কুলের মাস্টার তাড়ানোর প্রথম পর্বটা চুকেছে ভালোয় ভালোয়। এখন দ্বিতীয় পর্বটা উত্‌রোলেই হয়।

প্রণবের জায়গায় আর একটি মাস্টার নেওয়ার পারমিশনটা ডি-আই অফিস থেকে বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে। ডি-আই অফিসে কাজটা এগোচ্ছে। আজও ঐ অফিসে কিঞ্চিৎ পুজো চড়িয়ে এসেছে বাণেশ্বর। মনে হয় মাস-খানেকের মধ্যে বেরিয়ে যাবে অর্ডার। তবুও, ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা নিশ্চিন্ত হতেই পার্টি-অফিসে আসা।

জেলা-অফিসে এখন লোকজন নেই বললেই চলে। রমণীমোহন বসে রয়েছে একেবারে কোণার ঘরে। জনা কয়েক লোকের সঙ্গে কি সব বলছে। প্রমোদ দত্তর চেয়ারখানি ফাঁকা।

এই অফিসটা কত জমজমাট ছিল আগে। বাণেশ্বর তো দলে নতুনটি নয়। আজীবন সে এই দলের বিশ্বস্ত সমর্থক। একটা সময় ছিল, যখন নারাণগড় থানার পুরো সংগঠনটাই পরিচালনা করতো বাণেশ্বরের বাপ দুয়ারী ঘোষ।

দলের প্রায় সব রাঘব-বোয়ালদের সঙ্গে ছিল ওর ওঠা-বসা। দুয়ারীর অন্তে বাণেশ্বর হাল ধরে। সাতষট্টির আগে অবধি সে ছিল নারাণগড় থানার মুকুটহীন রাজা। সারা রাজ্যের নেতারা একডাকে চিনতো বাণেশ্বর ঘোষকে।

তারপর সব উল্টেপাল্টে গেল। দলে ঢুকলো বহুত বেনো জল। এখন 'নেপো'রা সব দই মারছে এন্তার। তবুও, প্রবীণ কর্মী হিসেবে জেলা-কমিটির কাছে বাণেশ্বর ঘোষের অন্য মর্যাদা। জেলা-অফিসে এলে এখনো পুরোনো দিনের খাতির-যত্নের ছিটে-ফোঁটা পায়।

বাণেশ্বরকে দেখে রমণীমোহন হাসে।

বলে, 'আসুন, বাণেশ্বরদা, অনেকদিন বাদে এলেন।'

বাণেশ্বর সামনের চেয়ারে বসে। মিষ্টি করে হাসে। পুরো ব্যাপারটা রমণীমোহনকে খুলে বলে। শেষ মেষ রমণীমোহনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, 'এ কাজটা তোমাকে করে দিতেই হবে ভাই। এমনিতেই ত' গাঁয়ের ইস্কুল। গাধার তুল্য ছাত্র সব। পান্তা-আমানি খায়া ইস্কুলে আইসে। তার উপর মাস্টার না পাইলে, ইস্কুলে আসা-না-আসা সমান হয়্যারে অদের।'

রমণীমোহন মন দিয়ে শুনছিল বাণেশ্বরের কথা। বললো, 'আমি অবশ্যই দেখবো। আপনি সব পার্টি'কুলার্স' দিয়ে যান। কিন্তু এবারে কাজ-কর্ম শুরু করতে হবে দাদা। 'ভোট বোধ হয় ঠিক সময়ে হবেই।'

বাণেশ্বর হাসে। বলে, 'এখন ছেলা-ছোকরারা পার্টি'র হাল ধচ্ছে। আমাদের মতন বুড়া-থুড়াদের আর দরকার কি?'

'এমন কথা বলবেন না!' রমণীমোহনের বিনয়ী গলা, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।' তেলতেলে হাসি হাসে রমণীমোহন।

'সিটা কি তুমরা বিশ্বাস কর?' বাণেশ্বরের গলায় চাপা থাকে না ক্ষোভ, 'তাহলে কি আর দুম করিয়া থানা-প্রেসিডেন্টের পদটা থিকে গলা ধাক্কা দিয়া বার করিয়া দাও?'

রমণীমোহন হাসে। বলে, 'দুঃখু করবেন না দাদা। ওর চেয়ে ঢের বড় পুরস্কার আপনার কপালে নাচছে।'

'কি রকম?' বাণেশ্বর কৌতূহলী চোখে তাকায়।

রহস্যময় হাসিখানা ঝুলে ছিল রমণীমোহনের ঠোঁটে।

বলে, 'এমনও হতে পারে, বড় পুরস্কার একটা দেওয়া হবে বলেই আপনাকে তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হলো প্রেসিডেন্টের পদ থেকে।'

'তুমি কথাটা খুলিয়া কইব? নাকি এমনি ঠারে-ঠুরে চলবে তুমার কথা?' বাণেশ্বর অস্থির হয়ে উঠেছে মনে মনে।

হাতের কলমখানা টেবিলের ওপর ঠক করে রাখে রমণীমোহন। বাণেশ্বরের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকায়।

বলে, 'ভোট আসছে না?'

'হাঁ। ঠিক টাইমে ভোট হইলে আর মাস কয় বাকি।'

মুখের হাসিখানাকে আরো অর্থপূর্ণ করে রমণীমোহন বলে, 'আজ আর এর বেশি কিছু বলবো না।'

মনে মনে রহস্যখানা পরিপাক করবার চেষ্টা করে বাণেশ্বর। তাতে ধোঁয়াশা বাড়ে। একসময় হাল ছেড়ে দেয় সে।

বলে, 'প্রমোদবাবু নাই?'

'উঁহু।' মুখ তোলে রমণীমোহন, 'সবং গেছেন। ফিরতে সন্ধ্যা। আচ্ছা, আপনাদের সেই গৃহহীনদের ঘর তৈরীর ব্যাপারটা কি হল?'

'কেন? গন্ডগোল হয়েছে কিছু?'

ভুরু কুঁচকে তাকায় বাণেশ্বর। 'গন্ডগোল মানে, আমাদের কাছে যা রিপোর্ট, আপনাদের ব্লকে কাজটা বড্ড স্লো হচ্ছে।'

'ঐ যে—।' বাণেশ্বর জুতসই প্রসঙ্গ পেয়ে নড়েচড়ে বসে, 'এক অপদার্থ বিডিওকে বসিয়েছ তুমরা। কর্মবীর! যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র যত ঘুরায়, তারচেয়ে পাদে বেশি। এক জমিনের জন্য প্রপোজালই পাঠাচ্ছে আজ ছ'মাস। আসলে গরীবের তরে ঘর তৈরী করার চাইতে আমাদের পাছায় হুড়কা দিবার উৎসাহটাই বেশি তার। তাও কিছো ঘর হয়েছে। একটা কথা শুনলাম, জান কিছো?' মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করার ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে বাণেশ্বর।

'কি?' কলম থামায় রমণীমোহন।

'বেলদার বিডিও'র নাকি ভিজিলেন্স হইচে?'

'কে বললো?'

'শুনলাম কানাঘুষায়। সাত নম্বর অঞ্চলের গৃহহীনদের ঘর বানাতে গিয়া নাকি বহুত টাকা মারিয়া দিছে?'

'আমরা তো শুনি নি। খোঁজ নেবো।'

'হাঁ। টুকে খোঁজ লিবে ত। সামনের হপ্তায় তো ফের আসবো—।' উঠে দাঁড়ায় বাণেশ্বর।

বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে। গাছে-পালায় দ্রুত শুষে নিচ্ছে রোদ। ঘর ফিরতে সামনে আঁধার। বাণেশ্বর আর অপেক্ষা করে না। পার্টি-অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ঐ প্রণব-গীতালীর ব্যাপারটা কাঁটার মত বিঁধতে থাকে মনে।

॥ উনিশ ॥

দুপুর নাগাদ গোক্ষুর এলো মুরলী কোটালের বাড়িতে।

পিত্তের যে ওষুধটা দিয়েছিল, মুরলী ওতে উপকার পেলো কিনা, একটিবার খোঁজ নেওয়া দরকার। আসলে, সদর কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে ফেরার পর আর মুরলীর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। গোক্ষুরের মনটা সেই কারণে বড়ই আনচান।

পঞ্চমী ঘরে নেই। সে গেছে তার মাসীর বাড়ি খেজুরকুটিতে। খেজুর-কুটির পাশের গ্রাম সাঁতরাপুরে। সেখানে রাসের মেলা বসেছে। উঁচকা-পড়্যার ডাঙায়। এ বছর সেই উপলক্ষে 'বারোয়ারি'-ও হচ্ছে। মাসি নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেছে পঞ্চমীকে।

গোক্ষুর আর দাঁড়ায় না। একথা সে কথার পর বেরিয়ে আসে মুরলী কোটালের বাড়ি থেকে। পঞ্চমীর জন্য ছটফট করছে মন। কতদিন যেন দেখেনি ওকে। সাত-পাঁচ ভেবে গোক্ষুর ভর দুপুরে রওনা দিল খেজুর-কুটির উদ্দেশ্যে।

মনটা ভালো নেই গোক্ষুরের। হাজার দিগদারি সইতে হচ্ছে ইদানিং। থানা থেকে ঘন ঘন তলব আসছে! বাগেশ্বর ঘোষও চাপ দিচ্ছে বেজায়।

পঞ্চমীর কাছে গেলে ইদানিং মনটা প্রলেপ পায়। গোক্ষুর সেই কারণেই খালি উপলক্ষ্য খোঁজে।

খেজুর-কুটির লোধাপাড়ায় যখন পেঁছুলো গোক্ষুর, তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে! মাসীর ঘরে নেই পঞ্চমী। সে গেছে উচঁকাপড়্যার ডাঙায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই জমে উঠেছে মেলা। মেলা দেখতে এসে পঞ্চমী কেনই বা বসে থাকবে মাসির দোরে। গোক্ষুর রওনা দিল মেলার দিকে। দাসেদের ধান-কুটাই কলকে ডাইনে রেখে, বসন্ধরী দীঘির পাড় বরাবর হাঁটতে হাঁটতে সে যখন পেঁছুলো, মেলা তখন জমজমাট!

মেলার টান, অন্য টান। মানুষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ। গোক্ষুর হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দিল।

পুরো ডাঙা জুড়ে কয়েকশো মানুষের জমায়েত। পাঁপড়-তেলেভাজা, চা-মিষ্টি, পান-বিড়ি-সিগারেট মিলে গোটা দশ-বারো দোকান। রথী জানার মনোহারী দোকানও এসেছে। ডাঙার মাঝামাঝি জায়গায় বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে মানুষ। ঝুঁড়িখেলা পুরোদমে চলছে। সারবন্দী খড়ের চালায় হরেক ঠাকুর-দেবতার মূর্তি। মেলার পশ্চিম দিকটাতেই বসেছে 'বারোয়ারি।'

ঐখানেই পঞ্চমীকে পাওয়া গেল। অহল্যার পাষাণ হয়ে যাওয়া মূর্তি-খানির সামনে পাষাণ হয়ে গেছে পঞ্চমী। যেন হুঁশ নেই তার! পলকহীন চোখ অহল্যার ওপর! গোক্ষুরকে দেখতেই পেলো না।

একখানা লাল টকটকে শাড়ী পরেছে পঞ্চমী। গায়ে পরেছে লাল-ব্লাউজ। গলায় পেতলের হার। কানে পেতলের দুল। হাতে লাল রঙের কাঁচের চুড়ি। পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। লাল ফিতে দিয়ে ফুল বানিয়েছে খোঁপার দু'ধারে। একেবারে অন্যরকম লাগছে পঞ্চমীকে। নতুন নতুন। গোক্ষুর চোখ ফেরাতে পারে না। মনের মধ্যে পাল্টি খেতে থাকে রুপোলী ফলুই।

মরদ মারা গেছে, এই কারণে পঞ্চমীর সাদা থানই পরা উচিত ছিল। কিন্তু মুরলী প্রথম থেকেই বারণ করে দিয়েছে। স্বামীর ঘরই করলো নি, তার সধবা বিধবা! পঞ্চমী সব পরবে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গোক্ষুর। পঞ্চমীর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালো ওর খোলা পিঠে। মৃদু চাপ দিল।

বেতসলতার মত সপাং করে পিছু ফিরলো পঞ্চমী। এবং গোক্ষুরকে আচানক দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। দু'চোখ দিয়ে ছড়িয়ে ছিল নীলাভ দ্যুতি। নিজের চোখ দুটিঝে যেন কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারছে না পঞ্চমী। এ কি কাণ্ড! মানুষটা হঠাৎ কি করিয়া চলিয়া আইল ইখেনে!

মাসীর বাড়ির চারপাশের পড়শীরা ঘিরে রয়েছে পঞ্চমীকে। ওদের সঙ্গেই মেলা দেখতে এসেছে ও। বেশী ছটফট করলে সবাইয়ের নজরে পড়ে যেতে পারে। মেয়েদের কৌতূহল বড় বেয়াড়া। চোখের ইঙ্গিতে চলে যেতে বললো গোক্ষুরকে। আশ্বাসও দিল, একটু বাদে বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে গোক্ষুরের পাশটিতে আসবে। গোক্ষুর পিছু হটে। অল্প তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়।

খানিক বাদে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পঞ্চমী। পায়ে পায়ে চলে এলো গোক্ষুরের কাছে। মনের মধ্যে খুশীর তুফান উঠেছে। চোখ-মুখ, শরীরের তাবত ইন্দ্রিয় দিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরোতে চাইছে। বাধা মানছে না কিছুতেই।

বললো, 'তুমি!'

লাজুক মুখে তাকায় গোক্ষুর, 'চলিয়া আইলাম।'

'কি করিয়া জানলে, মুই ইখেনে আসসি?' পঞ্চমীর ডাগর চোখদুটি আরো ডাগর হয়ে ওঠে।

'তোর পাশ আসসি নাকি মুই? মেলা দেখতে আসসি।'

'ফপ্‌রা কথা ছাড় দেখি।' দু'চোখে কপট রোষ ফোটায় পঞ্চমী, 'কি করিয়া জানলে বল?'

এবার হেসে ফেলে গোক্ষুর, 'তোর ঘর গেছলাম যে। শুনলাম, তুই মাসির দোর আসসু, রাসের মেলা দেখতে।'

পঞ্চমীর বুকের মধ্যে অচেনা পাখির শিস। বলে, 'বলিহারি তুমার গোইন্দাগিরি।' প্রাণের খুশী প্রাণপণে চাপতে চাপতে চোখ মটকায় পঞ্চমী।

গোক্ষুর হাসে। নিজের পেশা নিয়ে সে এখন রঙ-তামাশা করতে পারে।

নীচু গলায় বলে, 'চোরের চাইতে ভালো গোইন্দা আর নাই ক এ দুনিয়ায়?'

এই 'চোর' কথাটা কানে ঠেকলো পঞ্চমীর। কথাটা ইদানিং সইতে পারে না সে।

বলে, 'খালি কথায় কথায় নিজেকে 'চোর-চোর' কইব নি ত। শুনিয়া বড় রাগ হয়।'

পঞ্চমীর হাতে কাগজে মোড়া একটি চিজ। গোক্ষুর শুধোয়, 'এটা কি?'

'এটা?' বস্তুটির দিকে আড়চোখে তাকায় পঞ্চমী। রাঙা হয়ে ওঠে মুখ

খানি ; ঠোঁটজোড়া আবেগে কাঁপে। বলে, 'চল। বাইরে চল। দেখাচ্ছি তুমাকে।'

গোক্ষুরও তাই চাইছিল। একটুখানি নিরিবিলি এবং তৎসহ পঞ্চমীকে। ভর-ভরাট মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব কথা হয় না। কোনও কথাই চলে না।

পঞ্চমী বলে, 'চল, ষষ্ঠীপুকুরের আড়ায় যাই।'

পঞ্চমীই আগে আগে চলে। ওকে অনুসরণ করে গোক্ষুর।

অল্প দূরেই ষষ্ঠীপুকুর। তার পাড়ে গাছ-গাছালি। দু'জনে গিয়ে দাঁড়ায় সেখানে। সাঁঝ-পহরে জলের রঙ কালচে। পশ্চিম পাড়ের আকাশ এখনো নতুন টিনের মত চকচকে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে অগণিত মানুষের মিছিল। সেজেগুজে সবাই মেলা দেখতে চলেছে।

গোক্ষুর এক দৃষ্টিতে দেখছে পঞ্চমীকে। সত্যি সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কপালের কাচ পোকা টিপখানি এই সাঁঝবেলায় ভারি রহস্যময়। যেন তৃতীয় নয়ন। গোক্ষুর চোখ ফেরাতে পারে না।

পঞ্চমী বুঝি লজ্জা পায়। বলে, 'ভুল ভুল করিয়া কি দেখছো অমন?'

গোক্ষুর চোখ নামিয়ে নেয়। হাসে।

বলে, 'দেখি এবার, কি কিনছু মেলায়। দেখাবি নি?'

এবার পঞ্চমীই লজ্জা পায়। একসময় বাধ্য হয়ে কাগজখানি খুলে বস্তুটি তুলে ধরে গোক্ষুরের চোখের সমুখে। টিনের পাতে মোড়া একটি ছোট আয়না।

গোক্ষুর অবাক চোখে পঞ্চমীকে দেখতে থাকে।

বলে, 'আয়না কি হবে?'

পঞ্চমী ঠোঁটের ফাঁকে হাসে। চোখ নাবিয়ে লজ্জা লুকোয়। মৃদু গলায় বলে, 'আয়না লিয়া কি করে লোকে?'

অনেকক্ষণ বসে বসে একান্তে গল্প করে ওরা। সন্ধ্যা উতরিয়ে রাত হয়। ষষ্ঠী পুকুরের জল নিকষ কালো হয়ে ওঠে। আকাশে তারারা ফুলের মত ফুটে ওঠে। একসময় সারা গাছখানি ফুলে ফুলে ভরে যায়।

একসময় উঠে দাঁড়ায় গোক্ষুর।

বলে, 'চল্, মেলায় ঘুরি।'

দু'জনে ফের ফিরে আসে মেলায়। খানিকক্ষণ পাশাপাশি হেঁটে মেলা দেখে। 'বারোয়ারী'র মূর্তিগুলো দেখে হেসে কুটি কুটি হয় পঞ্চমী। ঠাকুর-দেবতার কাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক উপদেশমূলক মূর্তিও আছে। বকাসুর বধ, সীতার পাতাল প্রবেশ, দুঃশাসনের রক্ত পান ইত্যাদিও যেমন আছে, তেমনি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মাতালের মুখে প্রস্রাবরত কুকুরের মূর্তিও। অবাক হয়ে দেখতে থাকে পঞ্চমী। বিস্ময়ে চোখের পাতনি পড়ে না। মাতালের দুরবস্থা দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে সে। এক সময় একেবারে শেষ মূর্তির সমুখে এসে দাঁড়ায় ওরা। গ্রামের মধ্যস্থলে, বটতলায়, চোরের সাজা চলছে। উত্তেজিত গ্রামের মানুষ। তাদের চোখে রোষ। একটা চোরকে বেতগাছা নিয়ে মারছে একজন। আর একটি চোরকে ঝুলিয়ে রেখেছে

গাছের ডালে। চোরের বউ লুটিয়ে পড়েছে মোড়লের পায়ে।

দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে যায় দু'জনে। পায়ে পায়ে চলে আসে ওখান ওখান থেকে।

গোক্ষুরের কাছে পয়সা নেই বেশী। ট্যাঁক থেকে কিছু খুচরো পয়সা বের করে সে। ঐ দিয়ে ফুলারী কিনে দু'জনে খায় তারিয়ে তারিয়ে।

মেলার মধ্যে লক্ষ্যহীন দু'চার পাক দেওয়ার পর একসময় গোক্ষুর বলে, 'মুই এবার চলি। অনেকটা রাস্তা। ঘর পেঁছুতে রাত হয়্যাবে।'

সহসা কালো হয়ে আসে পঞ্চমীর মুখ, 'তুমি চলিয়া যাব? এই রাতের বেলায়?'

গোক্ষুর হাসে, 'গোক্ষুর ভক্তার পাশ ফের রাতের বেলা কি রে? রাতই ত' তার দিন।'

সে কথায় গম্ভীর হয়ে যায় পঞ্চমী। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মুখ। বাতিগুলো ঝুপ ঝুপ নিভে যায়। ব্যাকুল গলায় বলে, 'থাকিয়া যাও। মোর মাউসীর ঘরে। মাউসী বড় ভালো। তুমার কথা তাকে কইছি।'

গোক্ষুর ইতস্তত করে। পঞ্চমী ব্যাকুল চোখ চেয়ে থাক শুধু।

শেষ অবধি পঞ্চমীর পীড়াপীড়িতে থেকে যাওয়াই স্থির করে সে। পঞ্চমীর চোখের আলো দুটি পুনরায় জ্বলে ওঠে। মন যেন নেচে ওঠে পুলকে।

দু'জনে হাটা দেয় খেজুর কুটির দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে মৃদু গলায় শুধোয় পঞ্চমী, 'তুমি উসব কাজ ছাড় নি! এখনতক?'

গোক্ষুর অস্বস্তি বোধ করে।

বলে, 'বাপ-চৌদ্দ পুরুষের পেশা। কইলেই কি ছাড়া যায়?'

পঞ্চমী গম্ভীর হয়ে যায়। চুপটি করে হাঁটতে থাকে সে।

গতকাল পূর্ণিমা গেছে। এখন আকাশে গোল চাঁদ। জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী! নির্জন মেঠো রাস্তা ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে এক জোড়া পুরুষ-রমণী।

বাঁশ ঝাড়ে হাওয়া বয়। দুলতে থাকে কঞ্চিগুলো। রাতচরা প্রাণীগুলো ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবিরাম। নিঝুম রাস্তায় ওদের হাঁটা চলার শব্দ ভেসে আসে। মনে হয়, যেন নিজের বুকের শব্দ।

দাসেদের মেসিনঘর পেরোলেই আর ঘর দোর নেই। খাঁ-খাঁ ফাঁকা পথ। হাঁটতে হাঁটতে ঐ নির্জন রাস্তায় সহসা গোক্ষুরের হাত দুটো সপাটে জড়িয়ে ধরে পঞ্চমী। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে সে।

বলে, 'তুমার দু'টি পায় পড়ি। এ গু'খাবা বিদ্যা তুমি ছাড়। নিতাই কাকা সেদিন তেবে কি বুঝালো তুমাকে?'

পঞ্চমীর নরম হাত দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে গোক্ষুর। মুখ দিয়ে বাক্যি বেরোয় না। বিড় বিড় করে বলে, 'লখবার চুরি ছাড়লে চলে?'

'কে কইলো চলে নি?' পঞ্চমী নিজের হাত দুটি টেনে নেয়, 'বহু লখবাই

'চোর' করে না। কাকড়ারা শুধু-মুদু বদনাম দেয়। শুনে, শুনিয়া লও—' পঞ্চমীর গলা সহসা কঠিন হয়ে ওঠে, 'চোরকে ব্যা হইয়া, মোর কি দশা হইচে, দেখতে পাচ্ছ তুমি। দেখতে পাচ্ছে দুনিয়ার লোক। আর, মুই তো লরক-যন্ত্রণা ভোগ কাচ্ছি দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে। তুমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলিয়া দিই মুই। জীবন থাইক্তে আর চোরের হাত ধরবো নি।'

বলতে বলতে সহসা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে পঞ্চমী। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কেঁদে চলে সে।

গোক্ষুর বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে। কি বলবে, কি করবে, ভেবে পায় না সে।

নিজের হাতখানি আবার গোক্ষুরের হাতে রাখে পঞ্চমী।

বলে, 'তুমি মোর গা ছুঁইয়া কিরা কাড়, জীবনে আর কুনোদিনো 'চোর' করবে নি। মুই তুমাকে জঙ্গলের কাঠ-পাতা বিকিয়া খাবাবো। বল তুমি, ও পথে আর হাঁটবে নি জীবন থাকতে। বল, বল—।' বলতে বলতে সহসা প্রবল আবেগে গোক্ষুরকে জড়িয়ে ধরে পঞ্চমী। তার নরম পুষ্ট শরীরখানি গোক্ষুরের শরীরের সঙ্গে লেপটে যেতে থাকে ক্রমশ।

গোক্ষুরের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-ঝলক। শিরায়-শিরায় রক্তে-রক্তে দাপন শুরু হয়। একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। সারা শরীর অসাড় হয়ে আসে। পঞ্চমীর শরীরের, মাথার, চুলের গন্ধ তার নাকের ভেতর দিয়ে চারিয়ে যেতে থাকে সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'ছাড়্।'

'না।' পঞ্চমী আরো শক্ত করে ধরে গোক্ষুরকে, 'আগে তুমি কিরা কাড়।'

গোক্ষুরের শরীরের অন্তর্গত অস্থি-মজ্জা-মাংস গলতে শুরু করেছে। মোমের মত গলে গলে পড়ছে ঘামের রূপ ধরে। গলগলিয়ে ঘামছে গোক্ষুর। কণ্ঠা দিয়ে রা' বেরোতে চাইছে না।

কোনও মতে সে উচ্চারণ করে, গাঢ় উচ্চারণ, 'কিরা কাড়লাম। আর করবো নি। এ জীবন থাইক্তে নয়।'

পঞ্চমী মুখ তোলে ধীরে ধীরে। এখনো গালে জলের ধারা। তার মধ্যেও সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি। রাতের আলো-আঁধারিতে ঐ মুখখানি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় গোক্ষুর।

ঠাট্টা করে বলে, 'রোদ হচ্ছে, জল হচ্ছে / শিয়াল-শিয়ালীর ব্যা হচ্ছে।'

পঞ্চমী হাসতে আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে চোখ। আবার হাঁটতে শুরু করে দু'জনে।

সন্ধ্যা পহরেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে মাসী। কাছিমের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে চাটাইয়ের ওপর এলিয়ে পড়লো গোক্ষুর। চৌকাঠে লম্ফটা বসিয়ে গোক্ষুরের পাশটি ঘেঁসে বসলো পঞ্চমী। ঘুম আসছে না তার। মনের মধ্যে অবিরাম তাঁত বোনা চলছে। তাতে কত রঙ, কত নকশা···কত সোনালী রূপালী বুটি···। আত্মহারা হয়ে ওঠে পঞ্চমী।

গোক্ষুরও ঘুমোয় নি। পঞ্চমীর সাড়া পেয়ে চোখ খোলে সে।

বলে, 'কি রে? উঠিয়া আইলি যে বড়?'

পঞ্চমী জবাব দেয় না। বসে থাকে ঠায়।

গোক্ষুর ওর হাতখানি টেনে নেয় নিঃশব্দে। বাধা দেয় না পঞ্চমী। পঞ্চমীর হাতখানি বহুক্ষণ থাকে গোক্ষুরের হাতের মধ্যে। এক সময় চাপা গলায় কথাবার্তা জুড়ে ওরা।

গোক্ষুর বলে, 'নিতাই মাস্টার লিয়া গেছুল বিডিও'র পাশ।'

'বিডিও সাহাবের ঘরে?' পঞ্চমী হতবাক হয়ে যায়।

'হঁ। কি কইব, অতবড় মানুষ, টুকে অহংকার নাই মনে।'

পঞ্চমীর হতচকিত ভাবখানা কাটেনি তখনো।

গোক্ষুরের নজর এড়ায় না তা। হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে নিজেও। আজও তা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

নিতাই মাস্টারের কথা মত বেলদার সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়েছিল গোক্ষুর। রাত তখন আন্দাজ ন'টা। নিতাই মাস্টার ঠিক সময়ে এলো।

চাপা গলায় বললো, 'চল্।'

নিতাই মাস্টার হাঁটতে শুরু করে। পিছু পিছু ওকে অনুসরণ করে গোক্ষুর। পাঁচ রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ে ওরা।

রাস্তায় কোনও আলো নেই। দু'পাশের ঘরগুলো থেকে আলো ছিটকে এসে পড়েছে। নিতাই মাস্টার হাঁটছিল আলো-পড়া জায়গাগুলো এড়িয়ে। দেখাদেখি গোক্ষুরও তাই করলো।

খানিক বাদে যে বাড়িখানার সামনে দাঁড়ালো নিতাই মাস্টার, তা দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল গোক্ষুর। এ কার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে নিতাই মাস্টার! এ বাড়ি তো গোক্ষুর ভক্তা বিলক্ষণ চেনে। এ হল বিডিও সাহেবের কোয়ার্টার্স। গেল বছর এক রাতে এই কোয়ার্টার্সে হানা দিয়েছিল গোক্ষুর। শেষ অবধি সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কিন্তু নিতাই মাস্টার কেন এসেছে, এই রাতের বেলায়, বিডিও সাহেবের কোয়ার্টার্সে! কোন্ সাহসে! ফেরারী আসামী সে। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

গোক্ষুর ইতস্তত করছিল। সরকারী অপিসারের ঘরে, দাগী আসামী সে, যাওয়াটা কি ঠিক হবে? কোনও বিপদ-আপদ হবে না তো?

নিতাই মাস্টার যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়। ইঙ্গিতে ডাকে গোক্ষুরকে।

অনিচ্ছা সহকারে হাঁটতে শুরু করে গোক্ষুর। বুকখানা দুরু দুরু করতে থাকে এক অজানা আশঙ্কায়।

গেট ঠেলে নিঃশব্দে উঠোনে ঢোকে দুজনে। সদর দরজায় কড়া নাড়ে ধীরে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন এক সাহেবতুল্য মানুষ। নিতাই মাস্টার নমস্কার করে।

'একি নিতাইবাবু যে! এতো রাতে? আসুন।' বিডিও সাহেব সরে

দাঁড়ান একপাশে।

সড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে যায় দুজনে।

নিতাই মাস্টার চেয়ারে বসে। গোক্ষুর সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে থাকে পাশটিতে।

নিতাই মাস্টার বলে, 'এ হোল গোক্ষুর ভক্তা। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম স্যার।'

বিডিও সাহেব অদ্ভুত চোখে তাকালেন গোক্ষুরের দিকে।

বললেন, 'বসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

গোক্ষুর মরমে মরে যায়। কিছুতেই বসে না চেয়ারে।

নিতাই মাস্টার প্রায় জোর করে বসায় ওকে।

বলে, 'লোকটাকে ফেরাতে চাইছি স্যার। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।'

বিডিও সাহেবের চোখের কোণে এক রহস্যময় হাসি। বললেন, 'কি ধরনের সাহায্য চাইছেন?'

'ওকে স্যার খাস-জমি দিন একটু। আর—, থানা বড় হ্যারাস করছে স্যার ওকে। ও আজ মাস তিন-চার চুরি-চামারি করেনি। তাও ওকে জুড়ে দিয়েছে কুশবসানের ডাকাতির কেসে।'

বিডিও সাহেব অল্পক্ষণ কি ভাবলেন।

তারপর বললেন, 'মিথ্যে কেসে জড়িয়ে থানার লাভ?'

'এটা তো আপনি সহজেই বুঝতে পারেন স্যার।' নিতাই মাস্টার বলে, 'কেসে জড়িয়ে দিলে একে জামিন নিতে হবে। বহুদিন ধরে কেস চালাতে হবে। আর, তার খরচ চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে আবার চুরি-ডাকাতিতে নামতে হবে।'

বিডিও সাহেবের মুখে চিন্তার ছাপ। একসময় বললেন, 'দেখি কি করা যায়।'

'আর একটা কথা স্যার।' নিতাই মাস্টার একটু ঘন হয়ে আসে বিডিও সাহেবের দিকে, 'বড় চুরি হচ্ছে স্যার স্কীমগুলোতে। যমুনা থেকে জেনা-গেড়্যার রাস্তাটা প্রায় হয়নি বললেই চলে। টাকাগুলো ভাগ করে নিয়েছে জনা কয়েক লোক। মূল বখরাটা পেয়েছে ব্লকের ওভারসিয়ার, প্রধান আর বাণেশ্বর ঘোষ। তাছাড়া, কুন্তীদীঘি কাটানোর কাজটাও কিছুই হলো না। সব গেল ওদের পেটে। রিলিফের চাল-গম, ড্রাইডোল, জামা-কাপড়গুলো নিয়েও নয় ছয় হচ্ছে স্যার। যোগ্য লোক পাচ্ছে নি। সব পাচ্ছে প্রধান আর বাণেশ্বর ঘোষের বাড়ীর মুনিষ মাইন্দার আর পেটোয়া কিছু মানুষ। সুদেব মিদ্যার রেশন দোকানটা একদিন আচমকা রেড্ করুন স্যার। অর্ধেক মাল বেচে দিচ্ছে নারাণগড়েই।'

নিতাই মাস্টার থামলো।

বিডিও সাহেব মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো। বললেন, 'দেখছি আমি। তবে কি জানেন নিতাইবাবু, একা একা চারপাশের সবাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ে লড়ে

আর পেরে উঠছি নে আমি। তাছাড়া, ওদের হাতগুলোও বেজায় লম্বা।'

বিডিও সাহেবের চোখ মুখ ভারি হয়ে আসে।

উঠে দাঁড়ায় নিতাই মাস্টার। দেখাদেখি গোক্ষুরও। নিঃশব্দে বিডিও সাহেবের কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে ওরা।

গোক্ষুরের মনে অগাধ বিস্ময়। সরকারী সাহেব লোক, তাঁর মুখে এসব কথা! গোক্ষুর যেন কল্পনাও করতে পারে না। মনের মধ্যে কোথায় যেন খুশীর পাখিটি শিস্ দিতে থাকে নিঃশব্দে।

পুরো ঘটনাটা পঞ্চমীকে বলে গোক্ষুর। পঞ্চমী চোখ বড় বড় করে শোনে। বলে, 'তা'পর?'

'তা'পর আর কি? চলিয়া আইলাম ঐ রাতে দু'জনে। রাতের বেলায় খানা গাড়লাম মা-মনসার চণ্ডী দাসের ঘরে।'

পঞ্চমী নিষ্পলক বসে থাকে।

এক সময় বলে, 'বিডিও সাহাব যখন কথা দিছনু, কিছো না কিছো করুবনু নির্ঘাৎ। অন্তত বিঘাটাক জমিন যেদি করিয়া দ'নু, তেবে আর চিন্তা নাই।'

'কি যে কউ! এক বিঘা জমিনে কতটুকু ধান হবে? তা বাদে, হাল নাই, বীচন নাই, চাষ করবো কইলেই চাষ করা যায়?'

'হবে। সব হয়্যাবে। তুমি ভাইবো নি। দু'জনে মিলিয়া দিনভর খাটবো জমিনে। জঙ্গলের ঝাঁটি, কাঠ, ফল-মূল তাড়িয়া লিআইস্‌বো। ভগবানের দিন, ভগবান ঠিক লিয়া লিবনু।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমেল হাওয়া বাড়ছে। শীত করে।

ছিটে বেড়ার ফাঁক ফোকর গলে ঠাণ্ডা ঢুকছে। চাটাইখানা হিম হয়ে গেছে। একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিয়েছে গোক্ষুর। তাতে শীত যায় নি। শীত করছে গোক্ষুরের। অল্প কাঁপছে সে। অঘ্রাণে অতখানি শীত লাগার কথা নয়। জ্বর এলো নাকি গোক্ষুরের!

সুদিনের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে গেছে পঞ্চমী। গোক্ষুরের পাশটিতে বসেও উড়ে গেছে। পলকা বাঁশপাতার মত উড়ছে মহাশূন্যে। কেবল হাতখানি গোক্ষুরের হাতের মধ্যে তিরতিরিয়ে কাঁপছে, ভয় পাওয়া কপতুর পাখিটির মতো।

ডিবরির তেল ফুরিয়ে এসেছে বুঝি। আলোর শিস্ কমে আসছে দ্রুত।

বসন্ধরীর দিক থেকে হু-হু ছুটে আসছে উদোম হাওয়া। গোক্ষুর পঞ্চমীকে নিষ্পলক দেখছিল। শরীরের কাঁপুনিটা কমাতেই বুঝি, একসময় ঝটকা মেরে ওকে তুলে নিলো বুকের ওপর।

সামান্য ডানা ঝাপটালো বটে পঞ্চমী। তারপরই অসাড় হয়ে গেল সে।

ডিবরির আলোখানা একসময় ঝুপ করে নিভে গেল।

॥ কুড়ি ॥

খাস-জমিনের লিস্টে গোক্ষুর ভক্তার নাম দেখে বাণেশ্বর ঘোষ চোখের পাতাও ফেলতেও ভুলে যায়।

রেগে কাঁই হয়ে বলে, 'এ শালা জেলারো ভাবছে কি? দুনিয়ার যত চোর-ছ্যাঁচোড়, সব্বাইকে জমিন বিলাবার তরে জমিনগুলো ভেস্ট কচ্ছে সরকার? শালাকে টেনেসফার করিয়া দুবো।'

এই সাত সকালে পঞ্চাত অফিসে লোকজন কম। চৌকিদার ত্রিবিক্রম বারান্দায় বসে কান খোঁচাচ্ছে। দু'চোখ বুঁজে এসেছে তার। বাণেশ্বরের গর্জনে চোখ খুললো। প্রধান কালাচাঁদ আইচ বসে বসে ট্যাক্স-আদায়ের রেজিস্টারের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল মনোযোগ দিয়ে। বাণেশ্বর ঘোষের কথায় মুখ তুললো। বাণেশ্বর ঘোষের উষ্মার কারণটা আন্দাজ করেছে সে। লিস্টে গোক্ষুরের নামে এক বিঘা জমি বণ্টন হয়েছে শিল-পাথরার ধুতমা ডাঙায়। শুধু ও নয়, ঐ ডাক্তার জমিন পেয়েছে যমুনা আর ডিহিপারের আরো ষোলজন লোধা।

মুচকি হাসে কালাচাঁদ আইচ। বলে, 'জেলারোর দোষ নাই। বিডিও করিয়েছে এটা। জমি-বণ্টনের মিটিংয়ে লম্বা ভাষণ দিয়েছে গোখুরার হয়ে।'

'তুমরা আপত্তি করতে পাল্লে নি?' বাণেশ্বর চড়া গলায় বলে।

'আমরা? স্বয়ং কানু সাঁতরা উপস্থিত ছিল মিটিংয়ে। তাকেও ফুতকারে উড়িয়া দিল।'

'কিন্তু আমি ছাড়বো নি।' বাণেশ্বর গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'কালই যাবো সদরে। প্রমোদ দত্ত আর রমণীমোহনকে কইবো। মুখ্যমন্ত্রীকে জানিইবো। এ পাট্টা যেদি বন্ধ কত্তে না পারি তেবে মোর নামে কুকোর পুষবে তুমি।'

কালাচাঁদ আইচ মন দিয়ে শুনছিল বাণেশ্বরের আস্ফালন। ক্ষুব্ধ সে নিজেও। গাঁ'র এতো অভাবী লোক থাকতে একটা দাগী চোরকে পাট্টা দেওয়া! তাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের সমস্ত সুপারীশ নস্যাৎ করে! বিডিও হইছ বলিয়া কি ভগবান হয়্যা গ্যাছ তুমি!

পঞ্চাত অফিসের টং-চালে একটা কাক বসে কর্কশ গলায় ডাকছিল অবিরাম। বার কয় 'হুশ-হাশ' করে কালাচাঁদ চৌকিদারকে ডাক পাড়ে। 'ত্রিবিক্রম, খেদাও তো হে।'

বাণেশ্বর ঘোষের চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছে না। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস

পড়ছে। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'কি করিয়া জমিনের পাট্টা পায়, কি করিয়া দখলে যায়, চাষ-বাস করে,— দেখবো আমি।'

কালাচাঁদ আইচের বাস্তব বুদ্ধি ঢের বেশি। বাণেশ্বরকে শান্ত করবার চেষ্টা করে সে। 'থাণ্ডা হও দাদা। রাগের মাথায় নিজের বিপদ ডাকিয়া আনবে তুমি।'

'নিজের বিপদ ?'

'হুঁ। জরুরী অবস্থা চলছে দেশে। খোব সাবধান! লচেত মোরও কি অপমান হয় নি এতে ?' কালাচাঁদ ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে, 'কিন্তু দেখছি ত চারপাশে, অখন বিডিও, এস-ডিও—ডি-এম'রাই সর্বেসর্বা। যে কুনো মুহূর্তে ফাঁসিয়া দিবে তুমাকে।'

'ছিঁড়বে মোর!' বাণেশ্বর ঘোষের মাথা তখনো জ্বলছে দাউ দাউ করে, জরুরী অবস্থা ত তোর-আমার কি রে? বিডিও মোর কি করবে?'

'মিসা, দাদা, যে কুনো মুহূর্তে মিসায় ধরিয়া লিতে পারে তুমায়।'

'মিসা?' আরো ক্ষেপে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'মিসায় ধরবে মোকে? কাদের তরে মিসা জান? যারা দেশের শত্রু, কালোবাজারী, মজুদদার, কমুনিস, নকশাল—।'

'কালোবাজারী আর মজুতদারেরা অনেক উঁচার বাসিন্দা, অদের কথা ছাড়। কিছো কমুনিস আর নকশালকে ধচ্ছে মিসায়। ইদানিং দলের মধ্যে যারা বেগড়বাঁই কচ্ছে তাদেরও ধচ্ছে দাদা।'

বাণেশ্বর ঘোষ কিঞ্চিৎ দমে গেছে ততক্ষণে।

তাও গলায় জোর বজায় রেখে বলে, 'কিন্তু মুই ত কুনো বেগড়বাঁই করি নি পার্টির মধ্যে ?'

কালাচাঁদ চোখ টিপে হাসে।

বলে, 'তাইলে তুমাকে থানা-কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর চিয়ার থিকে সরিয়া দিল ক্যানে?'

কাকটা আবার এসে বসেছে ঘরের টং-এ। ডাকটা অসহ্য।

এতক্ষণে চিন্তার ঢেউ খেলাতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষের কপালে। সত্যিই তো ব্যাপারগুলোর মধ্যে ভাবনার বিষয় রয়েছে। 'হু হুঁ!' চোখ নাচিয়ে বলে কালাচাঁদ আইচ,

'কথার মধ্যে কথা আছে
বুঝতে যদি পার,
(আর) পিঠার মধ্যে পুরটি আছে
খাইত্তে যেদি পার।'

কালাচাঁদ বয়েসে কম হলেও আগে ভাগে ধরেছে ব্যাপারটাকে। পার্টির রোষ দৃষ্টি কি তবে সত্যিই রয়েছে ওর ওপর? কিন্তু সেদিন যে ফের সদর অফিসে রমণীমোহন অন্য কথা বললো। জেলা কমিটির সভাপতি প্রমোদ দত্তর ডান হাত তুল্য রমণীমোহন। সে তো ভুল-ভাল কইবার লোক নয়।

তবে, না আঁচালে ওদের কথায় বিশ্বাস নেই। বড় ভাবনায় পড়ে যায় বাণেশ্বর।

'কিন্তু মিসা কি করিয়া হবে মোর?' ফের তর্ক জোড়ে বাণেশ্বর, 'গোক্ষুর ভক্তাকে পাট্টা দিবার বিরোধিতা করলেই মিসা হয়্যাবে? মিসা আইনে অমন কথা লেখা আছে?'

'মিসা আইনে কিচ্ছোটি লেখা নাই। কালাচাঁদ সূক্ষ্ম রসিকতা করে, 'একদম সাদা পাতা। কত্তারা যার যমন খুশী, লেখিয়া লিচ্ছেন।'

'ত' আমার ক্ষেত্রে কি কারণ দেখিইবে শালারা?' বাণেশ্বর ঘোষ ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বললো, 'একটা দোষ তো রইতে হবে লোকের।'

'দোষ? দোষ ফের খুঁজতে হয় লোকের?' কালাচাঁদ দার্শনিকের মত জবাব দেয়, 'এই তো সেদিন লেভি দেয়নি এই অজুহাতে মিসায় ধরিয়া লিলো বেলদার জীবন দাসকে। কত জমিন-জায়গা, বেবসা-পাতি তার, কত মাইন্য-গইণ্য মানুষ, এক কথায় ধরিয়া লিআলো! কারো কথাটি শুনলো নি।'

খবরটা সেও শুনেছে। কালাচাঁদ সেটা যে এমন করে মনে করাবে, বুঝতে পারে নি বাণেশ্বর! কাল যেটা ছিল নিতান্তই খবর, এই মুহূর্তে সেই ঘটনাটি সতর্কীকরণ ঘণ্টা। বাণেশ্বর এবার সত্যি সত্যিই দমে যায়।

তাও গলায় রোখ বজায় রেখে বলে, 'কিন্তু আমি তো লেভি দিয়া দিছি। সব রসিদ পত্তর জমা আছে মোর পাশ।'

'কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর লেভী দও নি তুমি।' কালাচাঁদ চোখের কোণায় হাসে, 'কার্তিক মাসে ধানের আড়ত খুললো জগদীশ দাস। কাঁটাটি টাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ডাকিয়া কইল, জগা রে, গরীব-দুঃখী যা খুচরা ধান বিকবে রোজ, সব মোর নামে লেভি রসিদ কাটিয়া রাখিব। জগা তুমার পাশ টাকা লিয়া বেবসা ফাঁদছে। সে তুমার কথা অমান্য করে কি করিয়া? কাজে তুমার ঘরের ধান ঘরে রয়্যাল। সরকারও লেভি পায়্যাল।'

কালাচাঁদ আইচ যেভাবে ব্যাখ্যা করলো বিষয়টিকে, তাতে বাণেশ্বর ঘোষ যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করে। মনে মনে গরম হয়ে ওঠে কালাচাঁদের ওপর। যেভাবে পর পর গাঁথলো কথাগুলো, বাণেশ্বর কেন, যে কেউর মনে হবে, এইমাত্র যেন পুরো ব্যাপারটার ওপর একটি ঠাস-বাঁধুনি দরখাস্ত লিখে, সদরে পাঠিয়ে এসেছে কালাচাঁদ। বিশ্বাস নাই, তিলমাত্র বিশ্বাস নাই এ শালাদের। মুখে দাদা-দাদা কচ্ছে। ভিতরে ভিতরে আছোলাটি দেবার ধান্দা। হয়তো সত্যিই এভাবে ব্যাপারটা গোপনে জানিয়ে দিয়েছে শালা। হয়তো সেই কারণে একটা আগাম কাঁদুনী গেয়ে রাখছে। যদি বাণেশ্বরকে সত্যি সত্যি ধরা হয়, তবে কালাচাঁদ বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বাধা প্রদান করার জন্যই তোমাকে ধল্ল দাদা। আমি ত তখনুই বারণ কচ্ছিলাম তুমাকে এই জন্যেই।

'কিন্তু যেভাবেই হোক, লেভি ত আমার বাকি নাই।' যেন বিচারকের

সামনে হাজির করা হয়েছে বাণেশ্বরকে। প্রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বাণেশ্বর বলে।

'লেভি বাকি নাই। কিন্তু ঘরে ধানও কম নাই।' কালাচাঁদ শত্রুপক্ষের উকিলের পায়া ব্যাভার করে, 'একদিন পুলিশ দিয়া ঘেরিয়া দিল তুমার ঘর। ধান-টান যা আছে, ওজন কল্ল এবং খাদ্যশস্যের মজুতদারীর অভিযোগে ধরিয়া লিল তুমাকে। বিডিও একটা গোপন রিপোর্ট দিলেই রেড্ হয়্যাবে তুমার ঘর।'

বাণেশ্বর ঘোষ গম্ভীর হয়ে গেছে। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

'বেপারটা লিয়া বেশি রজঘষ করা ঠিক হবে নি, বলছ?' প্রায় মন্ত্রণা নেবার ভঙ্গিতে শুধোয় কালাচাঁদকে।

'চাপ্পিয়া যাও।' কালাচাঁদ ডান হাতের মুদ্রায়ও দেখিয়ে দেয় সেটা, 'অত লোকের ভিতর দু'একটা চোর-ছ্যাঁচোড় রইলো তো বয়্যাল। ধুতমা ডাঙা। উখেনে ফসল না কচুটি ফলবে! তাছাড়া লধরা জমিন লিয়া করবে-টা কি? পুঁদে পুরবে? জমিন চাষ করবে কিনা লধরার বাচ্চা? হাল নাই, বীচন নাই, ফুস মন্তরে চাষ হবে। সিঁদ ধরিয়া ধরিয়া তিয়ার হয়্যা গেছে যে হাত, সে হাতে হাল ধরা অত সোজা!' বাণেশ্বরের দিকে কুট-কৌশলীর চোখে তাকায় কালাচাঁদ, 'কাকে না কাকে খাইখালাসী দিয়া দিবে ছ'মাস বাদে। দেখবে তুমি দাদা।'

কালাচাঁদের এসব সান্ত্বনা বাক্যে বাণেশ্বরের বুকের জ্বালা কিঞ্চিৎ জুড়োয়।

'ঠিক আছে। পাট্টা পাউ শালা।' বাণেশ্বরের দু'চোখ কুটিল হয়ে ওঠে, 'মুই অকে অন্য ধারে দেখিয়া লুবো।'

পাশের ঘরে স্টোভ জেবলে চা বানাচ্ছিল চৌকিদার ত্রিবিক্রম। দু'গেলাস চা এনে রাখলো বাণেশ্বরদের সুমুখে।

চায়ের গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বাণেশ্বর শুধোয়, 'তুমার একটা ডাঙা লিয়া টানা হিঁচড়া কচ্ছিল বিডিও, কি হইল অটার?'

'কি অন্যায় বল দেখি!' চায়ের গেলাস ঠক্ করে টেবিলে রাখে কালাচাঁদ আইচ, 'লোধাদের তরে ঘর হবে বলিয়া মোর ডাঙাটা জবর-দখল!'

'জবর-দখল বলছো ক্যানে?' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয় বাণেশ্বর, 'সরকার ত ক্ষতিপূরণ দিবে।'

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে কালাচাঁদ আইচ, অমন ক্ষতিপূরণে মুতিয়া দিই মুই। তুমার ভিটা ত পরথমে ধচ্ছিল, দিলে নি ক্যানে?'

মিটি মিটি হাসছিল বাণেশ্বর ঘোষ। বললো, 'এখন কি অবস্থা বল?'

'কি আর অবস্থা? সদরে গিয়া টাকা দিয়া ছাড়িয়া লিয়া আসসি জমিন। এখন শুনিছি কুন্তীদীঘির উত্তর পাড়ের খাস ডাঙাটার উপর ঘর হবে। বিডিও নাকি সদরের ধমক খায়া মানিয়া লিছে সেটা।'

'ঘর আর, বোধ হয়, হইল নি এ অঞ্চলে।' চোখ টিপে বলে বাণেশ্বর,

'মচ্ছব পাকিয়া গেছে অন্যদিকে !' বাণেশ্বর খোলসা করে কথাটা। সাত নম্বর অঞ্চলে ঘর তৈরী নিয়ে বিডিওর নামে ভিজিলেন্স হয়েছে, শোনা যাচ্ছে। বাণেশ্বর চোখ টিপে বলে, 'খোঁজ লিচ্ছি। জানাব।' চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালো বাণেশ্বর ঘোষ। 'যাই। ঘরে অনেক কাজ।'

'ওদিকে কথা শুনছো তো?' কালাচাঁদ আইচ অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, 'স্কীমের কাজ দেখতে বিডিও আইসবে।'

'আইসু!' বেশ বীরদর্পে বলে বাণেশ্বর ঘোষ।

'কুন্তীদীঘি-স্কীমের কাগজ পত্তর, মাস্টার-রোল, অখনো ঠিকঠাক করিয়া দিলো নি চপলা। কুনো বিপদ হইলে তখন দায়ী করব নি মোকে।'

বাণেশ্বর মাথা দোলায় নিঃশব্দে। রাস্তায় নামে। মনটা কেমন খেঁচড়ে গেছে। জুত পাচ্ছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে ইদানিং সবকিছু যেন বাণেশ্বর ঘোষের প্রতিকূলে যাচ্ছে। গোক্ষুরের পাট্টালাভ, সম্ভাব্য ধানের-গোলা-রেইড-ঘটিত-মিসা, বিডিওর স্কীম-পরিদর্শন এবং চপলাকান্তর ঘেঁতুরামি···সব। ইদানিং এর ওপর আর এক দফা বেড়েছে। প্রণব মাস্টার স্কুল ছেড়ে দেবার পর, তার পদত্যাগ পত্র ডি-আই অফিসে পাঠানো হয়েছে। তাদের অনুমোদন পেয়ে, ঐ ভ্যাকেন্সীতে শিক্ষক নিয়োগের সুস্পষ্ট প্রস্তাবও কমিটিতে পাশ করিয়ে পাঠানো হয়েছে অনুমোদনের জন্য। অনুমোদনটা এলেই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে, ইন্টারভিউ নিয়ে, অ্যাপয়েন্টমেন্টের কাজটা সেরে ফেলা যায়। কিন্তু আজ তিন-তিন মাস ডি-আই অফিস ঘোরাচ্ছে ঐ সামান্য কাজটুকুর জন্য। আশ্চর্য! টাকা ছড়িয়েও আজকাল কাজ পাওয়া যায় না সরকারী অফিসে!

বাড়ির দিকে হাঁটছিল বাণেশ্বর। রাস্তার বাঁ-দিকে 'সুভাষ সংঘ'। গণেশ মিদ্যার দল বসে বসে গুলতানি মারছে। কি একটা কথা নিয়ে হাসির রোল উঠেছে খুব।

বাণেশ্বরকে দেখে দাঁত-গিজুড়ে হাসলো গণেশ, 'জ্যাঠা কুন দিক থিক্যা আইলে?'

'গেছলাম বাপ, পঞ্চাত অফিসে। কি দেখিয়া আইলাম জানু?'

'কি?' গণেশ মিদ্যার দল চোখ ফেরায় বাণেশ্বরের দিকে।

'গোক্ষুর ভক্তা পাইছে খাস জমিনের পাট্টা।'

শুনে গণেশ মিদ্যার দলও তাজ্জব বনে যায়। হেসে ওঠে কেউ কেউ, 'গোখরা তেবে এবার সিঁদ-কাঠি ছাড়িয়া হাল ধরবে!'

'কলির শেষ পহর চলছে রে—।' চোখে মুখে চরম দুশ্চিন্তার ছাপ বাণেশ্বর ঘোষের, 'আরো কত কি দেখিয়া যাইতে হবে, ভগবান জানেন, যিনি দিনকে রাত করেন। কিন্তু তোরা বড় হাসছিলু যে?' বাণেশ্বর আপন মানুষটির মত শুধোয়। সে কথায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওরা। মুখে আঠার মত লেগে থাকে চাপা হাসি।

গণেশ মিদ্যা বলে, 'সে অন্য একটা কথায়।'

গোপন করলেই কৌতূহল বাড়ে। বাণেশ্বর শুধোয়, 'কি কথা? আরে মোকে বলতে দোষ কি?'

খানিক ইতস্তত করে গণেশ মিদ্যা। তারপর বলে, 'শংকর কোটালের ঝি হইছে কাল।'

বাণেশ্বর বুঝতে পারে না, এতে হাসির কি থাকতে পারে।

খোলসা করে মদনা, কুলদা ডাক্তারের ব্যাটা। বলে, 'লোধার ঝি হইল মানে গিরস্থের কাছে আশীর্বাদ।'

'ক্যানে?'

'মায়া-ঝি ত আর চুরি কত্তে পারবে নি। ব্যাটা-ছা জম্মিলে এলাকায় একটি চোর বাড়তো।'

বাণেশ্বর ঘোষ এতক্ষণে খুঁজে পায় পিঠের মধ্যেকার পুরটি। হাসতে হাসতে বলে, 'সে হিসাবে এলাকায় চোর কমানোর কাজে সবচেয়ে বেশি উয্যোগ বংশী ভঞ্জর।'

বাণেশ্বরের কথার অন্তর্নিহিত মধুটুকুর স্বাদ পায় গণেশ মিদ্যার দল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা।

'গণেশ রে—।' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল বাণেশ্বর, 'তোর বাপকে একবার পাঠিয়া দিবি ত সন্ধ্যাবেলায়। কথা আছে।'

বাণেশ্বরের চোখ মটকানোর বহর দেখে গণেশ বুঝে নিল খুব জরুরী এবং গণেশদের স্বার্থঘটিত কোনও ব্যাপারে তলব দিচ্ছে বাণেশ্বর ঘোষ। গণেশ বললো, 'পাঠিয়া দুবো সন্ধ্যাবেলায়।'

নিশি কামারের বাড়ির সামনে গিয়ে সহসা চলার গতি শ্লথ হল বাণেশ্বরের। যাওয়ার সময় দেখেছে, শ্যাম চক্রবর্তী বসে রয়েছে নিশির উঠোনে। মনটা 'কু' গাইছিল তখন থেকে। বাণেশ্বর তাকিয়ে দেখলো, শ্যাম চক্রবর্তী নেই। উঠোনে নিশি একলাটি বসে আছে। বাণেশ্বর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আগড় ঠেলে ঢুকলো নিশির উঠোনে।

বাণেশ্বর ঘোষ হেন ব্যক্তির আচমকা আগমনে তটস্থ হয়ে উঠলো নিশি কামার। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। চাটাই পেতে দিল বারান্দায়।

মাদুরের ওপর শরীরখানি থাপনা করে এদিক-ওদিক তাকায় বাণেশ্বর, 'মালতী নাই ঘরে?'

'গা ধুইতে গেছে।'

'এখন কেমন?'

'টুকে ভালো।' নিশি কামার ম্লান হাসে, 'তেবে ঘি পুড়তেই হবে ভিটায়। আজ শ্যাম চক্রবর্তী আসছিল সেই কথায়। সামনের শনিবার দিন স্থির হইছে।'

খিড়কির বাঁশ ঝাড়ে জোড় খাচ্ছে বাঁশ। কড়্‌...কড়্‌ আওয়াজ তুলেছে। বাঁশগাছের ডগায় এক জোড়া ফিঙে। দোল খাচ্ছে পলকা কঞ্চিতে বসে। বেড়ার ওধারে ধানের ক্ষেত শুরু। লক্ষ্মী-কাজল ধানে পাক ধরেছে সবে।

উঠোনটা নিকিয়েছে মালতী। কাঁচা গোবরের গন্ধ মিলায় নি এখনও।

এ কথা সে কথার পর উঠে পড়ে বাণেশ্বর। মালতীকে একটু চোখের দেখা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় নেই আর।

'ঘোষদা—।' নিশি কামার সসঙ্কোচে বলে, 'সেই চিজটার কন্দুর কি হইলো?'

'ও, সেই পায়ের নখ? হবে, হবে, হয়্যাবে।' বাণেশ্বর পুরোপুরি আশ্বাস দেয় নিশিকে, 'আজ তো সোম, শনিবারের মধ্যে পায়াবি। মুই লাগিয়া দিছি সুনীল মান্নাকে।'

আর দাঁড়ায় না বাণেশ্বর। নিশি কামারের উঠোন পেরিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। মনের মধ্যে ভাসতে থাকে একখানি মাত্র ছবি। শক্তিহীন, সারহীন বংশী ভঞ্জর মুখখানি। শালা, বড্ড বাড় বাড়ছে তোর! রক্তের তেজে অন্যের জমিনে গিয়া মু' দেওয়া! ধরাকে সরাজ্ঞান?

॥ একুশ ॥

গোক্ষুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল পঞ্চমীর। বিয়ে তো নয়, সাঙ্গা।

গোক্ষুরের মনের ভাঁপন বুঝতে পেরে একদিন নিতাই মাস্টারই নিজের থেকে শুধোলো। গোক্ষুরের সায় পেয়েই প্রস্তাবটা তুললো মুরলী কোটালের কাছে! পঞ্চমীর সঙ্গে সাঙ্গা হয়ে গেল গোক্ষুরের।

নতুন কোরা ধুতি, নীল ছিটের জামা পরে, টকটকে লাল শাড়ি পরা পঞ্চমীকে নিয়ে একদিন শেষবেলায় নিজের ঘরের উঠোনে দাঁড়ালো গোক্ষুর। সঙ্গে মধু মল্লিক, মুকুট মল্লিক, ছোট ভাই মকর ভক্তা, নিকম ভক্তা, আরো পাড়ার দু'তিনজন। তখন সূর্য ডুবছে কুন্তীদীঘির ওপারে। রহস্যময়ী হয়ে উঠছে বসুমন্তা।

নৈতন বস্ত্র, পুরাতন কন্যা/শঙ্খঘণ্টা হুলোহুলি, খাড়ু লগণ্যা/আস্তো-পাতা খসুখসু/এ গোত্রনু সে গোত্রকে পশু/শিয়াল করে হাউ হাউ/ঢ্যামনা-ঢেমনি ঘরকে যাউ।—উঠোনে দাঁড়িয়ে ফোকলা দাঁতে ছড়া কাটে বুড়া যুধিষ্ঠির মল্লিক। গোক্ষুর আর পঞ্চমী উঠোন পেরিয়ে পা রাখে বারান্দায়।

হারি পিসি পঞ্চমীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেদম কাঁদলো। অনেকক্ষণ। ছা'টা মোর ভাসিয়া যাইতো। তুই আইসিয়া বাঁচিইলি মা। হারি পিসির বুকে এক্কেবারে নিজের মায়ের গায়ের গন্ধ পায় পঞ্চমী। সেও শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে হারি পিসিকে।

আজ খুব ভোরবেলায় বিছানা ছেড়েছে পঞ্চমী। অনেক কাজ তার। ঘর-গেরস্থালির। সংসারের আয়-উপার্জন। সবকিছুই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে সে। শুধু একটাই সতর্ক বাণী তার, গোক্ষুরের প্রতি। কোনও দিন, কোনও প্রলোভনে আর সিঁদকাঠি হাতে ধরতে পাবে না সে। মাটি পায়া

গেছ তুমি। তুমার আর ভাবনা কি?

মাস দুই আগে, খাস জমির পাট্টাখানা পেয়ে বার দুই নেড়ে চেড়ে দেখেছিল গোক্ষুর। এক বিঘা পাঁচ কাঠা ডাঙা জমি। শিলপাথরার ধুতমা ডাঙায়। দু'পাশে জঙ্গল। মধ্যিখানের ডাঙায়। মোট সতের জন পাট্টা পেয়েছে তার একাংশে। পুরোটায় টাঁড়-টিকরা বোঝাই। চাষবাসের অযোগ্য।

পাট্টাদাররা জেলারো সাহাবকে বলে, 'এ জমিন কিসের তরে দিলেন হুজুর? এ জমিন খাবো, না মাখবো?'

জেলারো সাহাব রেগে কাঁই। শালাদের কথা শোনো! ভিক্ষের চাল, তার আবার কাঁড়া-আঁকাড়া!

বলেন, 'আমাকে নয়, এসব কথা বিডিও'কে গিয়ে বল্। তিনিই তোদের চাষী বানাতে চান।'

নিতাই মাস্টারের শুরু হলো বিডিও সাহাবের কাছে ঘোরাঘুরি। বহুত চেষ্টায়, বহুত মেহনতের পর একটা 'ইস্কিম' মঞ্জুর হল। প্রত্যেক পাট্টাদার তার নিজের জমিন গভীর করে চারপাশে আল দিয়ে নেবে। তার বদলে পাবে মজুরী। জমিনকে জমিন হবে। মজুরীও মিলবে। বিডিও'র সুস্পষ্ট নির্দেশে মধু মল্লিককে করা হয়েছে 'ইস্কিমে'র পে-মাস্টার। তাই নিয়ে কালাচাঁদ আইচদের আর একদফা গোঁসা। সেই ইস্কিমে কাজ করতে রোজ সকালে বেরিয়ে যায় গোক্ষুর। ফেরে একেবারে দুপুর গড়িয়ে। পঞ্চমী ততক্ষণে ঘর-গেরস্থালির কাজ সেরে, জঙ্গল থেকে এক বোঝা ঝাঁটি এনে, গেরস্থের বাড়িতে বেচে, দোকান-হাট সেরে ফেলেছে। রোজ দিন গোক্ষুর ঘরে ফিরেই দেখে মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। ধোঁয়া উড়ছে। উথলে উঠছে ফেনা। ঘরময় সৌরভ। এই সৌরভটাই এ ঘরে কস্মিনকালেও ছিল না। গোক্ষুরের জন্মকালাবধি।

পঞ্চমী খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলে ওঠে, 'যাও, গা ধুয়্যা গরম গরম খায়া লও ফ্যানে-ভাতে।'

নাক জুড়ে ফুটন্ত ভাতের সৌরভ ভরে নিয়ে গোক্ষুর পা বাড়ায় কুন্তী-দীঘির দিকে।

আজ সকাল থেকেই গোক্ষুর কিঞ্চিৎ অস্থির। বলে, 'মতিহারের ডিবাটা দে' জলদি। দেরি হয়্যাল।'

আজ বিডিও সাহেবের আসার কথা আছে। গোক্ষুরদের স্কীম দেখতে আসছেন তিনি। সঙ্গে আদিবাসী দপ্তরের সাহেবও আসতে পারেন।

প্রধান কালাচাদ আইচ গতকালই খবর দিয়েছে পাড়ায়, 'কাল জলদি জলদি ইস্কিমে যাবি সব। সাহাবরা আইস্‌বার আগেই গিয়া লাগিয়া যাবি কাজে।'

মতিহারের ডিবরিটি ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে গোক্ষুর দৌড় মারলো শিল-পাথ্‌রার দিকে।

বিডিও সাহেব এলেন নির্দিষ্ট সময়ে। সতের জন লোধা তখন প্রাণপণে চালিয়ে যাচ্ছে কোদাল। সারা মাঠ জুড়ে যেন এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। গাছের তলায় দাঁড়ালেন সাহেবরা। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ওদের কাজ। কাউকে কাউকে শুধোলেন এটা-ওটা। এক সময় বিদায় নিলেন খুশী মনে। মধু মল্লিক ঘুরছিল সাহেবদের পিছু পিছু। স্কীমের জমা-খরচের হিসাব বোঝাচ্ছিল মুখে মুখে। যাবার কালে এক ফাঁকে ওর মাধ্যমে গোক্ষুর ভক্তাকে ডেকে নেন কাছে। বলেন, বাড়িতে নাকি থাকিস নে রাতে? থানা বলছে। এ কেমন কথা? চুরিই ছেড়ে দিলি, রাতে বাইরে থাকিস কেন?'

গোক্ষুর নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। বিব্রত বোধ করে। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। চোখের তারায় দ্বন্দ্ব।

বিডিও সাহেবের ভুরু কুঁচকে ওঠে। বলেন, 'এখনো পুরোপুরি ছাড়িস নি তবে কাজটা! থানার কাছে আমার মুখ পোড়ালি?'

ভুল বুঝে আঘাত পেলো মানুষটা। বাধ্য হয়ে মুখ খোলে গোক্ষুর।

বলে, 'আমি রাতে নিতাই-মাস্টারের সঙ্গে ঘুরি হুজুর। অকে পাহারা দিয়া লিয়া যাই, যেখ্‌নে অর মিটিং থাকে।'

বিডিও সাহেব দু'চোখে একরাশ সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন গোক্ষুরের দিকে।

গোক্ষুর বলে, 'বিশাস্ নাই হয় ত' জিগাবেন মাস্টারকে।'

ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে বিডিও সাহেবের মুখখানি! চোখ দুটি আগের মতো শান্ত হয়ে আসে। ঠোঁটের কোণে ফোটে পরিতৃপ্তির হাসি।

মৃদু গলায় বলে, 'তুই আমাকে বাঁচালি!'

'বাণেশ্বর ঘোষ ধমকানি দিচ্ছে।' ভয়ে ভয়ে বলে গোক্ষুর, 'ধ্বংস করিয়া দিবে মোকে।'

বিডিও বলে, 'ভয় পাস্ নি। আমরা তো আছি।'

শেষ বেলায় ফিরে এসে, ফ্যানে-ভাতে চাট্টি খেয়ে উঠোনে চাটাই পেতে শুয়েছিল গোক্ষুর। সকালের এই সব গপ্পো শোনাচ্ছিল পঞ্চমীকে। পঞ্চমী চুপটি করে বসেছিল পাশটিতে। গোক্ষুরের মাথায় হাত বোলাচ্ছিল অল্প অল্প। রোদে বড় তেজ। সারাদিনে একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে আসে মানুষটা। দেখে বড় কষ্ট হয় পঞ্চমীর।

ঈশেন কোণে কাঁটা বাঁশের ঝাড়। কঞ্চিগুলি দুলছে হাওয়ায়। পাতাগুলি কাঁপছে।

'হারি পিসি কুথা?' শুধোয় গোক্ষুর।

'ছিল তো ইখ্‌নে।' চোখদুটোকে চারপাশে বুলিয়ে এনে পঞ্চমী বলে, 'ডাইডোলের লিস্টি থিকে নাম কাটা গেছে অর।'

'ক্যানে?'

'কে জানে?' পঞ্চমী ঠোঁট ওলটায়, 'শুনছি পড়ধানের গুয়াল-কাড়ুনীর

নাম ঢুকছে হারি পিসির বদলে।' শাড়ির আঁচল দিয়ে গোক্ষুরের গায়ে আলতো হাওয়া করতে থাকে পঞ্চমী, 'দিনভর নিমগাছের গড়ায় বসিয়া অভিসম্পাত দিচ্ছিল পড়্‌ধানকে, ডিলারকে, ভগমানকে আর নিজের কপালকে।'

'বুড়িটাকে টুকে দেখবি।' গোক্ষুরের গলায় প্রচ্ছন্ন মমতা ঝরে পড়ে, 'যা কচ্ছে মোর তরে, পেটের মা'ও অতটা করবে নি।'

পঞ্চমী জবাব দেয় না। শাড়ির আঁচল দোলাতে থাকে নিঃশব্দে।

একটু বাদে বলে, 'ডাইডোল না দিল ত' বয়্যাল। আমাদের যেদি দু'মুঠা খুদ-কুড়া জুটে, হারি পিসিরও জুটবে।'

বলতে বলতে গোক্ষুরের পাশটিতে শুয়ে পড়ে পঞ্চমী। গোক্ষুর আড়চোখে দেখে ওকে। ক্লান্ত মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। একসময় হাত বাড়িয়ে ওকে টানতে চায় কাছে।

পঞ্চমী অবাক হয়ে যায়। লজ্জায় মরে যায় সে। 'ছাড়। দিনের বেলায় উঠানের মধ্যে টানছ অমন করিয়া, লজ্জা-শরম বলিয়া কিছো নাই গ!' কপট রোষ ফুটে ওঠে পঞ্চমীর মুখে।

'লাজটা মোর সর্বাদনই টুকে কম।' গোক্ষুর রসিকের মত হাসে, 'তুই ত' ভালোই জানু সিটা।'

'সিটা আর জানি নি?' পঞ্চমী ধারালো চোখ হানতে থাকে বার বার, 'তুমার মতন বেহায়া লোক দুনিয়ায় দুট্টা আছে? চুরি কত্তে গেল অঘোর দে'র ঘরে। যার ঘরে সিঁদ কাট্‌ল, তার কিছো লিতে পাল্ল নি। চুরি কল্ল কিনা মোর বাপের ঘরে ঢুকিয়া!'

'কি করি বল্‌!' পঞ্চমীকে আরো কাছে টানতে চায় গোক্ষুর, 'চুরির মাল যেদি অন্ধকারে সপাটে আঁকড়িয়া ধরে চোরকে, তেবে চুরি না করিয়া উপায় কি?'

'আ-হা!' পঞ্চমী কপট রোষে বলে ওঠে, 'আঁক্‌ড়িয়া না রইলে, এক্‌লা শশাঙ্ক বেরাই আম ছ্যাঁচা করতো তুমাকে।' বলেই খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে পঞ্চমী।

'গলায় আঁকড়িয়া জীবন বাঁচাইবার পর তো কত গঞ্জনা শুনলাম।' অভিমানে ফুলে ওঠে পঞ্চমীর নাকের পাটা, 'কারো উপকার কত্তে নাই এ সন্‌সারে।'

গোক্ষুর বুঝতে পারে, সেদিন রাতে নিতাই মাস্টারের নাম জড়িয়ে যে কথাগুলো বলেছিল, পঞ্চমী এখনো তা ভুলতে পারে নি। মনে মনে হাসে গোক্ষুর। লজ্জা পায়। অপরাধ জাগে মনে।

পঞ্চমীর মুখখানি চিবুক ধরে তোলে গোক্ষুর।

বলে, 'একটা কথা কইবো?'

'কি কথা?' পঞ্চমী ডাগর চোখে তাকায়।

'সেদিন রাতে নিতাই মাস্টার শোয় নি তোর বিছানায়।' গোক্ষুর গোয়েন্দার মতো হাসে, 'তোর বাপের লাঠির ঘায়ে পড়িয়া যাবার ভাণ করিয়া আমি তোর বিছ্‌না শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিয়া লিছি।' গোক্ষুর দাঁত গিজুড়ে

হাসে, 'লচেত এক লাঠির ঘায় উল্টিয়া যাবে. গোক্ষুর ভক্তা হেন লোক নয়। বিশ-পঞ্চাশটা লাঠির ঘা য়েদি সইতে নার. তেবে তুমি চোর গোত্রের কুলাঙ্গার।'

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে থ' হয়ে যায় পঞ্চমী। এত বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটা সেদিন নেতিয়ে পড়েছিল পঞ্চমীর বিছানায়! এতক্ষণ ধরে অভিনয় করলো শুধু নিতাই মাস্টার সত্যি সত্যিই পঞ্চমীর সঙ্গে শুয়েছিল কিনা এইটুকুই বুঝবার জন্যে! পঞ্চমী পলকহীন চোখে দেখতে থাকে গোক্ষুরকে। গলায় সত্যিকারের রোষ ফুটিয়ে বলে. 'অত নীচু মন তুমার! নিতাই কাকার মতন লোকের চরিত্র লিয়া সন্দেহ কর!'

'নীচু মন ত বটেই।' সহসা কেমন ভারি হয়ে আসে গোক্ষুরের গলা, 'চোরের মন ত. কত আর উঁচা হবে? নিজের মতন দুনিয়ার সকুলকেই চোরা ভাবে।'

'কিন্তু নিতাই কাকা হেন লোককে লিয়া—।' কথাটা শেষ করতে পারে না পঞ্চমী। গলাটা ধরে আসে তার।

'নিতাই কাকাকে তখন মুই কতটা চিনি, বল্?' গোক্ষুর পঞ্চমীকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'ভালো লোক. পার্টি' করে, গরীবের পক্ষে লড়ে, ব্যস। তার মানে. তার যে শারীরিক ক্ষিদা-তিষ্টা রইবে নি, সে যে যোবতী মায়ার সাথে ভাব-পীরিত কত্তে পারবে নি, অমনটা মনে হয় নি, মোর।' একটু থামে গোক্ষুর। তারপর বলে, 'তোকেও মুই তখন কত্টুক্ চিনি, বল্?'

পঞ্চমী চুপ করে শুয়ে থাকে। গোক্ষুরের কথাগুলো পরিপাক করতে থাকে ভেতরে। চার-চোখী মাছ হয়ে সাঁতরে বেড়ায় স্মৃতি। খানিক বাদে বলে, 'ভালোই হইছে সেদিন। সন্দেহ লিয়া সেদিন ফিরিয়া আইলে, সে সন্দেহ কাঁটা হয়্যা বিঁধতো আজীবন। নিতাই মাস্টারের সাথেও ভাব-ভালবাসা হইত্তো নি তুমার। চোর ছিলে. চোরই রইতে আজীবন।'

আকাশের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে বসে থাকে পঞ্চমী। একসময় প্রবল বিশ্বাসে উচ্চারণ করে. 'ভগমান যা করে, মঙ্গলের তরে!'

॥ বাইশ ॥

বেলা আন্দাজ দু'ঘড়ি। বাণেশ্বর ঘোষ এসে বসেছে পাথরগেড়্যার ধারে। ভাবনা-চিন্তায় অর্ধেক শুকিয়ে গেছে লোকটা। জঙ্গলের ধার ঘেঁসে পুকুরটা। অ্যাদ্দিন হেলা ফেলায় পড়েছিল। এই বর্ষায় হঠাৎ তাতে চারা পোনা ছেড়েছে বাণেশ্বর ঘোষ। পোনাগুলো সাঁঝ-পহরে চুরি না হয়ে যায়। সেই কারণে কাঁটা-ঝোপ ফেলেছে পুকুরময়। যে দেখে, সে হাসে। ভিটা লাগুয়া অত-গুলি পুকুর থাকতে, এই গাঁ ছাড়া পুকুরে পোনা ছাড়লে, ঘোষের পো? মাথা-টাথা খ্যারাব হয়্যাল নাকি?'

বাণেশ্বর বলে, 'বুঝ নি ক্যানে, শুধু মুদু ফেলিয়া রাখলে দখলে রাখতে

পারবো ? যা হউ দু'দশটা পোনা ফেলিয়া রাখি। লাড়া-ঘাঁটা করতে থাকি।'

পুকুর পাড়ে বসে বসে ভাবছিল বাণেশ্বর। ফি-রাতে একটা চালু ইনকাম, ঝুঁকি এক আনা, লাভ পনেরো আনা, তাও বন্ধ হয়ে গেল। সুদেব মিদ্যার মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে দিচ্ছে মেয়ের। পনেরো ভরি সোনা, নগদ দশ হাজার। সোনার বাজার নাকি সেরে ফেলেছে সুদেব। প্রাণটা হু-হু করে ওঠে বাণেশ্বরের। শীতের শুকনো হাওয়া বয় বুকের মধ্যে। পনেরো ভরি সোনা! সোজা কথা? পরশু দিনই ন্যাকা-সুধীরকে দূত করে পাঠিয়েছিল গোক্ষুরের কাছে। গতকালও। গোক্ষুর ভক্তা আসে নি। সে এখন চাষবাসে ব্যস্ত। নিজের পাট্টা-জমিতে আল দিচ্ছে সরকারী টাকায়। ঢের ঢের নেমকহারাম দেখেছে বাণেশ্বর ঘোষ। শালা, এই গোখুরোটার তুল্য কেউ নয়। গোখরা সাপ যাকে বলে। তোকে ডাকছে কে? না, বাণেশ্বর ঘোষ। তোর রাতের কাজের মুরুব্বি। সেটা যদি বাদও দিস, লোকটা যে চারপাশের দশ গাঁ'র মাথা রে শালা! দু'দিন আগে অবধি দলের থানা কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিল। রমণীমোহন সেদিন জেলা-কমিটির অফিসে যা ইঙ্গিত দিলো, তা সত্যি হলে, দু'দিন বাদে তার থান যে কত উঁচুতে হবে, তা তোর কল্পনারও অতীত। হেন লোকের কাছ থেকে পরপর দ'ুদিন তলব পেয়েও অনগেরাহ্যি করিস! সাপের পাঁচ-পা' দেখেছিস শালা? আসলে সময়টা ভারি খারাপ যাচ্ছে বাণেশ্বর ঘোষের। ঐ যে, হাতি যখন পাঁকে পড়ে, চামচিকা তার পংগা মারে। এও সেই বিত্তান্ত। নইলে গোক্ষুর ভক্তার মত ছুঁচা-চামচিকাও বাণেশ্বর ঘোষের মত মানী লোকের ডাক ফিরিয়ে দেয়? ভাবতে ভাবতে বাণেশ্বরের বুকের ফিকব্যথাটা ফের চাগিয়ে ওঠে। অত চেষ্টা করে কিছুতেই শালাকে পথে ফেরানো গেল না! কি করে যাবে? দু'দিক থেকে দু' শক্তি যে বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। বিডিও পাট্টা দিল, জমিন বানাবার স্কীম দিল। নিতাই মাস্টার বুদ্ধি-বল-ভরসা দিল। তাতেই শালা একেবারেই মজে গিয়েছে। হায় হায়, দুটোতে মিলে কি মন্তর যে দিল ওর কানে! বাণেশ্বর ঘোষ তিল তিল করে তৈরী করলো যাকে, সে পাখি কিনা সুযোগটি পেয়েই উড়ে গিয়ে বসলো অন্য ডালে! এ দুঃখ কোথায় রাখি হে!

কিন্তু না। এটা হা-হুতাশের সময় নয়। রাগ-রোষেরও না। সময় আসবেই একদিন না একদিন। তখন সুদে-আসলে এর জবাব দেওয়া যাবে। বিডিও'টাকে এখান থেকে তাড়ানো দরকার। বড্ড গরীব-দরদী হয়ে উঠেছে শালা। আর নিতাই মাস্টারটাকেও খুঁজে বের করতে হবে। এ এক থানা হয়েছে যা হোক! যত সব অকর্মার ধাড়িগুলোর বাস। একটা মানুষকে আজ তিন বচ্ছর খুঁজে বের করতে পারলি নি তোরা? এই তোদের দৌড়? নিতাই-মাস্টারকে একটিবার ফাটকে পুরতে পারলে পুরো এলাকা অর্ধেক ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।

সহসা জঙ্গলের পথে চাঙের বাজনা আর গানের সুর ভেসে আসে।

ন্যাকা-সুধীর গান গাইতে গাইতে আসছে।

'ইনরোজের রেলগাড়িতে
কিসের পেরোজন
হায়রে আমার অবোধ মন— ।'

কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় ন্যাকা-সুধীর। বাণেশ্বরকে এমন সময়ে এই ফাঁকা পুকুর পাড়ে বসে থাকতে দেখে বুঝি কিঞ্চিৎ বিস্মিত। বলে, 'গোক্ষুর গেছ্‌ল তুমার দোর?'

'না।' বাণেশ্বরের দু'চোখ জ্বলে উঠেই নিভে যায়, 'শালা কি বলে?' বাণেশ্বর শুধোয়।

'অর মতিগতি ভালো নয়।' চাপা গলায় বলে ন্যাকা-সুধীর, 'রাতের বেলায়, ক্যানে জানি, এই পুকুরের পাড়ে অকারণ ঘুরিয়া বেড়ায়।'

অল্প চমক খায় বাণেশ্বর ঘোষ। বলে, 'তুই দেখছু?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় ন্যাকা-সুধীর। পা বাড়ায় ঘরের পানে। ঠোঁটের ফাঁকে গুনগুনিয়ে ওঠে গান, 'ইনরোজের রেলগাড়িতে কিসের পেরজন— ।'

আর এক দুর্ভাবনা সেঁধালো বাণেশ্বরের মনে। শালা এ পুকুর পাড়ে কি করে রাতের আঁধারে? খোঁজ নিতে হচ্ছে। পুকুরের চাঁদা-চিংড়িগুলো কুঁড়াজালি বসিয়ে ধরে নিচ্ছে, নাকি ভেতরে অন্য কোনও গূঢ় মতলব আছে? যাগ্‌গে, সে সব পরের কথা পরে। উপস্থিত সুদেব মিদ্যার মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। দু'এক দিনের মধ্যে কাজ হাসিল করতে না পারলে, পনেরো ভরি সোনা আর হাজার দশেক টাকা একেবারে অগাধ জলে পড়ে যাবে। কাজেই আজ সকালবেলায় নিজেই বেরিয়ে পড়েছে বাণেশ্বর ঘোষ। পায়ে পায়ে চলে এসেছে পাথরগেড়িয়ার পাশে। পাথরগেড়িয়া বাণেশ্বরের নিজস্ব পুকুর। পাড়ে একটা মান্ধাতার আমলের আশথ গাছ। ঐ গাছের তলাতেই থানা গেড়েছে বাণেশ্বর। হাতে তুলে নিয়েছে নাম জপের মালাখানি। আড়চোখে নজর রেখেছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের ওপারে শিলু-পাথরার ডাঙা! ওখানেই পাট্টা পেয়েছে গোক্ষুর। রোজ সকালে যায় জমি তৈরী করতে। জঙ্গল-ধারের রাস্তা দিয়েই ফিরতে হবে ওকে।

জায়গাটা জনশূন্য। লোকালয়ের বাইরে। কচিত দু' একজন যাতায়াত করছে পুকুরের পাড় দিয়ে। বাণেশ্বর ঘোষের মত মানী লোক এই গাঁ-ছাড়া পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে কেন, সে কৌতূহল সবাইয়েরই হতে পারে। তা, বাণেশ্বরের মুখে তৈরী জবাব। পুকুরটায় একবার জাল টানিয়া দেখবো, পোনাগুলা কত বড় হইল। দো-গাছিয়ার জালীদের আসবার কথা। এখনো আইলো নি ক্যানে যে! আর টুকে অপেক্ষা করি। গাছের আড়ালে এমন জায়গায় বসেছে বাণেশ্বর, যাতে গোক্ষুর ফেরার পথে ওকে সহসা দেখতে না পায়। দূর থেকে কোনও গতিকে দেখতে পেলেই শালা পালাবে। আজ একবার যে কোনও উপায়ে পাকড়াও করতে হবে ওকে। একটিবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। দরকার হলে আধাআধি বখরার লোভও দেখাবে। মোট কথা,

আজ আর কিছুতেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরছে না বাণেশ্বর ঘোষ।

ওদিকে নিশি কামারের বাড়ির ঈশেন কোণে পঞ্চমুণ্ডির আসন পেতেছে শ্যাম চক্রবর্তী। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে তান্ত্রিক মতে হোম-যজ্ঞ।

শ্যাম চক্রবর্তী ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার করে ফেলেছে নিশির উঠোন। 'ফট্-ফাট্' আওয়াজ তুলে মন্ত্র পড়ছে। আসার সময় শুনে এসেছে বাণেশ্বর।

সারাদিন ক্রিয়াকর্ম চলবে। পূর্ণাহুতি নাকি সেই শেষ রাতে। ঐ সময়েই বংশীর শরীর থেকে শক্তি হরণ হবে। ওর পায়ের নখ সুনীল মান্নার মাধ্যমে নিশির কাছে যথাসময়ে পেঁছে দিয়েছে বাণেশ্বর। শালা একেরে চুষা আখটি হয়্যা যাউ। শালার অতবড় সাহস, বাণেশ্বরের পোঁতা গাছের ফল চুরি করে! তন্ত্র-মন্ত্র, গুণীন বিদ্যাকে ভেতরে ভেতরে বিশ্বাস করে বাণেশ্বর। তার কোমরে এখনো ঝুলছে শ্যামের বাপ বিপিন চক্রবর্তীর দেওয়া অষ্টধাতু কবচ। দেখা যাক, এমন মানুষের ব্যাটা কতটুকু শিখেছে বিদ্যাটা। মাসটাকের মধ্যেই মালুম হবে।

সহসা মেঘ না চাইতেই জল। বাণেশ্বর ঘোষ দেখলো, দূরে আসছে গোক্ষুর ভক্তা। কাঁধে কোদাল, হাতে ঝুড়ি। বাণেশ্বর ঘোষ নড়ে চড়ে বসলো। সব দিক থেকে প্রস্তুত করে নিলো নিজেকে।

কিছু গাছ পাতা ঝরাতে শুরু করেছে। নিম গাছের হলুদ পাতা খসে খসে হাওয়ায় দুলছে। কয়েকটা হাড়-জিরজিরে গরু পুকুরের অন্য পাড়ে চরছে।

গোক্ষুর ভক্তা মাটির দিকে মুখ নাবিয়ে বুঁদ হয়ে হাঁটছিল। গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসেছিল বাণেশ্বর। সহসা চাপা গলায় ডাকলো সে।

'গোক্ষুর নাকি রে?'

চমকে তাকালো গোক্ষুর। আচমকা এমন থানে বাণেশ্বর ঘোষকে দেখে থতমত খেলো। মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো তার।

ধীর পায়ে বাণেশ্বরের পাশটিতে এসে দাঁড়ালো গোক্ষুর। ভারি বিপন্ন লাগছিল ওকে। জোর করে এক চিলতে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো সে।

'কি রে, কেমন আছু?'

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না গোক্ষুর। মুখে কাষ্ঠ-হাসি ফোটায়। বলে, 'আমাদের ফের থাকাথাকি! না মরিয়া বাঁচিয়া আছি।'

'তোকে তো ডাকলেও যাউ নি। অমনই লেজ মোটা হইয়া গেছে তোর!'

'টাইম পাই না ঘোষদা। পেটের দানা জুগাতেই কোমরের বাঁধন টুইটো যায়।' গোক্ষুরের গলায় অপরাধ চাপা থাকে না। 'সকাল থিক্যে দুফোর তক্ক ডাঙা জমিনে কোদাল চালিয়া আর লড়বার শক্তি থাকে না।'

'বটে!' বাণেশ্বর ঘোষ খটখটে গলায় বলে, 'এখন আর টাইম পাবি নি তুই। এখন বড় ঘাটে নৌকা বাঁধছু। এখন বিডিও'র সঙ্গে তোর উঠা-বসা! তা সে যাগ্‌গা। মোর টাকা ক'টা কবে দিবি, ঐটুকুই জানতে চাই। ব্যস্।'

গোক্ষুর বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

'সুদে-আসলে দু'হাজার পারিয়া গ্যাছে। টাকাটা কি মারিয়া দিবার তাল কচ্ছু?' বাণেশ্বর সোজাসুজি চোখ রাখে গোক্ষুরের চোখে।

'দু' হা-জার!' প্রায় আঁতকে ওঠে গোক্ষুর।

'আঁতকিয়া উঠ্‌লি যে? ভিটা বন্ধক দিয়া তিনশো লিছ্‌লি, একটা পইসাও ঠেকাউ নি। তা বাদে, বার পাঁচ-ছয় জামিন লিবার খচ্চা, সেটাও মুই দিছি। গেল দু'তিন সন যত কেসের তারিখ পড়ছে, সব সামাল দিছি মুই। হিসাব চাইলে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া দিবো। টাকাটা কবে দিবি, সেই দিনটি জানতে চাই আইজ, ঠিক ঠিক।'

'অতগুলো টাকা, হুট করিয়া—।'

'না, না। আর একদিনও ফেলিয়া রাখতে পারবো নি মুই। রামেশ্বরের খুনের কেস চালিইতে টাকা খচ্চা হচ্ছে জলের মতন। তার উপর অরু ঝি আবার সম্পত্তির ভাগ দাবী করিয়া কেস রুজু কচ্ছে। পেরায় ফতুর হইত্যে বুস্‌ছি মুই। তোর পেরাণে কি টুকে দয়া-মায়া নাই রে?'

গোক্ষুরের সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরছিল। ময়লা গামছায় ঘামগুলো মুছতে মুছতে সে চারপাশে বোবা দৃষ্টি চারাতে থাকে। চারদিকে সোনার বর্ণ ধান। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। দিগন্তের গা ঘেঁষে তুলোর পাহাড়। গোক্ষুর আকাশ দেখে, গাছ-গাছালি, জঙ্গল, ক্ষেত-মাঠ সবকিছুর মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। বলে, 'অত টাকা মুই কুথা পাবো ঘোষদা? আরো কিছোদিন সবুর ধর।'

'কিছোদিন?' বাণেশ্বর ঘোষ কটমট করে তাকিয়ে থাকে গোক্ষুরের দিকে, 'কিছোদিন বাদে তুই টাকাটা দিবি কি করিয়া, সেটা বল্‌ দেখি, শুনি?'

গোক্ষুর সহসা জবাব দিতে পাবে না। কথাটা সে বললো বটে, কিন্তু কিছুদিন বাদেও এই বিশাল অঙ্কের টাকা শোধ দেবার কোনও উপায় সত্যিই জানা নেই তার।

'গুপ্ত ধনটন পাইছু নাকি রে?' চোখ নাচিয়ে শুধোয় বাণেশ্বর, 'যে ডাঙাটার পাট্টা পাইছু, তার তলায় সোনার ঘড়া-টড়া পুঁতা আছে নাকি? খুঁড়িয়া-টুড়িয়া মালুম হচ্ছে সেটা?'

বাণেশ্বরের ইলচিটা নিঃশব্দে হজম করে গোক্ষুর। কথা জোগায় না তার মুখে।

বাণেশ্বর এবার ঝুলি থেকে বের করে বেড়ালটি। 'এমনিতে তুই এ টাকা এ জন্মে শুধতে পারবি নি। আমি একটা বুদ্ধি দুবো? শুনবি?'

গোক্ষুর তাকায় বাণেশ্বরের দিকে।

গলাটা নামিয়ে বাণেশ্বর বলে, 'একটা বিরাট মওকা আস্‌সে। সুদেব মিদ্যার ঝি-র ব্যা-ঘর। পন্‌দরো ভরি সোনা আর লগদে দশ হাজার দিতে হচ্ছে পাত্রকে। সোনার বাজার সারিয়া ফেল্‌ছে সুদেব। মাল আছে অর ঘরে। পাক্কা খবর। অমন সুযোগ আর জীবনে পাবি নি তুই।'

গোক্ষুর নির্বাক তাকিয়েছিল বাণেশ্বরের দিকে। মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

'কাজটা যেদি নামাতে পারু গোক্ষুর— ।' বাণেশ্বর ঘোষ লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বলে, 'তোর কর্জে'র টাকা এক-দিনেই শোধ হয়্যাবে। পরের দিনই তোর দলিল-পত্তর ফেরত দিয়া দুবো।'

বেজায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে গোক্ষুর। বহুদিন বাদে মনটা ঈষৎ পাখনা ঝাপটাচ্ছে। তাঁও নিজেকে সামাল দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। 'না, ঘোষদা। যে কাজ ছাড়িয়া দিছি, আর ধরবো নি।'

'ধরিস নি।' আকুল হয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'কে বলছে তোকে ধরতে? শুধু এই কাজটা নামা তুই! শুধু এই কাজটা।'

গোক্ষুর চুপ করে থাকে। বুকের ভেতর সমুদ্রমন্থন চলছে তার। কখনো অমৃত ওঠে, কখনো গরল।

'এইটাই শেষ কাজ হবে তোর।' বাণেশ্বর ঘোষের গলায় উথলানো দুধের মতো মিনতি, 'যে কাজ বিশ-বচ্ছর ধরিয়া কল্লু, আর একটি বার, শেষবারের মতন কল্লে, কি অমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়্যাবে, বলু?'

গোক্ষুর ভক্তার চোখের সমুখে এই মুহূর্তে বাণেশ্বর ঘোষ নেই। রয়েছে পঞ্চমী। সাঁতরাপুরের রাসের মেলা থেকে ফেরার পথে দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে সে, তুমি কিরা কাড়, এ গু'খাবা বিদ্যা আর করবে নি। রয়েছে নিতাই মাস্টার। গোক্ষুরের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, চুরি করিয়া কি পাইলি জীবনে? তোর কষ্টের ধন অন্যে ভোগ কল্ল, আর তুই অশেষ নির্যাতন সইলি আর বারে-বারে জেল খাটলি। রয়েছেন বিডিও সাহাব।—গোক্ষুর দেখিস, আমার মুখখানা পোড়াস না যেন।

গোক্ষুর তাকায় বাণেশ্বর ঘোষের দিকে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে বাণেশ্বর ঘোষ।

'শুনু, গোক্ষুর, পষ্টাপষ্টি কথা বলছি মুই। সুদেব মিদ্যার ঘর থেকে যা পাবি ষাট মোর, চল্লিশ তোদের।' দু' চোখ কপালে তুলে দিয়ে বাণেশ্বর ঘোষ বলে, 'দুনিয়ার কুনো চোর কুনো কালে পায় নি অতখানি বখরা।'

'না, ঘোষদা।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে গোক্ষুর, 'যে পথ একবার ছাড়িয়া দিছি, সে পথ আর— ।'

'আধাআধি দিবো, যা। প্রায় সর্বস্ব দিয়ে দেবার ভঙ্গি করে বাণেশ্বর ঘোষ, 'আধাআধি বখরা পাইলে, ভাগে যা পাবি, তাতে মোর তাবৎ ঋণ শোধ করিয়াও দু'বিঘা জমিন কিনতে পারবি।' অল্প হাঁফাচ্ছিল বাণেশ্বর, 'থানা থিকে তোর যাবতীয় কেস তুলিয়া লিবার বেবস্থা করবো মুই। তার তরে যা খচ্চা হবে, সব মোর।'

গোক্ষুরের দু'চোখ পুকুরের জলের ওপর স্থির। দু'পায়ে সামান্য কাঁপুনি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'না ঘোষদা। মোকে তুমি ছাড়।' গোক্ষুর বাড়ির দিকে মুখ ফেরায়,

'যে থুতু ফেলিয়া দিছি, তা ফের চাটবো নি।' এক-পা দু'পা করে বাড়ির পথ ধরে গোক্ষুর।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাণেশ্বর ঘোষ। দু'চোখে তীব্র গরল। চোখের পাতানি পড়ছিল না তার। পা থেকে মাথা অবধি কাঁপছে অন্ধ রোষে।

পেছন থেকে চাপা ধমক দেয় বাণেশ্বর ঘোষ, 'দাঁড়া।'

থমকে দাঁড়ায় গোক্ষুর।

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললু তুই!' সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'তেবে শুনিয়া লে। তোর ওষোধ আজ থিকেই ঘুটতে লাগলাম মুই। তোর ভিটা বাড়ি সব লুবো। সাতদিনের ভিতর পুলিশ ধরবে তোকে। দশটা ডাকাতির কেসে জড়াবো তোকে। যার সাথে ইদানিং লটর পটর চলছে, সে মায়ার নরম কোড়ে শুআ তোর ঘুচিয়া দিবো জন্মের মতন। দেখি, তোর কুন্ বাপ এবার বাঁচায় তোকে!

থর থর করে কাঁপছিল বাণেশ্বর ঘোষ। হাতের আঙুলগুলো জপের মালার ওপর স্থির থাকতে পারছিল না কিছুতেই। দু' চোখে সাক্ষাৎ পিশাচের চাউনি।

গোক্ষুরের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় বাণেশ্বর ঘোষের এই রূপ দেখে। গা ছমছম করতে থাকে তার। নাভিমূলে সুড়সুড় করে। সহসা পিছু ফিরে দৌড় লাগায় বাড়ির দিকে।

॥ তেইশ ॥

পঞ্চমী অন্তঃসত্ত্বা।

জেনে অবধি গোক্ষুরের মনে খুশী আর ধরে না। সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে যখন তখন পঞ্চমীকে টেনে নেয় কাছে। আদরে, সোহাগে পঞ্চমীর একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম। খাঁচা-সার মানুষটার গায়ে জোর আছে বেশ। পাকে-প্রকারে টের পাওয়া যায় সেটা।

এখন পঞ্চমীর বনে-জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ। গোক্ষুরই ধমক-চমক দিয়ে বন্ধ করেছে। পোয়াতি শরীর নিয়ে কেউ জঙ্গলে যায় ফের? কি হইতে, কি হয়!

ফলে সংসারটা পুরোপুরি চড়েছে গোক্ষুরের ওপর। দিনকতক ধান কাটল ঠিকায়। ঠিকা ছাড়া দিন মজুরীতে শরীর বয় না ওর। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এক নাগাড়ে কাজ করতে পারে না রোদে পুড়ে। ঠিকা কাজে সময়ের বালাই নেই। কাজের পরিমাণ অনুযায়ী দাম। শেষ রাতে গিয়ে কাজে নামে গোক্ষুর। বেলা আটটা নটা অবধি কাজ করে। আবার বিকেল থেকে শুরু করে। চলে রাত দু' ঘড়ি তক। ফলে দিন-মজুরী সে কোনদিনই পায় নি। তাও চলে যাচ্ছিল সংসার। ধান কাটা শেষ হয়েছে।

এখন ঐ নিজের পাট্টা পাওয়া ডাঙাটিকে ক্ষেত বানানোর কাজটাই রয়েছে। তাও সে, দিন কয়েকের কাজ। তার পরই শুরু হবে দুর্দিন। তখন একমাত্র জঙ্গলই ভরসা।

আজ পাট্টা জমিতে কাজ নেই। ব্লক থেকে শেষ কিস্তির টাকা আসে নি বলে, দু' এক দিন কাজ বন্ধ রেখেছে মধু মল্লিক। কাজেই সকাল থেকে ঘরেই রয়েছে গোক্ষুর। ইদানিং কাজকর্ম না থাকলে ঘরে থাকতেই ভালো লাগে। পঞ্চমীর সঙ্গে খুনসুটি করে বেশ কেটে যায় সময়।

ইদানিং সমস্ত প্রসঙ্গকে ছাড়িয়ে যায় ঐ একটি প্রসঙ্গ। একজন আসছে পঞ্চমীর পেটে। কবে আসবে সে, কেমনটি হবে, এই ভাবনায় মশগুল দু-জনেই। যা কিছু ঠাট্টা-তামাশা, জাল বোনাবুনি, ঐ নিয়েই। আজও সকাল থেকে তাই চলছিল।

পুবের পাকশালে বসে ভাত ফোটাচ্ছিল পঞ্চমী। রান্না-বান্নার ফাঁকে ফাঁকে সুখ-ভাবনায় ডুবেছিল।

বাইরে, বারান্দায় বসে চুটা ধরাবার তরে আগুন চেয়ে পায় নি গোক্ষুর। 'দিই।' বলেই ফের সুখ-ভাবনায় ডুবে গেছে পঞ্চমী। দ্বিতীয় তাগিদে লজ্জা পেয়ে আগুন নিয়ে বাইরে বেরোতেই খোঁটা দেয় গোক্ষুর।

'কি রে, একজন আসতে না আসতে না আসতেই যে মোকে ভুলিয়ালু তুই।'

লজ্জায় তখন মরে যাচ্ছে পঞ্চমী। তাও ধরা দিতে চায় না।

'ভুলিয়া যাইতে হবে। হারি পিসি কইছে।' প্রাণপণে হাসি চেপে বলে পঞ্চমী।

চুটা ধরাতে গিয়েও হাত থেমে যায় গোক্ষুরের। বলে, 'মোকে ভুলিয়া যাইতে কইছে? হারি পিসি?'

নিরিহ ভঙ্গিতে মাথা দোলায় পঞ্চমী, 'হুঁ'। বলে, 'হারি পিসি কইছে, সোন্দর সোন্দর মু দেখবি পঞ্চমী। ঠাকুর-দ্যাবতার মু। কিষ্টো ঠাকুরের পারা ব্যাটা হবে তোর। মা-দুগ্গার মতন ঝি। খ্যারাব মু আর কু-দিশ্য দেখবি নি, মনেও আনবি নি কদাপি।'

গোক্ষুর ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে, পঞ্চমী রগড় করছে। মুখের গাম্ভীর্যটুকু বজায় রাখে সে।

বলে, 'আচমকা দৈত্য-পিচাশ ঝাঁপিয়া পড়িয়া আঁকড়িয়া ধল্লে, কি কত্তে হবে, হারি পিসি সেটা কয় নি?'

'না!' বলেই পালিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চমী।

গোক্ষুর চক্ষের পলকে ধরে ফেলে ওকে। সবলে জাপটে ধরে বলে, 'আইজ গিলিয়া খাবো দু'জনকে। তোকে আর তোর ছা'কে।'

বলেই বিশাল হাঁ করে সে।

ক্ষেপে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল পঞ্চমী। প্রবল আবেগে মুখ লুকোয় গোক্ষুরের পাঁজরসার বুকে।

ঘরের চালে একটা কাক ডাকছে অনেকক্ষণ। চেরা গলায় কা-কা জুড়েছে। থামছে না কিছুতেই। ভারি অসহ্য লাগে ডাকটা। যেন শব্দবাণ মেরে চুষে নিচ্ছে পঞ্চমীর শরীরের তাবত সুখ, আনন্দ।

সহসা কেমন যে উদাস হয়ে আসে মন। পার্বতীর কথা মনে পড়ে যায়। গতকাল দুপুরে এসেছিল। সেই থেকে মনটা ভালো নেই। এক সময় মুখ তোলে পঞ্চমী।

বলে, 'জান, পার্বতীটার বোধ করি বাচ্চা-কাচ্চা হবে নি।'

'ক্যানে?' গোক্ষুর মুখ তুলে তাকায়।

নামো পাড়ার বৈদ্য মল্লিকের বউ পার্বতী। বছরটাক আগে বিয়ে হয়েছে ওদের।

গোক্ষুর ফের শুধোয়, 'বাচ্চা হবে নি ক্যানে?'

'অই যে, পুড়া মুহা বংশী ভঞ্জ—।' পঞ্চমী গলা দিয়ে উগরে দেয় গরল, 'বৈদ্যাকে লিয়া গিয়া অপারিশন করিয়া লিয়া আসসে কবে। মহাপাপ নয় এগুলা? পেটের দায়ে উন্মাদ বলিয়া, তুই বুঢ়া মরদ, কুন্ আক্কেলে কাঁচা ছগরাটাকে লিয়া গেলি হাসপাতালে?'

গরগর করতে থাকে পঞ্চমী। ধীরে ধীরে মুখখানি ম্লান হয়ে আসে। অজান্তে মোচড় দেয় বুকে। ডিহিপারে আসা ইস্তক ভারি ভাব হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে। বড় ভালো মেয়ে।

বৈদ্য মল্লিকও ছেলে ভালো। বড় সরল ছোকরা।

'সে তো বছরটাক ছিল নি পাড়ায়। গেল আশ্বিনে ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসসে। এর মধ্যে কবে পড়িয়া গেল বংশী ভঞ্জর জালে?' ফ্যাল ফ্যাল চোখে শুধোয় গোক্ষুর।

পঞ্চমী শোনায় পুরো ঘটনাটা।

গেল ভাদ্র থেকে কার্তিক অবধি যত জোয়ান মরদকে অপারেশন করাতে নিয়ে গেছে বংশী ভঞ্জ, তার বারো আনাই চার পাশের লোধা পাড়ার। শুধু জোয়ান মরদই নয়, আশ্বিন-কার্তিকের তীব্র খাদ্যাভাবের দিনে, ভোখ খিঁচতে না পেরে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে বংশী ভঞ্জর পিছু ধরেছিল ষাট-সত্তর বছরের বুড়োরাও। ডাক্তাররা নাকি রাজি হয় নি এদের পিছনে মূল্যবান সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে। বংশী ভঞ্জ নিজের প্রভাব খাটিয়ে বহু মেহনতে রাজি করিয়েছে। সেই বাবদ দক্ষিণার অর্ধেকটাই নিয়েছে সে। বুড়ীগুলো ততটা নয়, কিন্তু লোধাপাড়ার যুবতী, মাঝ-বয়েসী বউরা একেবারে নিম-তিতা ক্ষেপেছে বংশীর ওপর। তক্কে ছিল ওরা। চণ্ডাল রাগটা পুষে রেখেছিল মনের গভীরে। তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। আজ সুযোগটি পেয়েই ফণা তুলেছে ওরা সাক্ষাত কাল নাগিনী হয়ে।

আজকের ব্যাপারটি ঘটেছে বৈদ্য মল্লিকের ঘরে। মূল অপারেশন পর্বের দিনগুলিতে সে ছিল না ঘরে। কংসাবতী প্রজেক্টের কি একটা কাজে লেবারের কাজ করছিল ঠিকাদারের অধীনে। বংশী ভঞ্জই সাপ্লাই দিয়েছিল যমুনা,

ডিহিপার মিলিয়ে প্রায় জনা বিশেক লোধা ছোকরার সঙ্গে, বৈদ্য মল্লিককেও। প্রায় বছরটাক ঘরে ফেরে নি অরা। বৈদ্য মল্লিকের ঘরে ছিল তার নতুন বউ, অন্ধ মা, আর পক্ষাঘাতে এক-হাত, এক-পা পড়া বাপ। মাসে মাসে টাকা পাঠাতো বৈদ্য। পুরো সংসারটা চাতক পক্ষীর মত তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। তো, রাজমিস্ত্রীর সাথে জোগাড়দারের কাজ করতে করতে উঁচু মাচা থেকে আচমকা পা ফসকে পড়ে যায় বৈদ্য মল্লিক। তিনটি মাস পড়ে থাকে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে। প্লাস্টার খোলার পর ঘরে আসে আশ্বিনে। এমনিতে, ফি-মাসের পয়লা হপ্তায় মাইনে পেয়ে, পাড়ার একজন কেউ এসে, সব ঘরে দিয়ে যেত টাকা পয়সা। বৈদ্য মল্লিকের যখন কাজ ছিল, তার ঘরেও টাকা আসতো নিয়মিত। ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে বেমালুম। সুস্থ হয়ে, ঘরে ফিরে, বৈদ্য মল্লিক দেখলো, তার সংসারের অবস্থা শোচনীয়। একেবারে ছুঁচোর কীর্তন চলছে। বউটা এ ক'মাসে শুকিয়ে পোড়া কাঠ। একেবারে অস্থি-চর্ম-সার হয়েছে। দু'চোখ ঢুকে গেছে কোটরের অতলে। সে দৃশ্য দেখা যায় না চোখ মেলে।

বৈদ্য মল্লিক ফিরে আসার পর অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না। বৈদ্য মল্লিক তার দুর্বল শরীর নিয়ে কাজ কাম করতে পারে না। অথচ, এই ঘোর কার্তিকে, ও ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেট বেড়ে গেছে সংসারে। সেই সুযোগটাই নিতে চাইছিল বংশী। আড়ালে-আবডালে ফুসলাচ্ছিল বৈদ্য মল্লিককে। মালিকের খাতায় নামকাটা কুলি তুই। মাটি কাটারও ক্ষমতা নাই শরীরে। বউটা দিনভর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বুলে। কাঠ-খোঁচা বিকিয়া অতগুলা পুষার পেটের গভ্ভর কি আর ভরাতে পারে ঐটুকু মায়া-মানুষ। কাজেই, ভালো বুদ্ধি বলছি তোকে। চল্ হাসপাতালে, অপারিশনটা করিয়া লে। করকরে একশটা ট্যাকা পায়াবি। সক্কলে পঁচিশ করিয়া দেয়। তুই কুড়ি দিবি, যা। আমতা আমতা করছিল বৈদ্য মল্লিক। যেদি কাজ-কারবার কইরবার ক্ষমতা লোপ পায়া যায়?

'দুশ্ শালা!' বংশী টিটকিরি করে ওঠে বৈদ্য মল্লিকের অজ্ঞতায়—'কাজ-কারবার সব চলবে, শালা! সব ব্যবস্থা হ্যাবে। ডাক্তারের সাথ ফিট করা আছে। তুই চল্ না।'

শেষমেষ নিমরাজি হয়েছিল বৈদ্য মল্লিক। পার্বতীকে লুকিয়ে বংশীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল একদিন। অপারেশন করে ফিরে এসেছিল দিন দুই বাদে।

কথাটা কিন্তু গোপন রাখতে পারে নি পার্বতীর কাছে। একদিন কোন্ দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশ করে ফেলেছে।

পঞ্চমী পুরো ঘটনাটা বিতাং করে শোনায় গোক্ষুরকে। গোক্ষুর হাঁ হয়ে শুনছিল। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না তার।

থমথম করছিল পার্বতীর মুখ। বলে, 'কাল দুফোরে আসথল-অ পার্বতী। কত কাঁদল! কত শাপ্লো বংশী ভঞ্জকে। শুনিয়া অবধি মনটায় তিলমাত্র শান্তি নাই মোর।'

চুপটি করে বসেছিল গোক্ষুর। শেকড় ওপড়ানো লতার মত ঝিমিয়ে গেছে সে। একটা তাজা-তরুণ দম্পতি, শতখানেক টাকার তরে, জীবনটা বরবাদ করে দিল! ভাবা যায় না! একসময় বলে, 'বংশী যখন আনাগোনা জুড়ছিল, তখন থিক্যেই সতরু হবার দরকার ছিল পার্বতীর।'

'সতরু হয় নি ফের! চব্বিশ ঘণ্টা আগুলিয়া রাখিয়াও পারে নি অভাগী। একদিন নাকি বংশী ভঞ্জর পা জড়িয়া ধচ্ছল-অ একান্তে। মোর মরদটাকে ছাড়ানু দও, ভঞ্জদা। নচেত আত্মঘাতী হবো মুই। কাঁদিয়া বুক ভাসিয়া দিছুল পুড়ামুহার সামনে। আরে, না, না। তোর ভাতারকে লিয়াবো নি। মুই কি অতখানি পাষণ্ড? তদের জীবনের পুরা সাধ-আহ্লাদটাই ত বাকি এখনতক। মুড়ামুহা নাকি অমন ভাষায় কথা দিছুল পার্বতীকে। কিন্তু উই যে কথায় আছে, চরা কভু নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী। মেয়াটার সর্বনাশ করিয়া তবে ছাড়ল!'

বিড়বিড় করে গোক্ষুরের সামনে কথাগুলো বলতে থাকে পঞ্চমী। দুচোখে জমে ওঠে তীব্র গরল। বলে, 'যদি কুনোদিন ভেট হয় পুড়ামুহার সঙ্গে, জুমড়া কাঠ দিয়া পুড়িয়া দুবো মু।'

বেলা বাড়ে। একসময় কাকটা উড়ে যায় দূরে। পঞ্চমী উঠে দাঁড়ায়। ভাতটা, বোধ লেয়, ফুটে গেছে এতক্ষণে।

বিকেল নাগাদ আচমকা উঠোনে ঢুকলো নিশি কামার। চাটাই পেতে শুয়েছিল দু'জনে। প্রথম শীতের শেষ বিকেলের মিঠে রোদ। উঠতে ইচ্ছে কচ্ছিল না। কিন্তু নিশি কামারকে দেখে প্রথমে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো পঞ্চমী। তারপর গোক্ষুর।

একটা বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করেছে গোক্ষুরের মনে। নিশি কামার হলো, বাণেশ্বর ঘোষের পড়শী। ট্যাঁকের লোক। গোক্ষুরের সিঁদকাঠির যোগানদার ছিল চিরকাল। বড্ড মাথা-গরম লোক। গোঁয়ার। বাণেশ্বর ঘোষ ওকে সাক্ষী খাড়া করেছে রামেশ্বরের খুনের কেস-এ। ও নাকি খুনীদের দেখেছে ঠিক খুন করে বেরোবার মুহূর্তে। টর্চটি টিপেই নাকি একসঙ্গে রামেশ্বরের দু'শালাকে দেখে ফেলেছে। অথচ গোক্ষুর তো জানে, রামেশ্বর ঘোষের শালা, শ্বশুর, কত ভালো লোক! গোক্ষুরের চেয়ে বেশি কে জানে সেটা? বাণেশ্বরের উস্কানিতে দু'-দু'বার ওদের ঘরে ঢুকেছে গোক্ষুর। প্রতিটি ঘরে ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে নিয়েছে মাল। তিলেকের তরে ঘুমটি ভাঙে নি কারো। না বুড়ার, না ব্যাটাদিগের। অমন নিটোল ঘুম গোক্ষুর তার চোরা-জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখে নি। লোক ভালো না হলে অত নিটোল, মারা দুধের মতন গাঢ় ঘুম হয় না মানুষের। তাদেরই কিনা খুনের কেসে জড়িয়ে হয়রাণ করছে বাণেশ্বর ঘোষ! আর, তার প্রধান সাক্ষী হয়েছে এই শালা নিশি কামার!

গোক্ষুর কাষ্ঠ হাসি হাসে। শুধু বিরক্তিই নয়, মনে মনে ভয় পাচ্ছে

গোক্ষুর। বাণেশ্বর ঘোষের নিজের লোকটি এই অবেলায় এসে হাজির। কুন্ কুপ্রস্তাব লিয়া আস্‌সে, তার ঠিক কি?

'বুস-অ।' ঠান্ডা গলায় বলে গোক্ষুর। সরে বসে জায়গা করে দেয় নিশিকে।

নিশি বসে। থমথম করছে মুখ। বলে, 'আইলাম।'

সে তো দেখতেই পাচ্ছে গোক্ষুর। ওর থমথমে ভাবখানা আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে। কোনও খারাপ খবর বয়ে আনে নি তো কামারের পো?

নিশি কামার বলে, 'গোখরা, নিতাই মাস্টার অখন কুথায় রে?'

ধ্বক করে ওঠে গোক্ষুরের বুক। নিতাই মাস্টারের খোঁজ করছে কেন? তাও গোক্ষুরের কাছে! নিতাই মাস্টারের সঙ্গে যে গোক্ষুরের কিছুমাত্র যোগাযোগ রয়েছে, তা তো নিশির জানবার কথা নয়। গোক্ষুরের সর্বাঙ্গে সতর্কতার ঘণ্টা বেজে যায় নিমেষে। মুখখানাকে যদ্দুর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে তাকায় নিশি কামারের দিকে। বলে, 'মুই কি করিয়া জানবো? মোর সাথে তার সাঙ্ কি?'

'তুই জানু গোখরা।' গলায় মিনতি ঝরে পড়ে নিশি কামারের, 'বল্, কুথায় পাবো নিতাই মাস্টারকে? মোর বড় বিপদ।'

নিশি কামারকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল গোক্ষুর। সন্দেহে কালো হয়ে আসছিল মুখ।

তাই দেখে নিশি কামার বলে, 'একবার অর সাথে মোর ভেট করিয়া দে গোখরা। লচেত মুই বাঁচবো নি।'

'তুমার বিপদটা কি শুনি?' কুতকুতে চোখে তাকায় গোক্ষুর।

'রামেশ্বর ঘোষের খুনের সাক্ষীর দিন পড়ছে পরশু।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলে নিশি কামার, 'পরশু মোকে সাক্ষী দিতে লিয়া যাবে সদরে।'

'লিয়া যাবে ত যাও।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রুষ্ট গলায় গোক্ষুর বলে, 'মিচ্ছা সাক্ষী দিয়া আইস।'

'কি করিয়া দুবো?' প্রায় ককিয়ে ওঠে নিশি কামার, 'শ্যাম ঠাকুর বার বার বলিয়া দিছে, মিচ্ছা সাক্ষী দিলে সর্বনাশ হয়্যাবে মোর।'

'কি সর্বনাশ হয়্যাবে?' গোক্ষুর যেন রহস্যের গন্ধ পায়।

অল্পক্ষণ ভাবে নিশি কামার। তারপর বিড়বিড়িয়ে বলে, 'সে মোর ঘরের কথা। পাঁচজনকে বলা নিষেধ। কিন্তু ঠাকুর ছুঁয়্যা কিরা কাড়ছি মুই। মিচ্ছা কথা কইয়া অন্যের সর্বনাশ করবো নি। ঘি-হাতে শপথ করিয়া সেই ঘি হোমের আগুনে ঢালছি। মোর শরীলের সব শক্তি লষ্ট হয়্যাবে রে—!'

নিশি কামারের কথার সত্যি-মিথ্যা বুঝে উঠতে পারে না গোক্ষুর। বলে, 'তা, নিতাই মাস্টারকে কি দরকার?'

'বাণেশ্বর ঘোষ বলিয়া দিছে, পরশু ভোরের বাসে সদরে যাইতে হবে। মুই কইলাম, মিচ্ছা সাক্ষী মুই দিতে পারবো নি। শুনিয়া ঘোষ রাগিয়া টং হয়্যা গেছে। মোর ভিটা বাড়ি, জমিন-জিরাত যা যা বাঁধা আছে অর পাশ,

সব লিয়া লিবে।' বলতে বলতে হাঁফাতে থাকে নিশি কামার, 'শ্যাম ঠাকুরের দোরে গেছলাম। সে ঘরে নাই। বেলটি না কুথা গেছে। অখন আমি কি করি? কেমন করিয়া রক্ষা পাই ঘোষের রোষ থিকে? তুই মোকে একটিবার নিতাই মাস্টারের সাথে ভেট করিয়া দে। তার থিকে বুদ্ধি-ভরসা লেই। অখন সে ছাড়া গতি নাই মোর।' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকে নিশি কামার এবং অত বয়েসী লোকটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে।

গোক্ষুর তবুও ভরসা পায় না। এসব কিছু বাগেশ্বর ঘোষের ফাঁদ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বলে, 'তুমি রাত করিয়া আইস একবার। নিতাই মাস্টারের মতামত বলিয়া দুবো তুমাকে। অর সাথে দেখা হবে নি তুমার।'

নিশি কামার উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে উঠোন পেরিয়ে চলে যায় সে।

গোক্ষুর অল্পক্ষণ বসে থাকে। তারপর চালের বাতা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে পা বাড়ায় যমুনার দিকে।

পঞ্চমী একটি কথাও শুধোয় না গোক্ষুরকে।

॥ চাব্বিশ ॥

বহুদিন বাদে নিজের পাড়ায় ফিরেছে নিতাই মাস্টার। সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে গা মিশিয়ে চুপিসারে ঢুকেছে। নিজের বাড়িতে ঢোকেনি। বলা যায় না, কতগুলো চোখ নজর রেখেছে ওর বাড়ির ওপর! কোটালচকের একেবারে শেষপ্রান্তে শ্যাম চক্রবর্তীর ঘর। সুড়ুত করে ঢুকে পড়েছে। পিছু পিছু মধু মল্লিক আর মুকুট মল্লিক।

শ্যাম চক্রবর্তী বলে, 'চা খাবে ত মাস্টার? গুড়ের চা খাইতে হবে কিন্তু।'

নিতাই মাস্টার তাকায় শ্যাম চক্রবর্তীর দিকে। 'থাক। আর ভদ্রতা দেখাতে হবে নি।' চোখ দিয়ে ভৎ'সনা করে শ্যামকে, 'ঠেকায় পড়িয়া কতদিন যে ঐটুকুও জুটে না।'

গেলাসে গেলাসে চা নিয়ে ওরা বসলো আলোচনায়। কিছুদিন আগে, ধান কাটার মরসুমে, মজুরী-বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করেছিল নিতাই মাস্টারের দল। বেশিদিন চালাতে পারে নি। বড় প্রতিকূল পরিস্থিতি। তিনদিনের মাথায় পুলিশ এসে চড়াও হল দোরে দোরে। ধরে নিয়ে গেল মধু মল্লিক, মুকুট মল্লিক, ভানু দে আর চণ্ডী দাসকে। লেবার ক্ষেপাচ্ছিস কেন তোরা? মাঠের ফসল নষ্ট হচ্ছে মাঠে। ফসল হলো জাতীয় সম্পত্তি। দেশে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাবার দায়ে তোদের 'মিসা'য় ঢুকিয়ে দিতে পারি, তা জানিস?

'মিসা'য় অবশ্য শেষ অবধি দেয় নি। চুরি-ডাকাতি, শৃঙ্খলাভঙ্গ গোছের কিছু কেস দিয়ে ওদের চালান করেছিল সদরে। মাসখানেক জামিন পায় নি।

দিন পড়েছে। পরের তারিখে বহুত সাধ্য-সাধনা করে খালাস করেছে এদের। তাও নিঃশর্ত খালাস নয়। হপ্তায় তিন দিন থানা হাজিরা দিতে হবে প্রত্যেককে। ভেঙ্গে গেল আন্দোলন। মজুরের দল সুড় সুড় করে হাজির হল জোতদারদের উঠোনে। পুরোনো রেটেই কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিল। আর কোনদিন হুট-মুট লেবার বয়কট করে গেরস্থদের বিপদে ফেলবে না, এমন কথাও দিতে হল তাদের।

শ্যাম ঠাকুর বলে, 'কি লাভ ইলো মাস্টার? শুধুমুদু কিছো লোকের কপালে জুটলো হাজত বাস। দু'তিনটা করিয়া কেস চাপিয়া বুসলো ওদের ঘাড়ে। তাবভ লেবার-ক্লাসকে হেঁটমুণ্ডু হয়্যা দাঁড়িতে হইল জোদ্দারদের খামারে… ।'

নিঃশব্দে চা খেতে থাকে নিতাই মাস্টার। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। চোখে-মুখে হতাশা চাপা থাকে না তারও। বড় কঠিন। এই বিশাল দেশে, জগদ্দল রাষ্ট্রযন্ত্রকে একটুখানি নড়ানো।

তাও বলে, 'এ হইল সমুদ্র-মন্থন, ঠাকুর। অমৃত, গরল দুই-ই উঠবে। হাজত বাস হইলো বটে। কেসও চাপলো কাঁধে। এটারও হয়ত দরকার ছিল। পুলিশ আর জোদ্দারদের জুলুম কেমন হইতে পারে, চারপাশের দশটা গাঁ'র লেবার-ক্লাস তার নমুনা পাইলো হাতে-নাতে।' একটুখানি থামে মাস্টার। তারপর বলে, 'লড়তে গিয়া হারিয়াল বটে। তবে শত্রুকে চিনতে পারলো কিছোটা। বুঝতে পারলো ওদের রূপ। শত্রু চিনাও কম জরুরী নয়, ঠাকুর।'

চা খাওয়া শেষ হতেই গেলাসগুলো জুটিয়ে নিয়ে ধুতে চলে গেল মুকুট মল্লিক। ঘরের একমাত্র লম্ফখানি নিয়ে চলে গেল সে পুকুর ঘাটে।

মধু মল্লিক চলে গেল নিতাই মাস্টারের বাড়িতে। বাসন্তী বৌদিকে খবরটা দেওয়া দরকার। রান্নাবান্না করে রাখে যেন। শ্যাম ঠাকুর পীড়াপীড়ি করছিল, মোর দোরেই চাট্টি খায়া যাও মাস্টার। নিতাই মাস্টার রাজি হয় নি। প্রায় দু'মাস নিজের ঘরে পা' দেয় নি মাস্টার। বহুদিন পরে এসেছে যখন, বাসন্তীর হাতেই চাট্টি ডাল-ভাত খাওয়ার সাধ হয়েছে তার।

বাইরে পচা পাঁকের মতো আঁধার। দু'হাত দূরে দৃষ্টি চলে না। নিকষ আঁধারে বসে রইলো ওরা। একটু বাদে ফিরে এলো মুকুট মল্লিক। বললো, 'কুণ্ডদীঘির পাড়ে টচ বাতির আলো দেখলাম তিন চারটা।'

'মাছ ধরছে।' শ্যাম চক্রবর্তী আশ্বস্ত করে, 'পুকুর কাটিরা পোনা ছাড়ছে বলক আপিস থিকে। চারা পোনাগুলো আঙুল আন্দাজ হইচ্চে।'

মধু মল্লিক আর মুকুট মল্লিক ফিরে আসতেই শুরু হলো আলোচনা। ভোট আসছে। দু'চার দিনের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যেতে পারে, এমন খবর পাওয়া গেছে।

নিতাই মাস্টার ভোটযুদ্ধের সম্ভাব্য কৌশলাদি ব্যাখ্যা করতে থাকে। বলে, 'এই ভোটে গোক্ষুরকে কাজে লাগাইতে চাই মুই।'

'কি করিয়া ?' শ্যাম চক্রবর্তী শুধোয়।

'গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং-এ মিছিলে সে ফাঁস করিয়া দউ বাণেশ্বর ঘোষ আর গুণাধর জানার কীর্তি। নিজের দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করিয়া লিয়া, এদের মুখোশও খুলিয়া দউ সে। পুলিশের ভূমিকাটাও খুলিয়া কউ মানুষকে।'

'তাতে লাভ কি হবে ?'

'লাভ ? গেল ভোটে বাণেশ্বর ঘোষ ছিল ওদের প্রার্থীর মুখ্য ইলেকশান এজেণ্ট। এবারও সম্ভবত সে-ই হবে এ তল্লাটে অদের দলের মুরুব্বি। বাণেশ্বর ঘোষের মুখে কালি পড়লে, সে কালি অদের প্রার্থীর উপরও পড়বে।'

ওরা ভাবতে থাকে ব্যাপারটা নিয়ে। একমত হতে পারে না।

কুকুর ডাকছে ফুলগেড়িয়ায়। একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে। শ্যাম চক্রবর্তীর খিড়কি পুকুরে বুঝি ঘাই মারলো বড় মাছ।

মধু মল্লিক বলে, 'গোঙ্কুর রাজি হবে কি ?'

অকে রাজী করাইতে হবে।' নিতাই মাস্টার উরু চাপড়ে বলে, 'সে তো আর মিচ্ছা বলতিছে নি।'

'অর প্রাণ সংশয় হইতে পারে।' পেছন থেকে বিড় বিড় করে মুকুট মল্লিক।

'মোরও মনে হচ্ছে তাই।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মধু মল্লিক বলে, 'এলাকার চোর-ডাকাতরা এটা সইবে নি মাস্টার। এটা অদের লাইনে গর্হিত কর্ম।'

ভাবনায় পড়ে যায় নিতাই মাস্টার। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় মৃদু টোকা পড়ে।

সবাই একসঙ্গে চুপ করে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে থাকে বাইরের শব্দ। চোখে-মুখে আশঙ্কা জমে।

শ্যাম ঠাকুর কাঁপা গলায় শুধোয়, 'কে— ?'

'মুই সুধীর কোটাল।' খুব চাপা গলায় জবাব আসে, 'জলদি কবাট খুল-অ ঠাকুর। কথা আছে।'

'ন্যাকা-সুধীর !!' সবাইয়ের মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে আসে। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ওরা।

'কি কথা ?' ভেতর থেকে শুধোয় শ্যাম ঠাকুর।

'জলদি খুল-অ।' সুধীরের গলায় চাপা অস্থিরতা।

নিমেষের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলে ওরা। নিতাই মাস্টারকে মাদুর দিয়ে মুড়ে শুইয়ে দেয় ঘরের কোণে। ওপরে চাপিয়ে দেয় রাজ্যের কাঁথা বালিশ। কাঁথা বালিশে ঠেস দিয়ে আড়াল করে বসে মধু মল্লিক আর মুকুট মল্লিক। শ্যাম চক্রবর্তী সন্তর্পণে কপাট খোলে।

ন্যাকা-সুধীর হাঁফাচ্ছিল। গলগলিয়ে ঘামছিল। চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল তার। বললো, 'নিতাই মাস্টার আছে তুমার দোরে। মুই জানি। জলদি পালিয়া যাউ। মাহা বিপদ অর শিয়রে।'

'কি বিপদ ?' সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে শুধোয় শ্যাম চক্রবর্তী।

'এক পল্টন পুলিশ লিয়া বড়বাবু আসুসে বাগেশ্বর ঘোষের দোরে। আর একটু বাদে ঘেরিয়া লিবে তুমার ঘর। থানায় লিয়া যাইতে, কালিয়াঘাইর ধারে গুলি করিয়া মারবে।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে ন্যাকা-সুধীর। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মধু মল্লিকের দিকে তাকিয়ে রোষে ফেটে পড়ে সহসা, 'শালা, বক্কা চৈতনের দল! মাদুর চাপা দিয়া ওকে রইক্ষা করবি তরা? প্রাণে বাঁচিইতে চাউ ত সোজা পাঠিয়া দে যমুনার ধার বরাবর পাথরঘাটার দিকে। ইস্, এতক্ষণে বোধ করি রওনা হয়্যাল শালারা। মাস্টার, ও মাস্টার, আর দেরি কল্লে তুমার বাঁচা দায় হবে।' ন্যাকা-সুধীরের শেষের কথাগুলো কান্নার মত শোনায়।

এত কথার পরও নিতাই মাস্টারের গায়ের আচ্ছাদন তুলতে ইতস্তত করছিল সবাই। দুষ্ট ব্যাটা। কত ছলই জানে! এত যে এর নিদারুণ ছলনা নয়, তা কে বলতে পারে!

সহসা মাদুর ঠেলে উঠে দাঁড়ায় নিতাই মাস্টার। চাপা গলায় বলে, 'তোরা সব যে যার ঘরের দিকে দৌড় মার। মুই চললাম।'

শেষ মুহূর্তে পথ আগুলে দাঁড়ায় শ্যাম চক্রবর্তী, 'উ যে ঠিক বলছে, সেটা বুঝছ কি করিয়া, মাস্টার? এটাও তো কুনো ফাঁদ হইতে পারে।'

'আসল-নকল বুঝতে পারি মুই।' বলেই দরজার দিকে পা বাড়ায় নিতাই মাস্টার। চৌকাঠ পেরোবার পূর্ব মুহূর্তে পলকের তরে ঘুরে দাঁড়ায়। মর্মভেদী দৃষ্টি ফেলে ন্যাকা-সুধীরের মুখের ওপর। দু'চোখে অপরিসীম বিস্ময়। একরাশ চাপা আনন্দে হীরের কুচির মতো জ্বলতে থাকে চোখ। পরমুহূর্তে নিকষ অন্ধকারে মিশে যায় ওর শরীর।

গাঁ ছাড়িয়ে নিতাই মাস্টার পাঁচশো গজও যায় নি, শ্যাম চক্রবর্তীর বাড়িখানা ঘিরে ফেললো পুলিশ বাহিনী। অন্যেরা সবাই যে যার মত গা-ঢাকা দিয়েছে অন্ধকারে।

সারা বাড়িখানি ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। নিস্তব্ধ, নিঝুম। পুলিশ বাহিনী দাপিয়ে বেড়ায় চৌহদ্দিময়। ঝলাক ঝলাক জ্বলে, নেভে পাঁচ-সেলী টর্চগুলো। শ্যাম চক্রবর্তী আছো? শ্যাম—। হাঁক পাড়ে চৌকিদার ত্রিবিক্রম। কারো সাড়াশব্দ নেই। যেন শ্মশানপুরী। গাঢ় সন্দেহে কালো হয়ে আসে বড়বাবুর মুখ। ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। রাত ন'টা-সাড়ে-ন'টায় এমন নিস্তব্ধ কেন এদের বাড়ি! শ্যাম? দরজা খোলো। নইলে খুব খারাপ হবে কিন্তু।

জানলা দিয়ে টর্চ মারেন বড় বাবু। এবং দেখেন, অন্ধকার ঘরের মধ্যে ধ্যানাসনে বসে পাথর হয়ে গেছে শ্যাম চক্রবর্তী। কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের লম্বা টিপ।

টর্চের আলো এবং হৈ-চৈ'তে চোখ খোলে শ্যাম ঠাকুর। তীব্র বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে কপাল। সর্বনাশা রোষ ফুটে ওঠে দু'চোখে।

ওকে সঙ্গে নিয়ে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে পুলিশ। নিতাই মাস্টার

ততক্ষণে বা পেরিয়ে গেছে পাথরঘাটা খাল।

বিষম ধন্দে পড়ে যান বড় বাবু এবং বাণেশ্বর ঘোষ। ন্যাকা-সুধীরের দেওয়া খবর, সে তো মিছে হবার নয়! তবে?

॥ পঁচিশ ॥

থানা থেকে এইমাত্র ফিরলো বাণেশ্বর ঘোষ।

মনটা কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল আজ। এ ক'দিনের ছুটোছুটি একেবারেই বৃথা যায় নি। এস-ডি-ও'র অর্ডারটা অবশেষে পাওয়া গেছে গোক্ষুরের বিরুদ্ধে।

সেদিন পাথরগেড়িয়ার পাড়ে গোক্ষুরের মুখ ঝামটা খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল রোষে। ঐ দিন যায় নারাণগড় থানায়। এবং বড়বাবুর নির্দেশমত জীবন মুহুরীকে দিয়ে একখানি দরখাস্ত লেখায় এস-ডি-ও সাহেবের উদ্দেশ্যে: অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, অধীন নিম্ন তপশীল-ভুক্ত বাস্তুজমিটি ডিহিপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীগোক্ষুরচন্দ্র ভক্তার নিকট হইতে নগদ মূল্যে ক্রয় করিয়া অধীনের নামে খাস কোবলা করিয়াছে। কিন্তু বিবাদী শ্রীগোক্ষুর ভক্তা আজ তিন বৎসর যাবত উক্ত বাস্তু জমির দখল দিতে টালবাহানা করিতেছে। এক্ষণে আগামী দোসরা মাঘ শুক্রবার অধীন তাহার খাস কোবলাকৃত সম্পত্তির দখল লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে বিবাদী শ্রীগোক্ষুর ভক্তা একজন কুখ্যাত দাগী ডাকাত এবং ভীষণ দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি হইতেছে। সে সর্বদা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা ও বসবাস করে। এমতাবস্থায় উক্ত সম্পত্তির দখল লইতে গেলে মারাত্মক শান্তিভঙ্গের সমূহ সম্ভবনা রহিয়াছে। এবং বাদী শ্রীগোক্ষুরচন্দ্র ভক্তা অধীনকে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে পারে। অতএব, বিধায় প্রার্থনা, অধীন যাহাতে তাহার স্বোপার্জিত অর্থে ক্রীত সম্পত্তির নির্বিঘ্নে দখল লইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতে মর্জি হয়।……এমন একটি বাঁধুনি দিয়ে লেখা দরখাস্তের গায়ে যদি থানার বড়বাবুর আট-লাইনের আগাম এনকোয়ারি রিপোর্ট থাকে, এবং ঐ রিপোর্ট যদি আগাপাস্তালা 'অধীন'-এর পক্ষে যায়, তবে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের, 'ও-সি উইল গিভ অল্ সর্টস্ অব্ প্রটেক্‌শন টু ফার্স্ট পার্টি' লিখে সই করে গোল শীল লাগানো ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় থাকে না। তাও লাগলো সপ্তাটাক। দিন তিনেক সদরে দৌড়ো-দৌড়ি। পেশকারকে তুষ্ট করার জন্য কিছু খরচাপাতি। অবশেষে আজ বেরোলো এস-ডি-ও'র অর্ডার।

অর্ডারখানি হাতে হাতে এনে থানায় দিয়েছিল বাণেশ্বর ঘোষ। সেই মোতাবেক দু'খানা চিঠির মোসাবিদা হল থানায় বসেই। একটি ও-সির তরফে। একটি বাণেশ্বর ঘোষের। দু'খানি চিঠি লেফাফায় ভরে, আঠা লাগিয়ে স্বয়ং পোস্টঅফিসে গিয়ে রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছে গোক্ষুরের ঠিকানায়। এ ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় নি বাণেশ্বর।

গায়ের ঘাম পুরোপুরি শুকোয় নি তখনো, উঠোনে এসে দাঁড়ালো গণেশ মিদ্যা। চোখ-মুখ ম্লান লাগছিল। উদ্বেগের ছাপ সারা মুখে। বাণেশ্বরের নজর এড়ায় না তা। কারণটাও এক্কেবারে অনুমানের অসাধ্য নয়।

'বড্ড শুকনা লাগছে যে রে। বোনের ব্যা-ঘরে খাটা-খাটনির ধকলটা গেছে অবশ্যি তোর ঘাড় দিয়াই।' বাণেশ্বর সস্নেহে হাসে, 'বোনটাকে ত' ভালা ভাবেই পার করিয়া দিলি। কুনো ত্রুটি নাই কুথাও। ভালো খচ্চা-পাতিও কল্ল সুদেব। বাহ্, বাহ্! আশা অখন কুথায়?'

'এখানেই আছে।' যান্ত্রিক গলায় কথাগুলো বলে গণেশ, 'অষ্টমঙ্গলায় আসছিল। যায় নি অখনতক্।'

'বাহ্। বেশ, বেশ।' পরিতৃপ্তির ছাপ বাণেশ্বরের সারা মুখে, 'মঙ্গল ইউ, কল্যাণ ইউ। জামাইটিও তো বেশ ভালো।'

কেমন উশখুশ করছিল গণেশ মিদ্যা। মন যেন উড়ছে অন্যত্র। বাণেশ্বর সেটা ভ্রূক্ষেপই করে না। সে তার নিজের কথায় মশগুল।

'ঠিক আছে। বোনের ব্যা-ঘরের ঝামেলা ত চুক্‌ল। এবারে অন্য কাজে-কর্মে মন দিতে হবে বাপ।' একটু ঘন হয়ে আসে বাণেশ্বর, 'ভোট বোধ করি নির্দিষ্ট টাইমেই হবে। দু'চার দিনের মধ্যেই ঘোষণা হবে বোধ লেয়। যদি ঘোষণা হয়, তবে যা শুনতে পাইলাম পর পর দু'চার দিন সদরে গিয়া, এক্কেবারে চমকিয়া যাবার মতন খবর পাবি তোরা। এবার তোদের দশ গুণ বেশি খাটতে হবে। বলিয়া রাখলাম আগে থিকে। কাল থিকেই ভোটার লিস্টগুলা লিয়া লাড়াচাড়া শুরু কর্।'

ম্রিয়মাণ হয়ে বসেছিল গণেশ মিদ্যা। চোখে মুখে চাপা বিরক্তি।

এক সময় বললো, 'তুমাকে একটা কথা জিগাবো বলিয়া আস্‌সি জ্যাঠা।'

'কি কথা রে?' গলা দিয়ে মধু ঝরে পড়ে বাণেশ্বরের।

'প্রণববাবুর জায়গায় নাকি আর্টস্ টিচারের ভ্যাকেন্সী এ্যাপ্রুভড্ হয়্যা আস্‌সে?'

বাণেশ্বর ঘোষ আচমকা থতমত খায়। গণেশ মিদ্যা যে হুট করে প্রশ্নটা করে বসবে—। খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেয় নিজেকে। আড়চোখে একবার দেখে নেয় গণেশ মিদ্যাকে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'কি করবো বল্? ডি-আই কিছোতেই রাজি হইলো নি। বলে, এ ইস্কুলে নাকি সাইন্স-মাস্টার অনুপাতে বেশি হয়্যা গেছে। আর সাইন্স মাস্টার দিয়া যাবে নি। শালা, এ গরমেণ্টের এমন সব বেয়াড়া নিয়ম-কানুন!'

কাঁদো কাঁদো চোখে বসে থাকে গণেশ মিদ্যা। দেখে ভারি দুঃখ হয় বাণেশ্বরের।

বলে, 'কথাটা শুনিয়া মোর বুকে যেন শেল বাজছে রে। শুধুই ভাবছি, মুই কি করিয়া কথাটা বলবো গণেশকে? কি বলিয়া প্রবোধ দিবো। সুদেবই বা কি ভাববে?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাণেশ্বর ঘোষ। গণেশ মিদ্যাকে একবার

দেখে নেয় আড়চোখে। 'তেবে ভাবিস নি তুই।' বাণেশ্বর সহসা জলদ-গম্ভীর গলায় বলে, 'জ্যাঠা বলিয়া যেদি ভাবিস, তো বিশ্বাস রাখ্ জ্যাঠার উপর। তোর ভাবনা আজ থিকে মোর।' দু'চার মুহূর্ত মালা জপে বাণেশ্বর।

তারপর বলে, 'ভোটটা আসিয়াল-অ. অখন আর কিছো করা যাবে নি। ভোটটা শুধু শেষ হইতে দে। যেদি জিততে পারি, নারাণগড় থানায় প্রথম চাকরি তোর। এই মালা হাতে কথা দিলাম, যা।'

কুন্তীদীঘির ঈশেন কোণের শিমুল গাছটায় কোঁ-কোঁ আওয়াজ তুলেছে শকুন। ভারি অস্বস্তি লাগে বাণেশ্বরের। শব্দটা বড় বিদঘুটে। বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না।

গণেশ তাও গুম মেরে বসে থাকে। বাণেশ্বর ঘোষের কথাগুলোতে যে সে খুব আশ্বস্ত হয়েছে, এমনটা মনে হয় না তার মুখের ভাবে। দেখে-শুনে দমে যায় বাণেশ্বর ঘোষ। গণেশ মিদ্যাকে সে ছোটবেলা থেকেই চেনে। নির্বোধ, গোঁয়ার এবং ষোল আনা হুড়ু। সামনের ভোটটাকে নিয়েই যত ভাবনা বাণেশ্বর ঘোষের। এ সময় যদি ছোকরা তার ভৈরববাহিনী নিয়ে কোমর বেঁধে একটিবার নেমে পড়ে তো বারো আনা কাজ একাই করবে। আর যদি বেগড়বাঁই ধরে, যদি বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়, তবে বেজায় ক্ষতি হয়ে যাবে বাণেশ্বরের।

'ভোটে জিতা তো অনেক পরের কথা।' বাণেশ্বর মিষ্টি গলায় বলে, 'আপাতত একটা কাজের ভার দিবো তোকে। প্রথম থেকে তোর কথাই ভাবিয়া রাখছি। কালিয়াঘাই থিকে যমুনা তক পুরা রাস্তাটা মোরাম হবে। আশি হাজার টাকার ইস্কিম। তুই হবি তার সুপারভাইজার।'

গণেশ এতক্ষণে মুখ তোলে। মনের মধ্যে সুবাতাস বয়। সরাসরি তাকায় বাণেশ্বর ঘোষের দিকে। অল্প নড়েচড়ে বসে। স্কীমের সুপার-ভাইজরীটা বেশ লাভজনক চাকরি। টাকায় আট আনা লাভ। আশি হাজারে চল্লিশ হাজার বাঁধা! এখানে, ওখানে পুজো লাগিয়েও দশ-পনেরো হাজার থাকবেই।

'বড় জোর ছ'মাস বাদে তোর পাকা চাকরি হবে তো। ছ'মাসে চাকরিতে যা আয় করতু, তার ডবল আয় করবি একটা ইস্কিমে।' বাণেশ্বর ঘোষের মুখখানি উজ্জ্বল হাসিতে ভরে যায়।

সেটা ঠিক। চারপাশের স্কীমগুলোতে কাজকর্মের ধরন তো দেখলো গণেশ মিদ্যা। কুন্তীদীঘি সংস্কার হলো, পচাখাল কাটানো হল, যমুনা থিকে জ্যানাগেড়িয়াতক রাস্তা হলো, সব স্কীমেই এক বিত্তান্ত। অর্ধেক কাজ, অর্ধেক চুরি। কিন্তু ইদানিং নাকি একটু কড়াকড়ি। বিডিও নাকি খোদ স্কীম দেখে বেড়াচ্ছে?

'আরে রাখ্ রে তোর বিডিও।' বাণেশ্বর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, 'উ শালা ভিজিট কইর্‌বার আগেই খেল্ খতম, পইসা হজম। তবে হ্যাঁ, শালা

বড় উড়ছে ইদানিং। বড্ড একে ওকে ধচ্ছে। খোদার উপর খোদকারি করিয়া, যাকে তাকে পাট্টা দিচ্ছে, রিলিফ দিচ্ছে। দেখলি নি, শিল-পাথরোর ডাঙায় এক পাল লোধাকে পাট্টা দিয়া দিল আচমকা। ফের ডাঙা ভাঙিয়া জমিন করার তরে ইস্কিম দিল। সে ইস্কিমের সুপারভাইজরী দিল বাছিয়া বাছিয়া মধু মল্লিককে। লধনার পো হইল কিনা ইস্কিমের সুপারভাইজার!'

মালা নামিয়ে রেখে বিড়ি ধরায় বাণেশ্বর ঘোষ। বার কয়েক ধোঁয়া ছাড়ে।

'রিপোর্ট চলিয়া গেছে উপরে।' ওষোধ ঘুঁটা চলছে। অরু আয়ু ফুরিয়া আইল এ বলাকে।' আপন মনে বলতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ, 'কলেজে পড়া-কালীন নাকি লকশাল করতো। এখনতক্ক নাকি সে নেশা কাটে নি।'

'কে কইলো এ কথা?' গণেশ নড়েচড়ে বসে।

'কে আবার! সেদিন থানার বড়বাবুই কইল কথাটা। হুঁ-হুঁ, বাবা, বিডিও হও আর এস-ডিও হও, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে নি। বড়বাবু বলে, ও বাণেশ্বরবাবু, জানান আপনার পার্টির হাইকমাণ্ডকে। ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে, কবে ফাল হয়ে বেরোবে। বলি, ভাববেন নি, আমরা চুপটি করিয়া বুসিয়া নাই। অরু ব্যবস্থা হচ্ছে।'

আশি হাজার টাকার স্কীমের সুপারভাইজারীটা পেয়ে গেছে এমন বিশ্বাসে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিল গণেশ মিদ্যা। তার ওপর কড়া বিডিও চলে যাচ্ছে শুনে তার পুলক আর ধরে না মনে। হাত-পা গুটিয়ে জুত করে বসে। বিডিও'র সম্ভাব্য হেনস্থা যেন কল্পদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল সে।

মনোযোগী ছাত্র পেয়ে ঝাঁপিখানি ফের খোলে বাণেশ্বর। 'সেদিন থানায় জোঁকের মুহে নুনটি ফেলিয়া দিল বড়বাবু।'

'কেমন করিয়া?' উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে গণেশ।

'আর কউ ক্যানে?' পুলকে ডগমগো হয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'সেদিন থানায় আইসিয়া বড়বাবুকে কয় কি, আপনি কেন গোক্ষুর ভাকে হ্যারাস কচ্ছেন? কেন ওর নামে মিছ্যা মামলার কেস দিচ্ছেন?

বড়বাবুটিও তো একটি চিজ! ইলচি করিয়া বলে, বিডিও সাহেব যে ইদানিং চোর-ডাকাতের মুরুব্বি হয়ে বসেছেন!

বিডিও বলে, গোক্ষুর ইদানিং চুরি ছেড়ে দিয়েছে।'

বড়বাবু বলে, 'ছেড়ে দিয়েছে তো, রাতের বেলা ওকে বাড়িতে পাওয়া যায় না কেন?'

বিডিও বলে, 'থাকে না ঘরে?'

বড়বাবু বলে, 'থাকে কিনা, একদিন দেখে আসুন না রাতের বেলায়।'

অপমানে বিডিও'র মু লাল হয়্যাল। একটা কথাও কইতে পাল্লো নি। ধীর পায়ে চলিয়াল থানা থিকে।' মুচকি হাসে বাণেশ্বর ঘোষ, 'পাশের ঘর থিকে পুরা দৃশ্যটি দেখলাম মুই। থোঁতা মু, বাপো রে, এক্কেরে ভোঁতা হয়্যাল অর।'

এক মনে শুনছিল গণেশ মিদ্যা। বাণেশ্বরের চোখে-মুখে আত্মপ্রসাদ।

যেন ব্যাপারটার পেছনে পুরো কৃতিত্ব ওরই। শুনতে শুনতে বড় সুখ পাচ্ছিল গণেশ মিদ্যা।

'বিদায় করিয়া দও দেখি জলদি।' গণেশ মিদ্যা দাবি জানায়, 'একটা ভালো বিডিও আইসু এ ব্লকে।'

বাণেশ্বর বরাভয় দানের ভঙ্গিতে ডান হাতখানি তোলে। মুখখানি ভরে যায় স্মিত হাসিতে।

এক সময় উঠে দাঁড়ায় গণেশ মিদ্যা।

'রাত হইল। উঠি জ্যাঠা। রাস্তার কাজটা তেবে কবে থিকে শুরু হবে?'

সস্নেহে হাসে বাণেশ্বর ঘোষ, 'শুরু হইলে মুই নিজে গিয়া খবর দিয়া আইস্‌বো তোর দোরে। তুই গ্যাট হয়্যা বুসিয়া র'।'

গণেশ চলে যেতেই আড় চোখে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ। মুচকি হাসে। পয়লা ধাক্কাটা সামলানো গেছে। নেশাটা কেটে যাবার আগেই চপলাকান্তের চাকরি আর ভোটটা তুলে নিতে হবে। বাণেশ্বর ঘোষ ধীরে সুস্থে মালার থলি তুলে নেয় হাতে।

দীঘির পাড়ে শকুনের কান্নাটা থেমেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করে ডেকে উঠলো কুকুর। চমকে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ। ভ্রু-জোড়া ঈষৎ কোঁচকায়। রামেশ্বরের বাড়িলেই থাকতো কুকুরটা। এঁটো কাঁটা খেতো আর সারাদিন পড়ে থাকতো দাওয়ায়। ভারি তেজী কুকুর। রামেশ্বর খুন হওয়ার পর কিছুদিন কুকুরটার পাত্তা ছিল না। কিছুদিন ছিল নিশি কামারের বাড়িতে। ইদানিং বাণেশ্বরের বাড়িতে থানা গেড়েছে। শিউলি ওকে এঁটো কাঁটা মেখে দেয়। কুকুরটা ডেকে চলেছে এক নাগাড়ে। বাণেশ্বর নড়ে চড়ে বসে। ছায়ামূর্তিখানি, অল্প তফাতে।

একটু বাদে হাজির হলো ন্যাকা-সুধীর।

'নিশি-কামার সাক্ষী দিতে যাইতে পারবে নি।'

'ক্যানে?' প্রায় আঁতকে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ। হাত থেকে জপের মালা খসে পড়ছিল প্রায়। সামলে নেয় কোনও মতে।

'তার এক হাত-এক পা অসাড় হয়্যা গেছে। বিছনায় শুইয়া আছে। লড়া-চড়া করার ক্ষমতা নাই।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ন্যাকা-সুধীরের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। কথাগুলো কিছুতেই বোধগম্য হয় না তার।

'কি কথা কউরে!' আর্তনাদ করে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'এর চাইতে সে মোর গলায় পা'টা তুলিয়া দউ।'

'পারবে নি।' ন্যাকা-সুধীর অবোধের মত বলে, 'পা তুলতেই পাচ্ছে নি সে। বউটা আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে।'

'থাম্, শালা।' বাঘের ঝাপট নেয় বাণেশ্বর ঘোষ, 'টর্চ' আর লাঠিটা লে। অক্ষুণি নিশির দোরে যাবো মুই।'

নিশি কামার শুয়েছিল বিছানায়। শ্যাম চক্রবর্তীর নির্দেশে মালতী ওর অসাড় জায়গাগুলোতে মালিশ করছিল। বাণেশ্বর ঘোষ ঘরে ঢোকা মাত্তর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। চুপটি করে চোখ বুজে শুয়েছিল নিশি কামার। চোখ খুলে বাণেশ্বর ঘোষকে দেখা মাত্তর কঁকিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

'এ আমার কি হইলো গো—। ও ঘোষদা, এ মোর কুন্ পাপের শাস্তি গো—। হায়, মোকে বাঁচাও গো—।' সমানে চেল্লাতে থাকে নিশি।

মালতী মৃদু ধমক দেয়, 'চুপ্ কর। কাঁদিয়া কিছো হবে? ঠাকুর ওষোধ দিছন্, ভালো হয়্যাব তুমি।'

বাণেশ্বর ঘোষ গুম মেরে বসেছিল চাটাইয়ের ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের মুখ, মুখের প্রতিক্রিয়া। কেমন যেন তার সন্দেহ হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে। নইলে কাল সাক্ষীর দিন, আজই নিশির হাত-পা পড়ে গেল!

'কি মালিশ চলছে?' বাণেশ্বর মালতীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছোঁড়ে, 'কি উটা?'

মালতী তাকালো শ্যাম চক্রবর্তীর দিকে। পর মুহূর্তেই মুখ ফিরিয়ে মালিশে মন দিল। অভিব্যক্তি পরিষ্কার। মালতী যেন শ্যাম চক্রবর্তীকে বললো, 'তুমার ওষোধ, তুমিই বাখান দাও তার।'

শ্যাম চক্রবর্তী বলে, 'মূলত পুরানো ভেড়ার ঘি। তার সঙ্গে বহুৎ কিছো দিয়া তিয়ার করা হইচ্চে এটা। যে মালিশ দিয়া মোর বাপ যাদব ভূঁইঞ্যার পক্ষাঘাত ভালো কচ্ছিল, মনে পড়ে তুমার?'

মুখ ভর্তি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সামান্য মাথা দোলানো। অর্থাৎ অত জাঁক করো না শ্যাম ঠাকুর। তুমার বাপ যা পাত্তো তার কানাকড়ি ক্ষমতা তুমার নাই। তুমার বাপ যাদব ভুইঞ্যার পক্ষাঘাত ভালো কচ্ছিল, এটা ঠিক। তাই বলিয়া তুমি উই ওষোধটি প্রক্রিয়া মতন তিয়ার করিয়া নিশিকে ভালো করিয়া দিবে, এটা কোউ বিশ্বাস করবে নি বাপ। কুথায় সে, আর কুথায় তুমি! চাঁদে, আর মোন-বাঁদরের পঁদে। তুমার বাপ চক্রবর্তী ছিল কবিরাজ, আর তুমি হইলে কপিরাজ। কথাগুলো বহু মজলিসে বহুবার উচ্চারণ করেছে। সে সময়গুলোতেও বাণেশ্বরের মুখে ফুটে উঠেছে এমনিতরো তাচ্ছিল্যের ভাব।

দেখতে দেখতে মনের মধ্যে এক চিলতে সন্দেহ ফলুইয়ের বাচ্চার মত উলোট-পালোট খেতে থাকে। নিশি কামার সমানে কাতরাচ্ছে। কাঁদছে আর হা-হুতাশ করছে। এতক্ষণ ধরে এতগুলি ধূর্তমুখের সামনে অতখানি নিখুঁত অভিনয়, অন্তত নিশির পক্ষে সম্ভব নয়। মালিশের গন্ধে ঘিয়ের সুবাস। মালতীর চোখেও উৎকণ্ঠা। সব ঠিক। কিন্তু তবুও, বাণেশ্বর ঘোষের ভেতর থেকে একটা 'কিন্তু' বার বার বুদ্বুদের মত উঠে আসছে।

এতখানি কাকতালীয় ব্যাপার কি ঘটে এ দুনিয়ায়! কাল সাক্ষী, আজ পক্ষাঘাত!

'এ মালিশের কম্ম নয়।' বাণেশ্বর একসময় মত প্রকাশ করে। 'ডাক্তার-টাক্তার ডাকিয়া ভালা করিয়া চিকিৎসা করা মালতী।'

'মালিশে সারবে নি? ডাক্তারের বড়ি আর রঙীন জলে পক্ষাঘাত সারবে?' এতক্ষণে তীব্র বিদ্রূপ ঝরে পড়ে শ্যাম চক্রবর্তীর গলা থেকে।

এতই অব্যর্থ সে বিদ্রূপ যে, বাণেশ্বর হেন ব্যক্তিও অস্বস্তি বোধ করে। বলে, 'আরে সে কথা বলি নি মুই। বলছি, সে খাঁটি ঘিই বা কুথা এ যুগে, খাঁটি শিকড়-বাকড়, জড়ি-জুটি কাই বা পাবে কুথায়? এ হইল ভেজালের যুগ। সব দ্রব্যেই ভেজাল। তো, ভেজাল উপাদান দিয়া যে মালিশটি তিয়ার ইল, তাতে পক্ষাঘাত কি করিয়া সারবে? কবিরাজ হাজার ভালো হইলেও সারবে নি। অবশ্যি যদি সেটা ভেজাল পক্ষাঘাত না হয়।' শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করেই উপস্থিত সবাইয়ের চোখের ওপর দ্রুত জরীপ সেরে নেয় বাণেশ্বর। আচমকা এমন কথা শুনলে, পাপী মন কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হবে। চোখ দুটিতে পলকের তরে হলেও তার ছায়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু না। বাণেশ্বর ঘোষকে এবারও হতাশ হতে হল। না নিশি কামার, না শ্যাম ঠাকুর, না মালতী, কারো অভিব্যক্তির তিলমাত্র পরিবর্তন হল না।

তবুও সন্দেহ ঘোচে না পুরোপুরি। অদৃশ্য কাঁটার মত কিছু বিঁধে থাকে গলাতে। কেবলই মনে হয়, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা কিছু গোলমাল রয়েছে।

'মালিশ চলছে, চলুক।' বাণেশ্বর ঘোষ রায় দেয় শেষমেষ, 'একটা এলো-প্যাথিক ডাক্তারকেও দেখানো ভালো। অত রাতে আর পাশ করা ডাক্তার কুথা মিলবে, অন্তত কুলদা ডাক্তারকে একটিবার ডাকিয়া পাঠা—।' বাণেশ্বরই স্বেচ্ছায় নির্দেশ দেয় ন্যাকা-সুধীরকে, 'যাতো রে, কুলদা ডাক্তারকে একটিবার ডাকিয়া আন তো। মোর নাম কইবি।'

ন্যাকা-সুধীর পা বাড়ায় দরজার দিকে।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে বাণেশ্বর, 'ছুটিয়া যাবি, দৌড়িয়া আইসবি। দেরী যেন না হয়।'

কুলদা ডাক্তার আসে বেশ তাড়াতাড়ি। রোগীর খোঁজ-খবর নেবার মধ্যে এক ফাঁকে ফিসফিসিয়ে বলে বাণেশ্বর, 'দ্যাখ ত ডাক্তর, ঠ্যাঁট না সত্যি?'

কুলদা ডাক্তার নিশি কামারের পাশটিতে বসে। চিমটি কাটে অসাড় জায়গাগুলোতে। আলতো ছুঁচ ফোটায়। দেশলাই কাঠি দিয়ে পায়ের পাতায় আঁকিচিরা কাটে। নিশি কামার স্থির, নিষ্পন্দ। চোখের পাতাটি অবধি কাঁপে না তার।

দেখে শুনে কুলদা ডাক্তার বাণেশ্বরকে একান্তে বলে, 'বুঝতে পারলাম নি। মনে হয়, সত্যি। একে হাসপাতালে লিয়া যাও।'

হাসপাতালের নাম শুনে নিশি কামারের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

ককিয়ে কেঁদে ওঠে সে। জীবনে যে একটা ইনজেকশন নেয় নি, তাকে কিনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায় এরা। 'মুই অই যমপুরীতে যাবো নি গো—।' বলে চিল-চিৎকার জোড়ে সে।

॥ ছাব্বিশ ॥

শিলপাথরার ডাঙা থেকে দুপুর নাগাদ তেতে পুড়ে ফিরলো গোক্ষুর। হাঁফাচ্ছিল। সারা শরীরে অগ্নি-জ্বলন।

আসলে রাতের কাজ-কাম করে আর দিনের বেলায় অন্ধকার ডেরায় ঘুমিয়ে গোক্ষুরের শরীরের অভ্যেস একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। রোদ্দুর আর সইতে পারে না অঙ্গ। অল্প তাপেই চামড়া জ্বলতে শুরু করে। গোক্ষুর একটুখানি কাজ করেই ছায়ার দিকে ছোটে? চুরি-চামারি ছেড়ে দেবার পর পরের ক্ষেতে মজুর খাটতে গিয়েও গোক্ষুরের কি দুর্ভোগ। রাত-চরা শরীর খোঁজে ছায়া, আর মালিক খোঁজে কাজ। গোক্ষুরের সে এক নরক-যন্ত্রনা। কাঠফাটা রোদ্দুরে সেদ্ধ হতে হতে গোক্ষুর হাড়ে হাড়ে বোঝে. কেন একবার চুরিটা রপ্ত হয়ে গেলে, মানুষ ছাড়তে পারে না এই হীন কাজ। মনের ইচ্ছেটা প্রবল হলেও, শরীর কেমন পদে পদে বেইমানি করে। নিতাই মাস্টারকে সমস্যাটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে গোক্ষুর। মাস্টার বুঝেও বুঝতে চায় না। বলে, 'গরীবের বাচ্চা তুই। খাইট্‌তে হবে বৈকি! নিজের শ্রমের তুল্য মর্যাদার চিজ আর কিছো নাই এ দুনিয়ায়।

এই শীতের দুপুরেও দরদরিয়ে ঘামছিল গোক্ষুর। পঞ্চমী গামছা এগিয়ে দেয়। এনামেলের ঘটিতে জল এনে বসিয়ে দেয় গোক্ষুরের সামনে।

সামান্য ঠাণ্ডা হয়ে, সবে দু'তিন ঢোক জল খেয়েছে গোক্ষুর, উঠোনে পিয়নের মুখ দেখা যায়। সহসা ডাক-পিয়নকে দেখে চমকে ওঠে গোক্ষুর। পিয়ন কেন গোক্ষুরের ঘরে! জীবনেও তো সে কোনদিন কোন চিঠি পায় নি কারোর থেকে।

'গোক্ষুর ঘরে আছু?' হাঁক পাড়ে ডাক-পিয়ন।

বারান্দায় বেরিয়ে আসে গোক্ষুর।

'তোর চিঠি আছে। রেজিস্ট্রি চিঠি।' পিয়ন দু'খানা হলুদ খাম এবং একখানি টিপ-কালির বাক্স বের করে থলি থেকে।

টিপসই নিয়ে চিঠি দু'খানা দিয়ে চলে যায় পিয়ন। গোক্ষুর আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। এক ধরনের অচেনা শঙ্কা নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে ফেলে ওকে।

খানিক বাদে হুঁশে ফেরে গোক্ষুর। দেখে, পঞ্চমীর মুখখানি কালো হয়ে উঠেছে দুশ্চিন্তায়।

গোক্ষুর বলে, 'একবার হারি পিসির দোর যা' ত। মধু আছে কিনা দেখিয়া আয়।'

পঞ্চমী চলে যায় দ্রুতপায়ে। গোক্ষুর খাম দুটো উল্টে পাল্টে দেখতে থাকে। খামের গায়ের দুর্বোধ্য লিপি, কালো কালো শীলমোহর এবং রঙচঙে টিকিটগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে।

পঞ্চমী ফিরে আসে। পিছু পিছু মধু মল্লিক। গোক্ষুর বলে, 'এ চিঠি দু'টা পড়িয়া দে' তো রে মধু।'

প্রথম চিঠিখানি বাণেশ্বর ঘোষের। মহামান্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমনামা মোতাবেক আগামী দোসরা মাঘ আমি নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির দখল লইবার মনস্থ করিয়াছি। অতএব, উক্ত দিবস সকাল আট ঘটিকায় আপনি আপনার তৈজসপত্র এবং ব্যবহার্য সামগ্রী উক্ত ভিটা হইতে সরাইয়া লইবেন। অন্যথায় আদালত অবমাননার দায়ে আপনার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

দ্বিতীয় চিঠিখানি থানার বড়বাবুর। আদালতের হুকুম মোতাবেক কার্য করিতে গিয়া বাদীপক্ষ যাহাতে আপনার নিকট হইতে কোনরূপ বাধা কিংবা প্ররোচনা না পায়, সে বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

মাথায় যেন বাজ পড়ে গোক্ষুরের। পঞ্চমীও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গোক্ষুরের দিকে। কারো মুখে কথা যোগায় না। শুধু পঞ্চমীর চোখদুটোতে টলটল করে জল।

মধু মল্লিক বলে, 'তুমি নিতাই মাস্টারের পাশ যাও। এ বিপদে ওই ভরসা।'

নিতাই মাস্টারের নামে খুব একটা আহ্লাদ জাগে না মনে। বাণেশ্বর ঘোষ যখন প্রথম ভিটে দখল করবার হুমকি দেয়, তখনি কথাটা নিতাই মাস্টারকে বলেছিল গোক্ষুর। নিতাই মাস্টার খুব একটা ভরসা দেয় নি।

শুধু বলেছিল, 'কদ্দুর কি করে দেখি। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। তুই ত আর বিকিয়া দউ নি তোর জমিন। বন্ধক রাখছু। দখল লিয়া অত সোজা নয়।'

দিনকতক বাদে প্রসঙ্গটা ফের উঠতে নিতাই মাস্টারের কথাগুলো সরাসরি উগরে দিয়েছিল গোক্ষুর। শুনে ত বাণেশ্বর ঘোষ হেসেই খুন।

'কে কইল তোকে, বন্ধক রাখছু? বিক্রি দলিলে সই কচ্ছু তুই। দুয়ারী ঘোষের ব্যাটা অত কাঁচা কাজ করে না।'

সেদিনই সন্ধ্যায় কথাটা বিতাং করে বলেছিল গোক্ষুর, নিতাই মাস্টারকে।

শুনে নিতাই মাস্টার গাল পেড়েছিল গোক্ষুরকেই, 'কজ্জ' লেয় সক্কলে। কুন্ আহাম্মুক নিজের বাস্তুভিটাটি বিক্রি দলিলে করিয়া দেয়, বল্ ত মোকে? আইন এখন ঘোষের পক্ষে। তার সিন্দুকে দলিল।'

শুনে দু'চোখে শর্ষেফুল দেখেছিল গোক্ষুর। সে কি আর অতখানি জানতো? 'ঘোষদা' বলে কথা। তার সঙ্গে গোক্ষুরের তলে তলে কত

পীরিত ! কত অন্ধকার রাতের কারবার ! সে যে অমন সুযোগটি বুঝে ফণা তুলবে, সেটা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল গোক্ষুর ? এসব কথা নিতাই মাস্টারকে বোঝানো যায় না। মানুষটা মাঝে মাঝে বড় অবুঝ হয়ে ওঠে। খালি কেতাবী কথা কয়। গোক্ষুরের আসল দিগদারিগুলো বোঝবার চেষ্টা করে না।

নিতাই মাস্টারও নানান্ দুর্ভাবনায় দিন কাটায়। ঘর-সংসার ছেড়ে আজ কতদিন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে। পুলিশ আর জোতদারের চর অহরহ তাড়া করছে পিছু পিছু। সর্বদাই ধরা পড়ে যাবার ভয়। এমনিতরো পুলিশ-রাজের দিনে সংগঠনটাকেও টিকিয়ে রাখা মুশকিল। এইসব সাত-সতের সমস্যায় তারও মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

সেদিন অবশ্যি শেষমেষ একটা বুদ্ধি বাতলেছিল নিতাই মাস্টার।

বলেছিল, বিক্রি-দলিল যদি হয়ও, তা অবৈধ। আদিবাসীর জমিন বর্ণ-হিন্দু কিনতে চাইলে আদিবাসী দপ্তরের পারমিশান লাগে। খালি, দলিল করিয়া ফেললে ত হইলো নি !'

শুনে আবার বাণেশ্বর ঘোষের একচোট হাসি। বলে, 'তোকে কে এসব শিখাচ্ছে বল্ তো ? তোর একটা বড়সড় মুরুব্বি জুটছে, এটা বুঝতে পারি। কিন্তু কে সেই রাঘব-বুয়ালটি সেটাই ধরতে পাচ্ছি নি।' দু'চোখ ছোট করে গোক্ষুরের দিকে তাকায় বাণেশ্বর ঘোষ, 'মুরুব্বিটি কে রে ? নিতাই মাস্টার নাকি ?'

'নিতাই মাস্টার হইতে যাবে কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে গোক্ষুর। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে অস্থিরতা ও শঙ্কা। বলে, 'অর সাথে মেরে ভেট কুথা ?

পলকহীন চোখে গোক্ষুরকে দেখতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। দেখতেই থাকে।

এক সময় বলে, 'শুন্। আদিবাসী দপ্তরের পারমিশান লিয়াই কিনছি মুই। সব কাগজপত্তর রইছে মোর পাশ। দরকার হইলে দাখিল করবো কোর্টে। সে লিয়া ভাবনা করিস নি তুই।' শেষের কথাগুলো ব্যঙ্গ করে বললো বাণেশ্বর ঘোষ।

সব শুনে নিতাই মাস্টার হতাশ হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'খোদ মৃত্যু-বাণ পড়িয়া গেছে হনুমানের হাতে, রাবণকে বাঁচায়, কার সাধ্যি। বড় আটঘাট বাঁধিয়া নামছে দুয়ারী ঘোষের ব্যাটা। বাঁচার কুনো উপায় দেখছি নি উপস্থিত।'

'কিন্তু ভিটাটা চলিয়ালে মুই বউকে লিয়া কি রাস্তায় দাঁড়িইবো মাস্টার ?' গোক্ষুর ব্যাকুল গলায় গুধোয়।

'সেটা বিক্রি-দলিল করিয়া দিবার সময় খিয়াল ছিল নি ?' সহসা ধমকে ওঠে নিতাই মাস্টার। 'মোর বলে পাছায় লক্ষ ত্রিশূল ! তোরা ফের তার উপর নৈতন উপসর্গ লিয়া হাজির হউ।

খানিক বাদে নরম হয় নিতাই মাস্টার। গোক্ষুরের পিঠে হাত রাখে।

মৃদু গলায় বলে, 'চুপ মারিয়া বুসিয়া র' না। দখল লিতে আইসু, তখন দেখা যাবে।'

মধু বলে, 'তা হউক। নিতাই মাস্টার ইদানিং অর'ম যাকে তাকে রাগের মাথায় বকিয়া দেয়। ইদানিং বড় সংকটে রইছে। দিনের পর দিন পালিয়া বেড়ানো সোজা নয়। জরুরী অবস্থার সুযোগ লিয়া পুলিশ গাঁয়ে গাঁয়ে ভাঙিয়া দিচ্ছে সংগঠন। জোতদাররা পাড়ায় পাড়ায় চর নিয়োগ কচ্ছে। কোউ সামান্য নড়াচড়া কল্লেই খবর চলিয়া যায়ঠে জোতদার মারফত পুলিশের পাশ। পুলিশ হাজার ফিকিরে জুলুম কচ্ছে অর উপর।'

কথাগুলো মিথ্যা নয়। গোক্ষুরও তা বোঝে। শঙ্কায় মুখ কালো হয়ে ওঠে।

বলে, 'অমন কল্লে তো পার্টি দিন দিন ভাঙিয়াবে।'

'সেটাই ত ভাবনা।' মধুর চোখে দুশ্চিন্তা, 'বাধ্য হইয়া নিতাই মাস্টার অন্য পথ ধচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়া শলা দিচ্ছে, তুমরা অত জুলুম সইতে পারুব নি। তার চাইতে, ঢুকিয়া পড় অদের দলে। প্রয়োজনে মিটিং-মিছিলে যাও। এমুনি করিয়া অন্তত নির্বাচন তক্ক কাটাও কুনো গতিকে। যদি নির্বাচন হয় ঠিক টাইমে, যদি পার্টি জিতে, তখন ফের কাজ-কাম শুরু করা যাবে। আর যদি নির্বাচনই না হয়, বজায় থাকে জরুরী অবস্থা, তাইলে অন্য উপায় ভাবতে হবে। আপাতত তো বাঁচ তুমরা। কিন্তু সর্বদাই খিয়াল রাখবে, তুমরা কোকিলের বাসায় কাগের ছা।'

নিতাই মাস্টারের এ পরিকল্পনাটাও গোক্ষুর জানে। সে-ই তো এখন আদাড়ে-বাদাড়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ওর পিছু পিছু ঘোরে। নিতাই মাস্টার মিটিং করে, ও বসে বসে ঝিমায়। নিতাই মাস্টার উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে থাকে। গোক্ষুরও লাঠি বাগিয়ে পা চালায় পিছু পিছু।

মধু বলে, 'যদি কিছো কত্তে পারে, নিতাই মাস্টারই পারবে তুমি আজই যাও। নিতাই মাস্টার আজ কোথায় থাকবে, জানইতো।

'জানি।' গোক্ষুর চাপা গলায় জবাব দেয়, 'জানা-গেড়িয়ার গোপী শীটের দুয়ারে আজ সন্ধ্যায় তার মিটিং।'

'তবে আর কি! চলিয়া যাও। বিকাল গিয়া ধর অকে। মিটিংয়ে বুসিয়া যাওয়ার আগে।'

পঞ্চমী এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সে শুধু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নির্বাক শুনছিলো এদের কথাবার্তা। চোখের কোণে টলটল করছিল জল। এবার সে আশায় আশায় তাকায় গোক্ষুরের দিকে।

বলে, 'জলদি গা' ধুইয়া লও তুমি। দু'টা খায়া লও। রওনা দও জ্যানা গেড়িয়া। মিটিং-এর লোক জুটিয়া যাবার আগে উকে ধর। নিরিবিলিতে বুঝাও সংকটের কথাটা। উঠিয়া পড় না। বুসিয়া বুসিয়া কি ভাব?' শেষের দিকে অস্থির হয়ে ওঠে পঞ্চমী।

উঠে দাঁড়ায় গোক্ষুর।

মধু মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মধু, একটা কথা কইবো ?'

'কও না।'

'তুই ও চল্ না মোর সাথে।' গোক্ষুর মিনতি জানায়, 'মুই কি বলতে কি বলবো। তুই শিক্ষিত ছোকরা, বুঝিয়া বলতে পারবি মাস্টারকে।'

মধু জবাব দেয় না। সে শুধু দেখে, পঞ্চমী ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। এক চিলতে জবাবের আশায়।

পড়ন্ত বিকেলে জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে জেনা-গেড়িয়ায় পৌঁছে গেল দুজনে।

নিতাই-মাস্টার বসেছিল গোপীশাটের বারান্দায়। রুগ্ন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালের বলিরেখা প্রকট। চোখে গাঢ় দুশ্চিন্তার ছাপ। চিঠি দুখানা মন দিয়ে পড়ে সে।

বলে, 'বড় পাকা কাজ কচ্ছে বাণেশ্বর ঘোষ। কোথাও তিলমাত্তর খুঁত রাখেনি। কাজেই কোর্টের হুকুম লিয়া সে যেদি আসে তোর ভিটার দখল লিতে, আর থানা যেদি পুলিশ লিয়া দাঁড়ায় অর পিছুতে, তবে তারে ঠেকিয়া রাখবার কুনো উপায় দেখি না মুই।'

'কিন্তু মোর ওইটুকে ভিটা—।' বলতে বলতে ঝর ঝরিয়ে কেঁদে ফেলে গোক্ষুর, 'বউটা পোয়াতী হইচে। দুদিন বাদে বিয়াবে—।'

লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে নিতাই-মাস্টার। থম মেরে বসে থাকে সে। চোখ-মুখ ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে আসে তার।

একটু বাদে মৃদুগলায় নিতাই মাস্টার বলে, 'একটিমাত্র উপায় আছে।'

আশায় দুচোখ জেবলে তাকায় গোক্ষুর। নিতাই মাস্টার বলে, 'লোকজন জোটো করিয়া বাণেশ্বর ঘোষের মুকাবিলা করা।'

আশায় আশায় তাকিয়ে থাকে গোক্ষুর ভক্তা। চোখের সমুখে ভাসতে থাকে সাতষট্টি-উনসত্তরের স্মৃতি। বাণেশ্বর ঘোষ, কুলদা ডাক্তার, মা-মনসার কালাচাঁদ আইচ, যমুনার অঘোর মাইতিদের উঠোন জুড়ে উদোম মানুষদের লাগাতার জমায়েত। কলরব। নিতাই মাস্টারের নির্দেশে ওদের কালো কালো সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসছে বন্ধকী বাসন-কোসন, টিপ-ছাপ, দলিল-পরচা। পাংশুবর্ণ অঘোর মাইতির দল হেঁট মুণ্ড হয়ে বসে রয়েছে। অসহায় চাউনি। উল্লাসে ফেটে পড়ছে জমায়েত। বিধবা খুদিবুড়ী তার কাঁসার জামবাটিটি বুকে চেপে কাঠ মেরে গেছে।

নিতাই মাস্টারের জ্বলন্ত চোখ দুটো ধীরে ধীরে নিভে আসে।

মাথা নেড়ে বলে, 'এখন জরুরী অবস্থা চলছে দেশে। পুলিশের হাতে অগাধ ক্ষমতা। বাণেশ্বর ঘোষ পুলিশের সাথে যোগসাজস করিয়া ঝাঁপিয়া পড়তে পারে আমাদের উপর। ধর পাকড়, খুনাখুনি হইতে পারে। অতবড় দায়িত্ব মুই লিতে পারবো নি।'

কুঁজো হয়ে বসেছিল গোক্ষুর। অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুখানি স্থির।

নিতাই মাস্টারের কথায় আরো কুঁজো হয়ে আসে ওর শরীর।

মৃদু গলায় বলে, 'তুমরা সক্কলে রইতে, নিজের ভিটা থিকে উচ্ছেদ হয়্যাবো মুই ?'

নিতাই মাস্টার পাথরের মত বসে থাকে। ভারি অসহায় দেখায় তাকে।

খানিক বাদে ভাঙা গলায় বলে, 'পার্টি'র বড় দুঃসময় চলছে এখন। কর্মীরা ভয়ে বুসিয়া পড়ছে চুপচাপ। পুলিশের ঘপ্‌টানি খাইলে আর দেখতে হবে নি।'

সেদিন অনেক রাত অবধি নিতাই-মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে রইলো গোক্ষুর। নিতাই মাস্টারের চোখেমুখে বিষণ্ণতা। চাপ-চাপ বেদনার ছাপ।

ভেতরে ভেতরে কি ভেঙে পড়ছে লোকটা! আর কি সইতে পারছে না এই পলাতক জীবন আর চারপাশ থেকে অবিশ্রান্ত চাপ।

'বিডিও'টাও চলিয়াল এই সময়ে।' নিজের মনে বিড় বিড় করতে থাকে নিতাই-মাস্টার, 'লচেত অকে দিয়া একটিবার এস-ডি-ও'কে বলা যাইতো তোর কথাটা।'

'বিডিও সাহাব চলিয়াল ?' মধু মল্লিক অবাক হয়ে শুধোয়, 'শুনিনি তো। পরশুও তো ইস্কিমের কাজ দেখি য়া গেলেন। কিছু কইলেন নি তো।'

'হুঁ'।' নিতাই মাস্টারের ভাঙা ভাঙা মুখে বেদনার ছাপ আরো প্রকট হয়, 'পরশুই অর্ডার আইল—চার্জ বুঝিয়া দও কাশিয়াড়ের বিডিও'কে। কাল চার্জ বুঝিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন তিনি।'

সহসা বাক্য জোগায় না কারো মুখে। গোক্ষুরের বুকখানা যেন করাত দিয়ে ফালা ফালা করতে থাকে কেউ।

'দুঃখটা সেখানে নয়' নিতাই মাস্টার বলে, 'দুঃখটা হইলো, এমন সৎ আর তেজী মানুষটাকে যাইতে হইল কিনা একরাশ বদনাম লিয়া!' বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রাঞ্জল করে বোঝায় মধু মল্লিকদের।

সাত নম্বর অঞ্চলে নাকি তিরিশ খানা বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন বিডিও সাহেব। টেন্ডার ডেকে দর পেয়েছিলেন ঘরপিছু দু'হাজার টাকা। পনের খানি ঘর হওয়ার পর হিসেব কষে দেখলেন, বেজায় লাভ করছে ঠিকাদার। তিনি ভয় দেখিয়ে পরের পনেরখানা বাড়ি দেড় হাজার হিসেবে তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। অডিটপার্টি এসে নাকি ব্যাপারটা উল্টোভাবে ধরেছে। তাদের যুক্তি হল, দেড়হাজারেই যদি ঘর হওয়া সম্ভব ছিল, তবে বিডিও কেন আগের পনেরখানা বাড়িতে পাঁচশো টাকা করে বেশি খরচ করেছেন? অনেক সরকারী টাকা এইভাবে অপচয় করেছেন তিনি। ব্যাপারটা নিয়ে ভিজিলেন্স তদন্ত চলছে।

'একটা সৎ মানুষকে কিভাবে এরা অসৎ সাজাল দ্যাখ!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে নিতাই মাস্টার। বলে, তোর ভিটাটা, কুনো গতিকে মাস-দুই-তিন ঠেকিয়া রাখতে পাল্লে দেখা যাইত। হিসাব মত সামনের মাসে বিধান সভার ভোট। যেদি সত্যি সত্যি ভোটটা হয়, আর,

আমরা জিতি, তবে আর ভিটা লিয়া ভাবতে হবে নি তোকে। শুধু দু'-তিনটা মাস কুনো গতিকে—।'

শেষ রাতে মধু মল্লিকের সঙ্গে ডিহি পারে ফিরে এলো গোক্ষুর। শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়তে চাইছে। তার চেয়েও বড় কথা মনটা একেবারে ভেঙে পড়ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কিছুতেই।

পঞ্চমী অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে, গোক্ষুর না ফেরা অবধি দু'চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারবে না সে এসব জেনেও গোক্ষুর ঘরে ঢোকে না। মধু মল্লিক হারি পিসির ঘরে ঢুকে যেতেই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নিজের ঘরের বারান্দায়। বারান্দার ওপর ওঠে এবং নিঃশব্দে দাউলি-বাঁশ-খানা তুলে নেয় কাঁধে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে উঠোনে নামে। এবং নিঃশব্দে হাঁটা দেয় আগুন-জ্বলার মাঠে।

আগুন-জ্বলার ফাঁকা মাঠে একাধিক কাঁটাবাঁশের ঝাড়। গোক্ষুর দাউলি দিয়ে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে কাটতে থাকে কাঁটা বাঁশের কঞ্চি ও ডাল। বোঝা বাঁধে। দু'তিন কিস্তিতে বয়ে এনে ছড়িয়ে দেয় পাথর গেড়্যার জলে। প্রায় ঘণ্টাটাক বাদে দাউলি নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আসে ঘরে। টোকা মারে দরজায়।

পঞ্চমী সত্যিই ঘুমোয় নি। এক টোকাতেই দরজা খুলে দেয়।

ক্লান্ত পায়ে গোক্ষুর ঢুকে যায় ঘরের ভেতরে।

শরীরখানি যেন বইছে না আর!

॥ সাতাশ ॥

রাত গভীর।

ঘুপচি ঘরের মধ্যে পাশাপাশি শুয়েছে পঞ্চমী আর গোক্ষুর। পৌষের হাড় কাঁপানো শীত। হু-হু উত্তুরে হাওয়া বয়ে চলেছে যমুনার ডাঙা ভেদ করে। ঘুলঘুলি গলে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে। কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীর। কৃষ্ণা দ্বাদশীর রাত। আকাশে ঘসা চাঁদের আলো। তার একচিলতে পড়েছে গোক্ষুরের উঠোনে। চাঁদ ডুববে শেষ রাতে। এখনো অনেক দেরি তার।

চোখ বুজে পড়ে রয়েছে দু'জনেই। কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুম আসছে না চোখে। মুখের ভাষাও গেছে হারিয়ে। কিন্তু দু'জনেই বুঝতে পারছে, অপর পক্ষ ঘুমোয় নি।

গভীর ভাবনায় ডুবে আছে পঞ্চমী। ছ'মাসের পোয়াতী সে। শরীরখানা ধীরে ধীরে ভারি হচ্ছে তার। একজন কেউ বাসা বাঁধছে পেটে। পষ্ট বোঝা যায়। তাই নিয়ে হপ্তা-দুই আগেও ফুর্তি করেছে দু'জনে। গোক্ষুর পঞ্চমীকে জড়িয়ে ধরে তার নাভিস্থলে চুমু খেয়েছে বারবার।

বলেছে, 'এইখানে, এইখানটায় থিতু হচ্ছে উ !'

সারারাত উজাগর করেছে গল্পে-গুজবে।

হারিপিসির আনন্দটাই বোধ করি সবচেয়ে বেশি। ইদানিং দু'বেলা পালা করে আসে সে। গোক্ষুর বাইরে থাকলে রাতে এসে পঞ্চমীর পাশটিতে শোয়। সারাক্ষণ লক্ষ উপদেশ ঢালে ওর কানে। টক-ঝাল খাবি নি। পচা-পুকুরে ডুববি নি। খাল-বিল পারাবি নি। অন্ধকারে একলা পথ হাঁটবি নি। রাতের বেলায় আরশিতে মুখ দেখবি নি। কু-চিন্তা কু-ভাবনা করবি নি। মনে কুনো তাঁপ-তাপ রাখবি নি। আর, সারাক্ষণ ভাবনা করবি ঠাকুর-দেবতার মুখ। দেখবি কিষ্টো ঠাকুরটির তুল্য ব্যাটা হবে তোর। কিংবা মা-দুর্গার মতন ঝি।

হারিপিসির কথাগুলো যেন মধু হয়ে সেঁধায় পঞ্চমীর কানে। চোখের রঙ গাঢ় হয়ে আসে। ওকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'ও হারিপিসি, তুমি অমন বামন ঘরের মতন 'ভাষা' শিখলে কেমন করিয়া ?'

'কি যে বলু—!' হারি পিসি স্পষ্টতই বিরক্ত হয়, 'দুকুড়ি বচ্ছর ধাইগিরি করিয়া কাটল মোর। পেটের মধ্যে বাচ্চার হাল-হদিশ মুই জানবো নি ?' শুনে আহ্লাদে গড়িয়ে পড়ে পঞ্চমী।

সে সব আনন্দের মুহূর্ত উধাও হয়ে গেছে দুজনের মুখ থেকেই। গেল দু'তিন দিন পঞ্চমী একা হলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর, হারি পিসির গলা জড়িয়ে শুধোচ্ছে একটাই কথা, 'ও হারি পিসি, বল না গো ? কুথা যাবো আমরা, দু'দিন বাদে ?' গোক্ষুরকে শুধিয়েছে ঐ একই কথা 'কি হবে গ ? ভিটা ছাড়িয়া কুথা যাবো ? ক্যানে তুমি বিক্রি দলিল করিয়া দিলে বাপ-চোদ্দপুরুষের ভিটা ?'

গোক্ষুর এর কি জবাব দেবে ? কি করে বোঝাবে যে জেনে বুঝে কিছুই করে নি সে। বাণেশ্বর ঘোষের কথামত কত কাগজেই সে টিপ দিয়েছে জীবনে। গোক্ষুর টিপ দে, পঞ্চাত থিকে গম পাবি। গোক্ষুর টিপ দে, তিরপল্ পাবি। পশু লোন পাবি, ব্যাঙ্ক থিকে। টিপ দে, কর্জ দিচ্ছি টাকা। আরো কত ফিকিরেই ঘোষ টিপ নিয়েছে আজীবন। তার মধ্যে কোন টিপখানা ছিনিয়ে নিল গোক্ষুরের ভিটেখানা, সেটা কি আর জানে গোক্ষুর ? তবুও পঞ্চমীর শেষ প্রশ্নখানা গোক্ষুরকেও কুরে কুরে খায়, নিঃশব্দে।

রাত গাঢ় হয়। ঘরের মধ্যে থই থই করে আঁধার। পাশাপাশি শুয়ে থাকে দু'টি অসহায় প্রাণী।

পরস্পরের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল দু'জনেই।

একসময় গোক্ষুরের দিকে পাশ ফিরলো পঞ্চমী। হাতখানি আলতো রাখলো গোক্ষুরের গায়ে। গোক্ষুরের শরীরখানা অল্প কেঁপে ওঠে। পঞ্চমীর হাতখানা কি ঠান্ডা !

পাশ ফেরে গোক্ষুর। দু'জনের উষ্ণ নিশ্বাস দু'জনের মুখে পড়ে।

মৃদুস্বরে পঞ্চমী বলে, 'একটা কথা কইবো ?'

অন্ধকারে দেখা যায় না পঞ্চমীর মুখ। তাও, দু'চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে গোক্ষুর তাকিয়ে থাকে পঞ্চমীর দিকে।

পঞ্চমী বলে, 'একটিবার যাও না বাণেশ্বর ঘোষের পাশ। হাতে-পায়ে ধরিয়া কুনো গতিকে আটকিয়া রাখ না মাস দু'তিন।'

'তারপর ?'

'নিতাই কাকা তো কইছে, ভোটটা হয়্যালে, যেদি জিতিয়া যায়, তেবে আর কিচ্ছোটি কত্তে পারবে নি ঘোষ।'

গোক্ষুর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। জবাব দেয় না কথার। মুখখানা বেদনায় কালো হয়ে আসে।

'শুনবে নি ? রাখবে নি তুমার কথা ?' পঞ্চমী শুধোয়।

'রাখবে নি ক্যানে ?' গোক্ষুর নিরাসক্ত গলায় বলে, 'ফের চুরি ধরতে কইবে। রাজি হয়্যালেই সব ঠিক।'

পঞ্চমী শুয়ে থাকে চুপটি করে। মুখখানি অসহায় হয়ে ওঠে তার।

'বল্, রাজি হয়্যাবো ?' এবার পাল্টা প্রশ্ন করে গোক্ষুর।

গভীর ভাবনায় ডুবে যায় পঞ্চমী। এই জটিল ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ-সন্ধান করতে থাকে কেবল।

একটু বাদে বলে, 'তুমি রাজি হয়্যা যাও অখনকার মতো। বল, চুরি করবো। তেবে এখন কোমরে বেথা। বেথাটা সারলে ফের লাগবো কাজে।'

'বটে !' গোক্ষুর ঘন হয়ে আসে পঞ্চমীর দিকে, 'তারপর ?'

'অইসব পাঁচবুড়ি কথা কইয়া, দু'তিনটা মাস কাটিয়া দও না কুনো গতিকে।'

গোক্ষুর তেতো হাসে, 'বাণেশ্বর ঘোষকে তুই চিনু নি। সে হইল দুয়ারী ঘোষের ব্যাটা। তুই যেদি ডালে-পালায় চলু, সে চলে শিরায় শিরায়।'

ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে পঞ্চমী। চুপ করে শুয়ে থাকে। চোখ দুটি ভরে আসে জলে।

খানিকবাদে উঠে বসে গোক্ষুর। বলে, 'তুই শুইয়া র'। মুই টুকে জলঘাট বুসিয়া আইসি।'

অন্ধকারে পথ হাতড়ে উঠোনে নামে। কান মাথা পেঁচিয়ে একখানা গামছা বাঁধে গোক্ষুর। ছেঁড়া চাদরখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে। উঠোনে এক কোণে পড়েছিল দাউলি বাঁশখানা। তুলে নিয়ে হারিয়ে যায় অন্ধকারে।

উঠোনের আগড় ঠেলে শুঁড়ি রাস্তায় পা দিল গোক্ষুর। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এগিয়ে চললো পাড়ার বাইরে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীর। হু-হু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে দু'ধারে সরু ডাল, লতা-পাতা। এমন অন্ধকারে সব কিছু ভূতুড়ে লাগে।

শীতলাতলার মোড়ে তখনো পেঁছোয় নি গোক্ষুর, সহসা সোরগোল উঠলো নামো-পাড়ার দিক থেকে। গোক্ষুর থমকে দাঁড়ায়। কান এড়ে

শোনার চেষ্টা করে। মেয়েদের গলার স্বর। একগাদা মেয়ে চিল-চিৎকার জুড়েছে। কোনও বিপদ-আপদ হলো না তো নামো পাড়ায়। নাকি পুলিশ এলো কাউকে ধরতে? মকর থাকে ঐ পাড়ায়। সাত-পাঁচ ভেবে গোক্ষুরের পা দুটো টান মারে সামনে। দাউলি বাঁশখানা শীতলা তলায় নামিয়ে রাখে সে। অন্ধকারে গা বাঁচিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলে নামো পাড়ার দিকে।

নামোপাড়ার মুখটিতে এসে কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয় ব্যাপারখানা। বৈদ্য মল্লিকের ঘরের উঠোনে মেয়েদের মাঝারি ভীড়। পাড়ার আট-দশটা যুবতী মেয়ে ঘিরে ধরেছে একটা লোককে। দমাদ্দম পেটাচ্ছে ওকে। ক্যাঁক-ক্যাঁক লাথি মারছে ওর অস্থানে-কুস্থানে। ওর মাথার চুল ধরে টানছে সর্বশক্তি দিয়ে। গাল পাড়ছে অশ্লীল ভাষায়। কান পেতে শোনা দুষ্কর। একখানা ডিবরি লম্ফ নিয়ে পাশটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, তাকে চিনতে পারলো গোক্ষুর অদ্দুর থেকে। সন্ধ্যা। মকরের বউ। কাকে ধরে মারছে এই নিশুত রাতে? কেন মারছে? চোর নয়। চোর সায়েস্তা করা মরদদের কাজ। প্রথমেই যেটা সন্দেহ হয়, কোনও ঢ্যামনা ঢুকেছিল বৈদ্য মল্লিকের ঘরে। বেমক্কা ধরা পড়ে গিয়ে লাতি-লাথ না চলছে তার। বৈদ্য মল্লিকের বউ পার্বতী দেখতে বেশ। গা-গতরে ভালো। কিন্তু মেয়েটাতো, যদ্দুর জানে গোক্ষুর, নষ্ট চরিত্রের নয়। কোনদিন এমনটা শোনা যায় নি ওর সম্বন্ধে! বুকের মধ্যে একরাশ কৌতূহল আর আশঙ্কা নিয়ে গোক্ষুর এগোতে থাকে।

বৈদ্য মল্লিকের আঁটা ধারে একটা ঘন গাবজোড়া গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ায় গোক্ষুর। চলতি রাস্তা থেকে অল্প তফাতে। উঠোনের মধ্যিখান থেকে দশ-বারো হাতের মধ্যে। ডানপাশে একটা খতকুঁড়। খতসার তুলে সম্পন্ন চাষীদের বেচে দিয়েছে ইতিমধ্যে। ফলে ফাঁকা খতকুঁড় এখন একটি গোলাকার গর্ত বিশেষ। গোক্ষুর নিশ্চিন্ত হলো এই ভেবে যে, তেমন বেগতিক বুঝলে টুক করে নেমে পড়া যাবে গর্তে। নিকষ অন্ধকারে তাকে আর কেউই দেখতে পাবে না।

নাটকটা চলছে গোক্ষুরের চোখের সামনেই। দেখতে দেখতে পুরো ব্যাপারখানা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। মার খাচ্ছে বংশী ভঞ্জ। পালিয়ে যেতে চাইছে প্রাণপণে। কিছুতেই ছাড়ান পাচ্ছে না। চারপাশ থেকে ভীমরুলের মত ছেঁকে ধরেছে প্রমিলাবাহিনী। লাথি-কিলে কাহিল হয়েও জোরে আর্তনাদ তুলতে পারছে না। নিশুত রাতের অন্ধকারে তার এই লাতি-লাঞ্ছনার বিত্তান্ত-খানি যদ্দুর সম্ভব গোপন রাখবার বাসনা তার। তাই, গুনগুনিয়ে মিনতি জানাচ্ছে বংশী ভঞ্জ। যার পা সামনে পাচ্ছে ঝাপটে ধরতে চাচ্ছে। প্রথমে গোক্ষুর ভেবেছিল বংশী বুঝি পার্বতীর ঘরে ঢুকেছিল। বংশী সেটা পারে। ঘোর লম্পট একটি। আগে ছিল কালিয়া হাড়ির বউর সাথে, ইদানিং আনা-গোনা নিশি কামারের বউ মালতীর কাছে। শালার সাহস কত! বাণেশ্বর ঘোষের চাষবাড়িতে বেড়া ভাঙিয়া ঢুকে! মালতীকে ছেড়ে কি ইদানিং পার্বতীকে ধরেছে নাকি? কিন্তু না। আজকের ব্যাপারটা ঢ্যামনামি ঘটিত

নয়। তাহলে পার্বতীও অমন গো-পিটান্ পেটাতো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে গোক্ষুর। ভেতরের গুহ্য রহস্যটি বোঝার চেষ্টা করে। আসল কারণটা বোধগম্য হয়। মুখখানি পাতলা হাসিতে ভরে যায় গোক্ষুরের। আবার, বুকের মধ্যে মৃদু চিন্‌চিনানি ব্যথাও।

গেল কার্তিকে বৈদ্য মল্লিককে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়েছিল বংশী ভঞ্জ। হাতে গুঁজে দিয়েছিল পঞ্চাশটি টাকা। সেই রাগ চেপে বসেছিল পার্বতী। তক্কে তক্কে ছিল। আজ বুঝি ফের মক্কেল খুজতে নামোপাড়ায় ঢুকেছিল বংশী ভঞ্জ। সুযোগটি পেয়েই নামোপাড়ার তাবত যুবতী বৌ-ঝি'রা জন্মের শোধ তুলে নিচ্ছে বংশীর ওপর। তিল তিল জমে ওঠা বিষ ঝলকে ঝলকে উগরে দিচ্ছে গভীর নিশিতে। জ্বলন্ত বাঁশের মত ফট্-ফট্ করে ফাটছে।

প্রায় আধমরা হয়ে এসেছে বংশী ভঞ্জ। মার খেয়ে কাতরাচ্ছে সমানে। 'মা-মা' বলে জড়িয়ে ধরতে চাইছে এর-ওর পা। গোক্ষুরের মনে হলো, কাল নাগিনীদের এই ছোবল বেশিক্ষণ সইতে পারবে না লোকটা, এই বেলা না বাঁচালে।

চিৎকার শুনেই হাজির হয়েছে চারপাশের ঘর থেকে মরদের দল। বুড়ো-বুড়ি, কাচ্চা-বাচ্চারা চোখ দলতে দলতে এসে দাঁড়িয়েছে। চারপাশ থেকে রোল উঠেছে, 'ছাড়িয়া দে, ঢের হয়েছে, মরিয়াবে লোকটা।' মুখেই বলছে কেবল। এগিয়ে এসে হাত লাগাচ্ছে না কেউ। ডিবরির ম্লান আলোয় ওদের ভূতুড়ে ছায়াগুলো প্রেত নৃত্য জুড়েছে চারপাশে।

গোক্ষুর লক্ষ্য করে লোকগুলোকে। ভীড়ের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই অপারেশন করিয়েছে প্রবল অনটনের দিনে। বোবা চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ঝিমিয়ে পড়া লতার মতন। ভাঙা ভাঙা চোয়ালের আড়ালে গুপ্ত বিষাদ, গাঢ়। কোটরের মধ্যে ডুবে থাকা চোখ দুটিতে তীব্র হতাশা। গোক্ষুর বুঝতে পারছিল, মনে মনে দোষী হয়ে রয়েছে লোকগুলো যে যার ঘরণীর কাছে। মরমে মরে রয়েছে হয়তো বা। সেই কারণেই, সম্ভবত, দূরে দাঁড়িয়ে মিনমিনে গলায় বারণ করলেও, সাহস করে কেউ আসতে চাইছে না কালনাগিনীদের নাগালের মধ্যে। অতখানি সাহস দেখিয়ে কেউ বংশীকে উদ্ধার করবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

চিল-চিৎকার জুড়েছে মেয়েগুলো। জ্বলন্ত বাঁশের গাঁট হয়ে ফাটছে পার্বতী। অশ্লীল এবং বিকৃত কোনও সম্বোধনই নেই যা প্রয়োগ করছে না বংশীর উপর। এই প্রবল শীতের রাতেও গলগলিয়ে ঘামছে।

একসময় নেতিয়ে পড়লো বংশী। ধুপ করে পড়ে গেল উঠোনের মাধ্যখানে। মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে। গোঙানি তুলছে নাকে।

'মারিয়া ফেললু নাকি রে ?' বুড়া যুধিষ্ঠির কোটাল বলে ওঠে, 'ফাঁসিতে ঝুলিবি সব ক'টা !'

ধীরে ধীরে সংবিত ফিরে পায় মেয়েগুলো। হাঁফাচ্ছিল : গলগলিয়ে ঘামছিল। চোখগুলো জ্বলছিল পিশাচিনীর মত। ঐ অবস্থায় সরে আসে

ওরা উঠোনের একধারে। সাহস পেয়ে এগিয়ে যায় যুধিষ্ঠির কোটালের পিছু পিছু তাবত দর্শককুল। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় বংশী ভঞ্জর চারপাশে। যুধিষ্ঠির কোটালের নির্দেশ মত জল আসে ঘটিতে। জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা চলে। দেখে শুনে একসময় ধীর পায়ে পিছু হঠতে থাকে গোক্ষুর ভক্তা। গাবজোড়া গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা' দেয়। নিঃশব্দ পায়ে চলে আসে নিরাপদ দূরত্বে। কেস শেষ অবধি কোথায় যাবে, কদ্দুর গড়াবে, কে জানে! কি দরকার প্রকাশ্যে সাক্ষী হয়ে থাকবার। গোক্ষুর হাঁটতে থাকে। শীতলাতলায় এসে অন্ধকারে হাতড়ে তুলে নেয় দাউলি বাঁশখানা। তারপর রওনা দেয় আগুনজ্বলা মাঠের দিকে।

আগুনজ্বলা মাঠের থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে কাঁটা-বাঁশের কঞ্চি কেটে এনে পাথর গেড়িয়ার জলে ফেলে, গোক্ষুর যখন ঘরে ফিরলো তখন পূয়া তারা উঠি উঠি করছে।

সারারাত ঘুমোতে পারেনি পঞ্চমী। হরেক আশংকা তাকে চাবকেছে রাতভর। জলঘাট বুসতে গিলা অতক্ষণ কুথা গেল লোকটা।

প্রশ্নটা শুনে ক্ষণকালের তরে থতমত খায় গোক্ষুর। বলে, ঐ যে, বংশী ভঞ্জকে ধরিয়া পিটাচ্ছে নামোপাড়ার বউগুলা। মারের চোটে ফিট হয়্যা গেছে শালা। দূর থেকে এক শোরগোল ভেসে আসছিল পঞ্চমীর কানে। গোক্ষুর বিতাং করে শোনায় ওকে। শুনে খানিকক্ষণ কাঠ মেরে শুয়ে থাকে পঞ্চমী। সহসা গোক্ষুরের দিকে পাশ ফিরে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে।

সহসা, কেন জানি, আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে পঞ্চমী। দমকে দমকে কাঁদতে থাকে। রাতভর কান্না বুঝি থামে না তার।

॥ আঠাশ ॥

প্রণব গুহর জায়গায় নতুন মাস্টার নেওয়ার জন্য নিয়মমাফিক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। ইন্টারভিউ নিয়ে প্যানেল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ডি-আই অফিসে। প্যানেলের একনম্বরে চপলাকান্তর নাম। প্যানেলটা মঞ্জুর হয়ে এলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ধরিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলের কেরানী নগেন দাসকে একান্তে বলে রেখেছে বাণেশ্বর, 'তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টাইপ করিয়া রাখিয়া দও, যাতে প্যানেলটা মঞ্জুর হয়্যা আইলেই এক ঘণ্টার মধ্যে ধরিয়া দিবা যায়।' নগেন দাস অনুগত ব্যক্তি। নির্দেশ মত কাজ এগিয়ে রেখেছে সে।

আজ কোর্টের কাজ শেষ হলে একবার ডি-আই অফিস যেতে হবে। গেল হপ্তায় পুজো চড়িয়ে এসেছিল বাণেশ্বর। ফলটা ফললো কিনা দেখা দরকার। তা বাদে, পার্টি অফিসেও যেতে হবে একটিবার। কানা ঘুসায় যা শোনা

যাচ্ছে, দু'দশ দিনের মধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা হবে। পার্টি অফিসে নির্ঘাৎ পাকা খবরটি পাওয়া যাবে। এবারে নারাণগড় কেন্দ্রে কে টিকিট পাবে কে জানে! গেলবারে দাঁড়িয়েছিল রজনী সেন। তার তো কীর্তিকাণ্ডের ইয়ত্তা নেই। ঘুষ খেয়ে চাকরি দেওয়াটাকে সে একটি শিল্পের পর্যায়ে তুলেছে। চার জায়গায় চারটি বউ আছে তার। এ ছাড়া আছে, শতেক গোপিনী। মেয়ে প্রার্থীদের ভালো করে না চেখে কোন দিনও চাকরিতে ঢোকায় নি সে। তাকে নিয়ে হাজারো রসালো গল্প চালু আছে বাজারে। এই তো কিছুদিন ধরে নিতাই মাস্টারের পার্টি একটা চমচমে পোস্টারে ভরে দিয়েছে নারাণগড়ের দেওয়াল ঃ আসিছে রজনী, পালাও রমণী। এবারে ওকে দাঁড় করালে জামানত জব্দ হবে নির্ঘাৎ। ভাবতে ভাবতে ডান চক্ষু নৃত্য জুড়ে দেয়। মনে পড়ে যায় রমণীমোহনের কথাগুলো, 'আপনাকে আরো তোলা হবে বলেই হয়তো নামানো হলো প্রেসিডেন্টের পদ থেকে।' ভারি রহস্যময় হেসেছিল রমণী-মোহন। বাণেশ্বরের ঠোঁট দুটো ভিজে ওঠে। সিকেটা কি সত্যিই ছিঁড়তে চলেছে, জীবনের এই শেষ বেলায়! সারাজীবন আঁকড়ে থেকে ঐ পর্যন্ত জুটেছে, থানা কমিটির প্রেসিডেণ্ট আর রজনী সেন-এর ইলেকশন এজেন্ট। এবার কি তবে সত্যি সত্যি··· ।

কেলেঘাইয়ের পাড় ধরে জোর কদমে হাঁটছিল বাণেশ্বর ঘোষ। গরুর গাড়িতেই যাতায়াত করে। কিন্তু আজ আর সময় নেই হাতে। বিছানা ছাড়তে দেরি হয়ে গেছে। গরু হাঁটবে ঠুকুর ঠুকুর। কেলেঘাইয়ের এপাশ ওপাশ মিলে মাইল-টাক বালি। সবদিকে ভেবে, হেঁটে আসাই সাব্যস্ত করেছে বাণেশ্বর। গাড়ি আসবে ওবেলায়। মোতায়েন থাকবে নারাণগড়ে।

রামেশ্বরের খুনের মামলাটা আজ উঠবে ফের। সাড়ে-আটটা নাগাদ একটা বাস আছে নারাণগড়ে। ওটা ধরতে পারলে কোর্ট বসার আগেই পেঁছে যাবে বাণেশ্বর। পর পর দুটো সাক্ষীতোলার তারিখ পার হয়ে গেছে। কিন্তু নিশি কামারকে হাজির করতে পারে নি বাণেশ্বর। শালা সেই যে বিছানা ধরেছে, আজও তার ওঠার নাম নেই। তার নাকি এক হাত, এক-পা অসাড়। নিজের থেকে ভুলতে পারছে না। বাধ্য হয়ে উকিল দিয়ে দিন নিতে হল বাণেশ্বরকে। আজও সেই একই বিত্তান্ত। বাণেশ্বরের পক্ষে আজও দিন না নিয়ে উপায় নেই। উকিল বলে দিয়েছে আগের বারেই, এমন করলে মামলা কেঁচে যাবে। শালা নিশি কামারের সত্যি সত্যিই হাত-পা পড়েছে, নাকি ঠ্যাঁট কচ্ছে, ভগবানকে মালুম। শ্যাম চক্রবর্তী ওর যৌনশক্তি ফেরাবার জন্য কি সব ইসিড়-বিসিড় টোটকা ওষুধ গেলাচ্ছিল আজ ক'মাস। কি কত্তে কি হয়্যাল কে জানে! এসব তন্ত্র-মন্ত্র বহুত খারাপ চিজ। ফললে ভালো, উল্টালে আর রক্ষা নেই। কিন্তু নিশি কামার জাহান্নামে যাক। অর সাক্ষী বিহনে মামলাটা কাঁচিয়া যায় যে! এদিকে বংশী ভঞ্জ মার খাওয়ার পর শ্যাম চক্রবর্তীর ওপর ভক্তিটা অনেকগুণ বেড়ে গেল নিশিকামারের। উচাটন-তন্ত্র তাহলে ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। নাহ্, এ ভারি দুশ্চিন্তায় পড়া গেল!

সামনে ঢালু পথ। এঁকে বেঁকে নেমে গেছে কেলেঘাইয়ের গর্ভে। এখন এই শীতে কেলেঘাইয়ের বুক খাঁ-খাঁ। লম্বা বালির সরা পড়েছে। দু'পাশে আকন্দ, টক-কুল, আর আশ-শ্যাওড়ার ঝোড়। জায়গাটা ভারি নির্জন। পেছনে মাইল দূরে মেট্যাল। সামনেও মাইলটাক দূরে বীরকাঁড় গাঁ। দিনেরবেলাতেই গা' ছমছম করে।

বীরকাঁড়ের দিক থেকে আসছিল গোক্ষুর ভক্তা। গতকাল রাতভর পঞ্চমীর সঙ্গে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় উজাগর হয়ে কাকডাকা ভোরে গিয়েছিল বীরকাঁড়। মধু মল্লিক বীরকাঁড়ে আছে আজ দু'তিন দিন। গোক্ষুরের ইচ্ছে ছিল মধুকে নিয়ে শেষবার যায় নিতাই মাস্টারের কাছে। যদি সে শেষ মুহূর্তে কোনও বুদ্ধি জোগায়। মধু মল্লিক ঘরে নেই। সে গেছে খড়্গপুর। তার কলেজে নাকি ভোট হচ্ছে। মধু নাকি দাঁড়িয়েছে ভোটে। বিফল মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরছিল গোক্ষুর ভক্তা। ফিরে গিয়ে তাকে যেতে হবে শিল-পাথরার ডাঙায়। ঐ কাজটাই তো এখন বলতে গেলে অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়।

সহসা সামনে বাণেশ্বর ঘোষকে দেখে হকচকিয়ে গেল গোক্ষুর। বাণেশ্বরও তথৈবচ। সন্দেহ কালো হয়ে ওঠে বাণেশ্বরের মুখ। জপের থলির মধ্যে আঙুল থেমে যায় অজান্তে। এই সাত সকালে কুথা থিকে আসছে, শালা?

কাছাকাছি আসতেই ম্লান হাসলো গোক্ষুর। বললো, 'কেমন আছ, ঘোষদা?'

বাণেশ্বর ঘোষ তখন রাগে জ্বলছে। বললো, 'থানার চিঠি পাইছু?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় গোক্ষুর।

'আর মোর চিঠিটা?'

'পাইছি।' গোক্ষুরের গলা সহসা ধরে আসে, 'কিন্তু ইটা তুমার ধর্ম হইলো ঘোষদা? তুমার তরে মুই ঢের নীচে নামছি।'

'যাশ্‌শালা! মোর তরে আবার কবে নীচুতে নামলি তুই?' বাণেশ্বর ঘোষ যার-পর-নাই আহত, 'তরা লধবার জাত। চুরি তোদের পেশা। নিজেদের রক্তের দোষে চুরি করু তরা। মোর তরে নীচে নামলু?'

'সেটা হয়ত মিছা নয়।' গোক্ষুর বিড় বিড় করে যেন নিজের মনের সাথেই কথা কইতে থাকে, 'ভোখের জ্বালায় চুরি-চামারি করি। কিন্তু তুমরা ক্যানে এই চুরির মালগুলা লও, বল দেখি?'

'শুন কথা!' দু'চোখ কপালে ওঠে যায় বাণেশ্বর ঘোষের, 'চুরির মাল আমরা না লিলে, ভোখের জ্বালা মিটতো তদের? সোনা-দানা, বাসন-কুসন-গুলা কি চিবিয়া চিবিয়া খাইতু নাকি?'

'আচ্ছা, চুরির মাল লিত, বেশ কত্ত, চুরি ছাড়িয়া দিলেও তুমাদের হাত থিকে নিস্তার নাই ক্যানে কও দেখি? চুরি ছাড়িয়া দিলে তখন হাজার উপায়ে লতি-লাঞ্ছনা করতে থাক। ডাকাতির কেসে জুড়িয়া দিয়া, বন্ধকী ভিটার দখল লিয়া, লচেত থানা হাজিরা—। ইঁদুরকে যমন খাঁচা কলে পুরিয়া

চুবকিয়া চুবকিয়া মারে, ঠিক তেমনি করিয়া হাজার ছলে মারতে থাক মোদের।'

বাণেশ্বর ঘোষ চুপটি করে শুনছিল গোক্ষুরের কথাগুলো। নিষ্পলক দেখছিল ওকে। চোখ বড় বড় করে বললো, 'এগুলো কি নিতাই মাস্টার শিখাচ্ছে নাকি রে? তোর মু' থিকে বারাচ্ছে বটে, কিন্তু তোর গলার আবাজ ত' এটা নয়।'

বলতে বলতে চোখ-মুখ বদলে যেতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষের। কপালের বলিরেখাগুলো টানটান হয়। চোখের রক্তাভ শিরাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে।

থির পলকে গোক্ষুরের দিকে চেয়ে বলে, 'যাগ্‌গা তোর সঙ্গে তক্কো করিয়া লাভ নাই। কালের বাদ পরশু যাবো হাল-বলদ লিয়া। তোর ভিটায় হাল চষবো ঐ দিন। দখলটা দিয়া দিবি, ফুরিয়া গেল কথা।'

নিমেষের মধ্যে যেন নিভে গেল গোক্ষুর ভক্তা। মাত্র একদিন বাদেই ভিটে-ছাড়া হতে চলেছে সে! নিতাই মাস্টার যখন ফেল মেরেছে, তখন গোক্ষুরের ভিটে ছাড়া হওয়াটা রুখতে পারবে না কেউ। এ ক'মাস মাস্টারের সঙ্গে ঘোরা ঘুরি করে গোক্ষুর বুঝেছে, পাক্কা সংগঠক হলেও, বুকে অদম্য সাহস থাকলেও একটা সময়ে নিতাই মাস্টার-ও কত অসহায়!

নিতাই মাস্টারের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায় গোক্ষুরের। মুই তো সর্বশক্তিমান নই যে দেশের আইন, কানোন, থানা-পুলিশ উলটিয়া দুবো। তাইলে কি আর লুকিয়া বুলি পুলিশের ভয়ে। মোকে ভুল বুঝিব নি গোক্ষুর।

অসহায়বোধটা বাড়ছিল গোক্ষুরের মনে। ভেতরে একটা জ্বলন্ত আক্রোশও। বাণেশ্বর ঘোষকে একটি হিংস্র জানোয়ারের মত লাগছিল তার। চুরিটা ছেড়ে দিয়েছে গোক্ষুর। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, বাণেশ্বরের বাখুলে শেষ ডাকাতিটা করেই কি এই পাপ বিদ্যায় ইতি টানবে সে? বাপের পেশাটা কোনওদিনই গ্রহণ করেনি গোক্ষুর। মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো ওটাকে আজীবনকাল। আজ কি ঐ পেশাটা প্রথম এবং শেষবারের মত প্রয়োগ করবে এই পিশাচটার উপর!

ভাবতে ভাবতে প্রবল আক্রোশে অন্ধ হয়ে ওঠে গোক্ষুর। তুরুপের শেষ তাসখানা বের করে সে। সাপের মত হিসহিসে গলায় বলে, ঠিক আছে। তুম্মো মোকে ভিটা থিকে উচ্ছেদ কর। মুইও কোর্টে গিয়া সাক্ষী দুবো তুমার নামে।'

'সাক্ষী? কি সাক্ষী দিবি তুই?' বাণেশ্বর ঘোষের মোটা ভুরু-জোড়া ঈষৎ কোঁচকায়।

'নিজের দাদাকে স্বহস্তে খুন কল্লে আমাবস্যার রাতে। ফণী আর সুবলো উয়ার দু'পা চাপিয়া ধল্ল। সাদিক মিঞ্যা চাপিয়া বুসলো অর ছাতির উপর। তুমি টাঙ্গিটা তুলিয়া পরুখমে নামিয়া লিলে—!'

'থাম্‌, থাম্‌ গোখরা, থাম্‌!' হাঁফাতে থাকে বাণেশ্বর ঘোষ। গলগলিয়ে ঘামতে থাকে।

ওর অবস্থা দেখে দ্বিগুণ মজা পায় গোক্ষুর। বুকের মধ্যে জেগে ওঠে সীমাহীন উল্লাস। বলে, 'টাঙ্গিটা কুথা লুকিয়া রাখছ, সেটাও মুই জানি।'

প্রায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লেগেছে বাণেশ্বর ঘোষ। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। ফি-বচ্ছর কালীপুজোর রাতে বাণেশ্বরের উঠোনে বলির ছাগলগুলো ভেজা গায়ে ঠিক অমনি করে কাঁপে। শুকনো ঠোঁটজোড়া চেটে নিয়ে বাণেশ্বর ঘোষ বললো, 'তুই কি করিয়া জানলি এসব?' গোক্ষুরের ঠোঁটের কোণে একচিলতে নিম-তেতো হাসি খেলে যায়।

বলে, 'চোরা-গোখরা মুই। গু'খাবা বিদ্যায় টানে কখন্‌ যে কার ঘরে গিয়া হাজির হই, তার কি কুনো ঠিক-ঠিকানা আছে? সক্কলে বলে, কানা-ঘুষায় শুনি রামেশ্বর মিলিটারি থিকে বহুত কাঁচা টাকা আর কাবলীদের দেশ থিকে বহুত সোনাদানা লিয়া আসছে। ঐ লোভে, সেদিন রামেশ্বরের ঘরের কানাচে না গেলে কি আর দেখতে পাইতাম অমন নাটকটা! কিন্তু খবরদার—।' গোক্ষুর কপাল টান টান করে বলে, 'ঐ টাঙ্গি পাথর-গেড়্যা থিকে তুলবার চেষ্টাটিও করবে নি তুমি। দেখলেই চিচ্‌কার করিয়া লোক জোটো করবো। ইদানিং দিনে-রাতে আমি নজর রাখি পুকুরটা। বহুত কাঁটাবাশের ঝাঁপ ফেলিয়া রাখছি পুকুরময়। জাল টানতে তো পারবেই নি। কাঁটাঝাড় পরিষ্কার করিয়া মাঝ পুকুর থিকে ঐ টাঙ্গি তুলতে নাগাড়ে সাতটি দিন সময় লাগিয়াবে।'

বলতে বলতে গোক্ষুরের সারা মুখে ফুটে ওঠে বিশ্ব বিজয়ের হাসি।

বলে, 'কোর্টের হুকুমে যখন ঐ টাঙ্গি তুলা হবে সর্বজনের সাক্ষাতে, মানুষ জন দেখবে, অতে নিশি কামারের হাতে খোদাই করা নামখানি জ্বল-জ্বল কচ্ছে, শিরি বাণেশ্বর ঘোষ, সাং-মেটাল, পোস্ট-ডিবরপুণ্ড, জিলা মেদিনীপুর।'

গোক্ষুর নিজের সাফল্যের আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে ওঠে।

কথাটা ডাহা সত্যি। টাঙ্গিটা যদি পুকুরের তলা থেকে তোলা যায়, সনাক্ত করতে তিলমাত্র দেরী হবে না। বাণেশ্বরের বাড়ির সব যন্ত্রপাতি-কোদাল, কুড়ুল, টাঙি কাটারিতে নাম-ধাম লিখে দেয় নিশি কামার। দুনিয়ার লোক জানে সেটা।

শীতের সকালে কুলকুলিয়ে ঘামতে লেগেছে বাণেশ্বর ঘোষ। যেন তলিয়ে যাচ্ছে অকূল পাথারে। সারা মুখ জুড়ে পাকা জামফলের রঙের মেঘ। ঠোঁট দুটি অল্প কাঁপছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'গোক্ষুর, মোর অতবড় সর্বনাশটা করবি তুই?'

বাণেশ্বর ঘোষের গলার আওয়াজে চমকে ওঠে গোক্ষুর। এ তো সেই

পরিচিত কণ্ঠ নয়। আসলে পালটে গেছে গলার স্বর। কাতর মিনতি মাখানো গলায় যেন নতজানু একটি মানুষ আর্তনাদ তুলেছে, মরিয়ালি গো, ছাড়িয়া দও, আর চুরি করবো নি।

ভাঙাগলায় গোক্ষুর বলে, 'তুমি মোকে ভিটা ছাড়া কত্তে পারুছ, আর মুই তুমার নামে সাক্ষীটা দিতে পারবো নি?'

বাণেশ্বর ঘোষ ব্যাকুল চোখে দেখছিল গোক্ষুরকে। তার মুখের প্রতিটি রেখা পড়বার চেষ্টা করছিল সে।

ঠোঁট জোড়া কাঁপিয়ে নরম গলায় বললো, 'হাঁ রে, গোক্ষুর, একটা কথা সত্যি করিয়া কইবি?'

'কি কথা?'

এদিক ওদিক তাকায় বাণেশ্বর।

বলে, 'কে কখন আইসিয়া পড়বে। চল্ উই পলাশ ঝোড়ে উধারে গিয়া বুসি। গোটাকত কথা বলবার আছে মোর।

দু'জনে গিয়ে ঝোড়ের আড়ালে বসে।

বাণেশ্বর নিচু গলায় বলে,

'তুই ত মোর নিজের লোকটি ছিলি। মোর চিরকালের সুখ-দুখের সাথী। তুই কি করিয়া মোর অতবড় শত্রুটা হইলি বল্ দেখি?'

গোক্ষুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাণেশ্বরের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতার দিনগুলো সহসা ঘাই মারতে থাকে মনের মধ্যে।

'বুঝিয়া গেছি।' বাণেশ্বর ঘোষ বিষণ্ণ গলায় বলে, 'মানুষই কামড়িছে তোকে। সাপের বিষ, ঝাড়লে নামে, মানুষের বিষ নামে না।

'মানুষ কামড়ায় নি ঘোষ দা, শত্রুতা যেদি কোই করিয়া থাকে ত সে তুমি।'

'মুই? মুই শত্রুতা কচ্ছি তোর সঙ্গে? এ কথাটা তুই কইতে পারলি?'

'ক্যানে কইবো নি?' গোক্ষুরের চোখ সহসা ভিজে আসে, 'তুমার কথায় ভুলিয়া বউয়ের পরসব বেদনা দেখিয়াও চুরি করতে গেলাম কাঞ্চন-বুড়ির ঘরে। সেই বাবদ গোটা পঞ্চাশেক টাকাও বেশি দিলে না তুমি। বউটা মরিয়াল। বউয়ের দুঃখে চুরি-চামারির উপর বিতিষ্ণা ধরিয়াল মোর। ছাড়তে চাইলাম ঐ গু-খাবা বিদ্যা। তুমি ক্যানে থানাকে দিয়া বাঁধা করালে বার বার? ডাকাতির মিচ্ছা কেস দিলে মোর নামে? ফের জামিন লিয়া, সেই খচ্চা বাবদ ঋণ চাপালে ঘাড়ে। যদি টাকার তরে ফের চুরি-চামারি ধরি। কিছাতেই নাই পারিয়া এখন ভিটা থিকে উচ্ছেদ কাচ্ছ। পোয়াতী বউটাকে লিয়া পথে দাঁড়াতে হচ্ছে মোকে! সত্যি করিয়া কও ত ঘোষদা, যদ্দিন চুরি কচ্ছি,—কচ্ছি। মালও দিছি তুমাকেই। আইজ যেদি মুই চুরি-চামারি ছাড়িয়া দিতে চাই, তার তুমার কী?' গোক্ষুর হাঁফাতে থাকে উত্তেজনায়।

বাণেশ্বর ঘোষ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মত। সহসা কোনও কথা

জোগায় না তার মুখে।

এক সময় ধীর গলায় বলে, 'তুই না চুরি কল্লে মোর কিছুই নয়। কিন্তু সত্যি বলছি, মুই ভয় পাইয়া গেলাম। ভাবলাম, লখুয়া ফের চুরি ছাড়ে? এর মধ্যে নিতাই মাস্টারের কুনো গুহ্য কৌশল আছে।'

'নিতাই মাস্টারের কথা ইখুনে আসে ক্যানে?'

'আসে এই কারণে যে, কানা-ঘুসায় বহুত কিছো শুনতে পাচ্ছি মুই। তুই নাকি নিতাই মাস্টারের দলে ঢুকছু। নিয়মিত মিটিং-এ হাজির হচ্ছু। তুই নাকি নিতাই মাস্টারের বডি-গার্ড। আসছে ভোটের টাইমে, তুই নাকি অর মিটিং-এ সব কথা ফাঁস করিয়া দিবি।' অসহায় চোখে তাকালো বাণেশ্বর ঘোষ, 'এখন ত দেখছি, তুই দাদার খুনের কেসের সাক্ষীও দিবি বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলছু। এটা অবশ্যি কাল অবধি মোর জানা ছিল নি।'

গোক্ষুর ভক্তা মন দিয়ে শুনছিল বাণেশ্বরের কথাগুলো। নিতাই মাস্টারের সঙ্গে ওর ঘোরাঘুরির খবরগুলো চলে এসেছে বাণেশ্বর ঘোষের কানে! ভারি অবাক কাণ্ড! তার মানে, নিয়মিত গোপন মিটিং-এ যায় যারা, তাদের মধ্যে অমন কেউ আছে, যে কিনা বাণেশ্বর ঘোষের লোক। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে গোক্ষুর। কে সে লোকটি? কে? কে?

নিজেকে সামলে নিলো গোক্ষুর। উপস্থিত একটা সুযোগ এসেছে ভিটে-খানি বাঁচানোর। বললো, 'এটাই যেদি তুমার সন্দেহ, তেবে চল মা-কালীর থানে। মন্দির ছুঁইয়া দিব্যি করবো, তুমার নামে একটি কথাও ফাঁস করবো নি মুই। জীবন থাকতে নয়। তুম্মো মা-কালীকে ছুঁইয়া দিব্যি করবে, মোর বন্ধকী দলিল ফেরত দিয়া দিবে, সব ডাকাতির মিচ্ছা কেস থানাকে বলিয়া তুলিয়া দিবে, আর মোর পিছে কুনো দিনও লাগবে নি। চল।'

এক দৃষ্টিতে গোক্ষুরকে দেখছিল বাণেশ্বর ঘোষ। গোক্ষুরের কথার সত্যতা এবং আন্তরিকতা যাচাই করবার চেষ্টা করছিল সে।

বললো, 'তুই যা কইলু, তা সত্যি মানবি ত? নাকি শেষ মেষ—।'

'দেখ ঘোষদা, 'মুর্খসুর্খ মানুষ বটে মুই। নীচু জাত। চুরি-চামারি কচ্ছি জীবনে বহুত। তা বলিয়া জীবনে কারো সঙ্গে বেঈমানি করছি, অমনটা কইত্তে পারবে নি ক' কেউ।'

গোক্ষুরের কথাগুলো বিশ্বেস করবার চেষ্টা করে বাণেশ্বর ঘোষ।

দু'চোখ ছোট করে বলে, 'দাদার খুনের ব্যাপারটা কাকেও কইছু?'

'কাকো না।' লম্বা করে মাথা নাড়ায় গোক্ষুর।

'নিতাই মাস্টারকে?'

'কাক্কো বলিনি। বিশ্বাস কর তুমি। মা-কালীর কিরা।'

'মা-কালীর থানে দিব্যি করিয়া কইতে পারবি?'

'কইবো। নিশ্চয় কইবো। চল, অক্ষুনি চল।'

উঠে দাঁড়ায় গোক্ষুর। দেখাদেখি বাণেশ্বরও। সহসা গোক্ষুর ভক্তার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে বাণেশ্বর ঘোষ।

বলে, 'ব্যাটার নামে দিব্বি করিয়া বলছি গোক্ষুর, তুই যেদি মোর কুনো কথা ফাঁস করিয়া না দিস, তেবে আজ থিকে তোর সঙ্গে মোর কুনো শত্রুতা নাই। তুই চুরি ছাড়িয়া দিলেও, না।'

বলতে বলতে গলাটা ধরে আসে বাণেশ্বরের। গোক্ষুরের হাত দুটো আরো শক্ত করে জাপটে ধরে বলে, 'তোর প্রথম পক্ষেরটাকে মুই ফিরিয়া দিতে পারবো নি। কিন্তু তোর বাস্তু ভিটার দলিল আজই তোকে ঘুরিয়া দুবো। চল্‌, তক্ষুনি মোর সাথে চল্‌ মোর ঘরে। কোর্টের হাজিরা না দিলে উকিল দিন লিয়া লিবে। চিন্তা নাই। চল্‌।'

সহসা এমন অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি-যোগে কেমন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যায় গোক্ষুর ভক্তা। সহসা নিতাই মাস্টারের মুখখানা মনে পড়ে তার। আজ দুটি মাস নিতাই মাস্টার হাজার মাথা খাটিয়েও যে ফলটি পেড়ে দিতে পারে নি, সেই ফলটিই আজ গোক্ষুরের সমুক্ষে টুপ করে খসে পড়েছে। তাকে প্রত্যাখ্যান করা কি ঠিক হবে? এটা ঠিক, নিতাই মাস্টারকে বললে সে প্রবলভাবে বাধা দেবে গোক্ষুরকে। বলবে, সামান্য একচিলতা ভিটার তরে এমন সুযোগটা ছাড়িয়া দিবে পার্টি? অমন নরপিশাচের কীর্তিগুলান জানতে পারবে নি তাল্লাটের মানুষ? মুই বচ্ছরের পর বচ্ছর এরই তরে ভিটা ছাড়া হয়্যা ঘুরিয়া বুলছি রে গোক্ষুর, তুই তা পারবি নি? গোক্ষুর তখন নিতাই মাস্টারের কথা অনুগেরাহ্যি করবার সাহস পাবে কিনা বলা কঠিন। মাঝের থেকে ভিটেখানি চলে যাবে বাণেশ্বরের দখলে। পুয়াতী বউটাকে লিয়া গোক্ষরকে পরের দোরে হাঁড়ি টাঙতে হবে, নয়তো রাস্তায় গিয়া দাঁড়িতে হবে। গোক্ষুর ঠিক করে ফেলে এই একটা ক্ষেত্রে সে নিজের স্বার্থটাই দেখবে। তা ছাড়া, কি দরকার ঐ চোরা জীবনের কাসুন্দি ঘেঁটে, যার সঙ্গে সে নিজেও জড়িত। কি দরকার খুনের কেসের সাক্ষী দিয়ে? খুনের রহস্যের কিনারা করবার কাজ পুলিশের। তাদের কাজ তারা করুক। গোক্ষুরের কি দায়, সাধ করে বিপদ ডেকে এনে? গোক্ষুর পুরো ব্যবস্থাটায় রাজী হয়ে যায়। বলে, 'মা-কালীর থান ছুঁইয়া দিব্যি করবো দু'জনেই। কিন্তু দলিল ফেরত দিয়া তুমি ফের মোকে চুরি কত্তে বলবে নি তো?'

'মা-কালীর থান ছুঁইয়া সেটাও বলবো মুই।' বাণেশ্বর ঘোষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করে কথাগুলো, 'তোকে চুরি কত্তে কইলে জিভ খসিয়াবে মোর। চল্‌, চল্‌ অক্ষুনি। দেরি করিয়া কি লাভ?'

একটুক্ষণ গভীর ভাবনায় ডুবে যায় গোক্ষুর।

তারপর নীচু গলায় বলে, 'অখন নয়। আজ রাতে যাবো তুমার দুয়ারে। চুপে চাপে সারিয়া ফেলবো কাজ। পাঁচ কান হইলে নিতাই মাস্টার আর অর দল মোকে বড় দুষবে।'

উকিলকে দিন নিতে বলে, জলদি জলদি ঘরে ফেরবার জন্য পা বাড়িয়েছিল বাণেশ্বর ঘোষ। আজ দিনভর তার শরীরখানা তিরতিরিয়ে কাঁপছে। মাথার

মধ্যে শুরু হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। গলা-জিভ শুকিয়ে আসছে বারংবার। গোক্ষুর ভক্ত ঐ মারণ-বাক্যগুলো উচ্চারণ করবার পর থেকেই শুরু হয়েছে এসব। একজন মানুষ নিঃশব্দে দেখেছে সে রাতের তাবত ঘটনা। এমন কি অস্ত্রখানি কোথায় রয়েছে তাও নখদর্পণে তার। অথচ সেটা এতদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি বাণেশ্বর। পারলে কি আর নির্বোধের মত ওকে চারপাশ থেকে চটকাতো এমন করে। কবেই রফা করে ফেলতো ব্যাপারটার। ভাগ্যে দ্বিতীয় কান হওয়ার আগেই কথাটা জানতে পারলো বাণেশ্বর। নচেত গোক্ষুরের সঙ্গে রফা করলেও অন্য খানে থেকে যেত বাণেশ্বরের মৃত্যু বীজ।

এই সব সাত-সতের ভাবনায় বুঁদ হয়ে কোর্ট চত্বরে হাঁটছিল বাণেশ্বর। সহসা সামনে যেন ভূত দেখলো সে।

প্রণব-মাস্টার।

কালো শামলা গায়ে চড়িয়ে খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল কোর্ট ঘরের দিকে।

বাণেশ্বর ঘোষের মুখোমুখি হয়ে প্রণবও হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু খুব সামলে নিলো নিজেকে। হাসলো।

'কেমন আছেন, বাণেশ্বরবাবু?'

'ভালো, ভালোই আছি।' বাণেশ্বরের বিহ্বল ভাব কাটেনি তখনো, 'আপনি? এ বেশে?'

'প্র্যাক্‌টিশ করছি।' উজ্জ্বল হাসে প্রণব, 'ভেবেছিলাম, ছাত্র পড়িয়েই কাটিয়ে দেব জীবনটা। আপনারা সেটা হতে দিলেন না। তাই নেমে পড়লাম চোর-ছ্যাঁচোড়দের পড়াবার কাজে।'

বাণেশ্বর অবাক হয়ে শুধোয়, 'কিন্তু আপনি অকালতি পাশ কল্লেন কবে?'

'সে অনেক আগে।'

বিষয়টি মোটেই বোধগম্য হয় না বাণেশ্বরের। অনেক আগে ওকালতি পাশ করে একটা লোক ঐ অজ গাঁয়ে মাস্টারি করতে গিয়েছিল কেন? এ কি মুর্খামি!

প্রণব মিটি মিটি হাসছিল তখনো। তাই দেখে বাণেশ্বরও মুখে কাষ্ঠ-হাসি ফোটায়।

'ভালোই হইল। আপনি হইলেন আমার, আমাদের, সারা মেট্যাল গাঁয়ের আপনজন। নিজেদের মধ্যেকার একটা উকিল পাওয়া যে কত সুবিধার ব্যাপার—। আচ্ছা, চলি। বিকাল গড়িয়াল। সামনে আঁধার—।'

বাণেশ্বর ঘোষ কোনও গতিকে সরে আসতে চায় প্রণবের সামনে থেকে। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল। অস্বস্তিটা কাটানোর জন্য একটা বিড়ি ধরালো। তারপর পা বাড়ালো।

'ডি-আই অফিসে গেছলেন?'

প্রণবের আচমকা প্রশ্নে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় বাণেশ্বর। 'না—তো।'

মিটমিট হাসছিল প্রণব। অতি উদার হাসি।

বললো, 'একটু ঘুরে যাবেন, ঘরে ফেরার আগে। খবর আছে আপনার। জোর খবর।' বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে ডান হাত মাথার ওপরে তুললো প্রণব। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল সি-জে-এম-এর এজলাসের দিকে।

বাণেশ্বর থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গাছের তলায়। হাতের বিড়িখানা জ্বলছে। খেয়ালই নেই তার। ডান চোখটা আবার নৃত্য জুড়েছে। প্রণবের মুখের ভরাট হাসিখানি ভাসছে চোখের সামনে। কথাগুলো ভোমরার মতো গুণগুনাচ্ছে মনে। আকাশের দিকে এক ঝলক তাকালো বাণেশ্বর। বেলা পড়ে এসেছে। পার্টি-অফিসটা সেরে ডি·আই অফিসে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আজ আর অত সময় নেই হাতে। গোক্ষুর আসবে রাতে। যে করেই হোক সন্ধ্যেয় সন্ধ্যেয় পৌঁছুতে হবে বাড়িতে।

সন্ধ্যের মুখে নারাণগড়ে নামলে সচরাচর বাড়ির দিকে পা বাড়ায় না বাণেশ্বর। ঝুঁকি নেয় না। থেকে যায় শশিকান্তর বাসায়। আজ কিন্তু তার কোনও উপায় নেই যে কোনও গতিকে ফিরতে হবে মেট্যাল। বহু কষ্টে রাজি করানো গেছে গোক্ষুরকে। রাতে এসে যদি না পায় বাণেশ্বরকে, বিশ্বাসটাই টলে যাবে ওর। বিগড়ে যাবে সব দিনের মত। পার্টি-অফিস, ডি-আই অফিস, দু'টোতে কিছুতেই সময় হবে না আজ। বাণেশ্বর সাত-পাঁচ ভেবে দৌড় মারলো ডি-আই অফিসের দিকে।

ফেরার বেলায় চপলার ব্যাপারে শুভখবরটা যদি জেনে যেতে পারে···। নাহ্। দিনখানা শুরু হয়েছিল বিভৎসভাবে, কেলেঘাইয়ের পাড়ে। এখন মনে হচ্ছে, বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যাপার ঘটবে। সকাল থেকেই শুধু চমক খাওয়াই শুরু হয়েছে!

এ-আই কালোবরণবাবু এমন ভাব করলেন, যেন বাণেশ্বরের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন ওকে। বাণেশ্বর ঢোকা মাত্রই ড্রয়ার টেনে বের করলেন এক তাড়া কাগজ। নাটকীয়ভাবে এগিয়ে দিলেন বাণেশ্বরের দিকে।

প্রবল উত্তেজনায় বাণেশ্বর চোখ বোলায় কাগজগুলোর ওপর। ধীরে ধীরে চোখ-মুখ বদলে যেতে থাকে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে। কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

প্যানেলের বিরুদ্ধে ইনজাংশন অর্ডার বের করেছে প্রণব। হাইকোর্টের ইনজাংশন।

বাণেশ্বর নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কালোবরণবাবুর দিকে। গলা দিয়ে রা' বেরোয় না।

॥ উনত্রিশ ॥

ঘুরঘুট্টি আঁধারে বাণেশ্বর ঘোষের বেড়ার আগড় খুললো গোক্ষুর। রাত তখন অনেক। গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেছে বাণেশ্বরের ঘর-দোর, উঠোন। অবিরাম হিম ঝরছে আকাশ থেকে। নিঃশব্দে উঠোনে পা দিল সে।

চারপাশ শুনশান। অষ্টমীর চাঁদ ডুবে গেছে খানিক আগে। গাছে গাছে শয়ে শয়ে জোনাকি জ্বলছে দপদপিয়ে।

উঠোনের মধ্যিখানে এসে চুপটি করে দাঁড়ালো গোক্ষুর। কালবোস মাছের মত শরীরখানা মিশে গিয়েছে আঁধারে। ডান দিকে গোয়াল ঘর। বাঁ দিকে কালী মন্দির। মধ্যিখানে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বাণেশ্বর ঘোষের বাড়ি। কোথাও আলোর ছিটে-ফোঁটা নেই। ঘোষদা কি ঘুমিয়ে পড়লো? কিন্তু তেমন তো কথা ছিল না। ঘোষদা বার বার বলেছে, 'যত রাইত হউ, তুই আইসবি। মুই জাগিয়া রইবো।' আসতে কি ভীষণ দেরি করে ফেলেছে গোক্ষুর? হতে পারে। আজ রাতে কোটালচকের শ্যাম ঠাকুরের বাড়িতে মিটিং ছিল। শেষ হতে রাত হল। মিটিং-এর পরও খানিক আটকে রাখলো নিতাই মাস্টার। গল্প-গাছা করলো। গোক্ষুরের মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। যতই অভিমান জমুক মনে, লোকটির সামনে উপস্থিত হলে সব রাগ-রোষ উবে যায় কপূ্রের মত!

সন্ধ্যেবেলা ঘর থেকে বেরোবার সময় বলে এসেছিল পঞ্চমীকে, বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে যাওয়ার আগে একটিবার ঘরে ফিরবে। পঞ্চমী বলেছিল, 'ঘোষের দোরে কাজ সারতে অনেক রাত হয়্যাবে। ঘরে আইসিয়া চাট্টি খায়া যায়ো।'

দেরি হয়ে যাওয়ায় ঘরে ফেরার সময় হলো না। পঞ্চমী নিশ্চয়ই জেগে বসে রয়েছে আশায় আশায়। গোক্ষুর না ফেরা অবধি সে খাবেও না, ঘুমোবেও না। জলদি কাজটা সেরে ফিরতে হবে ঘরে। একলাটি আছে পঞ্চমী। এখন তার রাতের বেলায় একলাটি থাকা ঠিক নয়। অথচ রাতের মধ্যে ফিরে আসবে বলে হারি পিসিকেও থাকতে বলেনি পঞ্চমীর কাছে।

বাদুড়ের ডানার মতো কালো রাত। উত্তুরে হাওয়া বইছে হু-হু করে। গায়ের ছেঁড়া চাদরখানা দিয়ে উদোম জায়গাগুলো ঢাকবার চেষ্টা করলো গোক্ষুর। মাথা-কান বরাবর কালো গামছাখানি পেঁচিয়ে বেঁধেছে। এই প্রবল শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে সে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছে। কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। এত রাতে লোকটার ঘুম ভাঙাবে? নাকি কাল রাতে ফের আসবে? কিন্তু আশ্রয় হারাতে বসা মানুষের মন, সে দেয় অন্য শলা। বলে, শুভ কাজে দেরি নয় বাপ। সকালে ঘোষের মনটা কোনও কারণে নরম ছিল হয়তো। ভয়ও

পেয়েছিল মনে মনে। সব মিলিয়ে বলে ফেলেছে, দলিল ফেরত দেবে। মাটিটুকু নরম থাকতে থাকতে যেটুকু চাষ করার, করে নেওয়া দরকার। মাটি একটিবার আঁটিয়া গেলে, হালের ফাল আর ঢুকবে নি জমিনে। আজ বলেছে, দুবো। কাল মতি পালটে যেতে পারে। যা করবার আজই কর্। কাল হলো মহাকাল! কাল কাল করিয়া রাবণ রাজা স্বর্গের সিঁড়িটা বাঁধতে পাল্লো নি।

ভাবতে ভাবতে দু'পা এগোলো গোক্ষুর। সহসা অন্ধকার ফুঁড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করে ছুটে এলো এক দশাসই কালো কুকুর। ভীষণ হকচকিয়ে গেল গোক্ষুর। ভয়ের চেয়ে বিস্ময় অধিক। এক কালের পাকা চোর সে। কুকুরকে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয়, সেটা তার নখদর্পণে। কিন্তু গোক্ষুর কুকুরটাকে দেখে অবাক মানে। বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে কুকুর! রোজ শেষ রাতে যার বাড়িতে মাল নিয়ে কারিগর ঢোকে, টোকা মারে দরজায়, সে কিনা পুষবে কুকুর! দুনিয়াকে জানানোর জন্যে যে, বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে রোজ শেষ রাতে লোক আসে!

কালো কুকুরটা অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে গরগর করছিল। বেড়া থেকে একটা কঞ্চি টেনে নিতেই দু'পা পিছিয়ে গেল।

কুকুরটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে থাকে গোক্ষুর। এ তল্লাটের সব কুকুরকেই সে চেনে। সবাইয়ের মেজাজ-মর্জির সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। দেখতে দেখতে এক সময় কুকুরটাকে চিনতে পারে গোক্ষুর। এটা সেই রামেশ্বর ঘোষের কুকুরটা নয়? ওটাই তো। রামেশ্বর ঘোষ মরবার পর, কিছুদিন ওর ভিটে জেগে পড়েছিল। তারপর গেল নিশি কামারের বাড়িতে। ইদানিং আবার বাণেশ্বর ঘোষের দুয়োরে থানা গেড়েছে নাকি?

কঞ্চি দিয়ে বার দুই সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলতেই তফাতে সরে গেল কুকুরটা। গোক্ষুর চাপা গলায় ডাকলো, 'ঘোষদা— ।'

কোনও সাড়া শব্দ নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে সবাই। শীতের রাতের আরামের ঘুম। নরম লেপের তলার ওম। তা বাদে, দরজা-জানলা আঁটা রয়েছে পুরো। অন্দর থেকে ডাকখানা পৌঁছুলে হয়! দু'পা এগিয়ে ফের ডাক পাড়ে গোক্ষুর, 'ঘোষদা হে— ।'

'কে— ?' দোতলা থেকে ঘুম জড়ানো গলায় বলে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ।

বাণেশ্বর ঘোষ কি ইদানিং দোতলায় শোয় নাকি? শুতেও পারে। মাঝে মাঝেই তো বলতো, 'সারা সংসার উঠিয়া যায় দোতলায়। মুই একলাটি যমের দক্ষিণ দুয়ার জাগিয়া পড়িয়া থাকি। কি করবো, বল্? শেষ রাতে সারা বাড়ির লোককে উজাগর করিয়া পাঁচটা কপাট খুলিয়া মাল লিআ বড় দিগদারির কাজ।' ইদানিং তো ঘোষের সে ব্যাপারটি নেই। শেষরাতে মাল আসা তো বন্ধ। কাজেই, কি দরকার একতলায় শোওয়ার! কখন কি হয়, কে বলতে পারে? জীবনে বহু মানুষের চোখের জল ফেলিয়েছে বাণেশ্বর ঘোষ। তাদের অধিকাংশ এখন নিতাই মাস্টারের পার্টিতে ঢুকেছে। কার

মনে কি আছে, কে কিভাবে শোধ তুলতে চায়, ভগবানকে মালুম। দোতলায় উঠে গিয়ে ভালোই করেছে ঘোষদা।

'কে ডাকে— ?' দোতলা থেকে ফের শুধোয় বাণেশ্বর ঘোষ।

'মুই রে। গোক্ষুর। গোক্ষুর ভক্তা।'

সহসা দোতলা থেকে ঝাঁ করে ছুটে আসে এক ঝলক টর্চের আলো। গাঢ় অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে পর মুহূর্তে 'গুড়ুম, গুড়ুম,' আওয়াজ ওঠে বন্দুকের। পর পর পর চারটা। গোক্ষুর একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মাঝ উঠোনে। হিমে ভেজা সবুজ ঘাসের মধ্যে একটা ছোট পোকার মত ছটফটিয়ে স্থির হয়ে যায়।

বাড়ির সব দরজা খোলা রাখা ছিল। তরতরিয়ে একতলায় নেমে আসে বাণেশ্বর ঘোষ এবং চপলাকান্ত। দু'জনের হাতেই তীর-ধনুক।

দু'জনে দাঁড়ায় গোক্ষুরের পাশটিতে। তারপর সাঁই-সাঁই করে তীর চালাতে থাকে দোতলার বারান্দা নিশানা করে। ডজন খানেক তীর গিয়ে গেঁথে যায় দোতলার বিভিন্ন জায়গায়।

ধনুক-জোড়াকে গোক্ষুরের পাশে ফেলে দিয়ে তড়িৎ গতিতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ওরা। পটাপট লাগিয়ে দেয় দরজাগুলোর খিল। দোতলায় উঠে গিয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে। ডাকাত, ডাকাত—! দৌড়িয়া আইস হে,—। প্রাণে মারিয়া ফেলল—।'

পাড়া-পড়শী ছুটে আসে দলে দলে। বাণেশ্বর ঘোষের দেওয়ালখানা তখন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের শরীর।

প্রচণ্ড ত্রাসে চেঁচাচ্ছিল বাণেশ্বর ঘোষ, বিরাট দল। বহুত লোক। চোট্টে মারিয়া ফেলত হে—। তুমরা না আইসিয়া পড়লে— !

বন্দুকের আওয়াজ আর হৈ-হল্লা শুনে ছুটে এসেছে ডিহিপারের মানুষ-জন। আসতে ওরা বাধ্য। নইলে বাবুদের সব সন্দেহ পড়বে ওদেরই ওপর। 'ডিহিপার লধরাপাড়ার কে কে আইসে নি, দ্যাখ ত' বলে নিমেষের মধ্যে সম্ভাব্য অপরাধীদের লিস্টি বানিয়ে ফেলবে বাবু-ভায়ার দল !

ভীড়ের মধ্যে ছিল মধু মল্লিক, মকর ভক্তা, ন্যাকা-সুধীর, পবন কোটাল, আরো অনেকে। থির-পলকে দেখছিল ভূমিশয্যায় লুটিয়ে থাকা গোক্ষুরকে। সারা শরীর রক্ত-কাদায় একাকার। মোচড় দিয়ে ওঠা বুকগুলোর মধ্যে তীব্র বিস্ময়ও। এতরাতে কেন এসেছিল গোক্ষুর, বাণেশ্বর ঘোষের উঠোনে ? বাণেশ্বর ঘোষের সঙ্গে ত' তার ইদানিং আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ! তবে ?

দেখেশুনে থ' হয়ে গিয়েছে চিকন-বাবুর দল। ওপরওয়ালাকে লক্ষবার সাধুবাদ জানায় ওরা।

বলে, দোনলা বন্দুকটা ভাগ্যে ছিল ! তাই, বড্ড বাঁচা বাঁচিয়া গ্যাছে ঘোষের পো। ললাটে মরণ লিখা নাই ক', লচেত অর কুনো বাপ ঠেকিয়া রাখতে পারতো নি সেটা।

'তবে যে শুনেছিলি, চুরি-চামারি ছাড়িয়া দিছে গোক্ষুর ভক্তা ?'

'হুহু! তুম্মো যমন! লধুা ছাড়বে চুরি!'

'কুনোদিন শুনবো, বিল্লি ছাড়িয়া দিছে মাছ।'

লধুাদের চরিত্র বিশ্লেষণে মশগুল হয়ে যায় বাবু-ভায়ার দল। শুনতে থাকে মধু মল্লিকরা। নিঃশব্দে পুড়তে থাকে কানের লতি। কিন্তু এখন বাবুদের খোশগল্প শোনার সময় নেই এদের। অনেক কাজ। নিতাই মাস্টার আর শ্যাম ঠাকুরকে এক্ষুণি খবরটা দেওয়া দরকার। মধু মল্লিক ন্যাকা-সুধীরকে ইঙ্গিতে বোঝায় ব্যাপার খানা! ন্যাকা-সুধীর নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যায় গাঢ় অন্ধকারে।

সহসা সবুজ ঘাসের ওপর নড়ে উঠল পোকাটা।

অস্পষ্ট শব্দে গোঙাতে লাগল গোক্ষুর।

চমকে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ। শালা বাঁচিয়া আছে! চমকে ওঠে চপলাকান্ত, সুদেব মিদ্যা, কুলদা ডাক্তার। শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায় মধু মল্লিকের। টান টান হয়ে ওঠে লোধাপাড়ার প্রত্যেকটি মানুষ। বেঁচে আছে, গোক্ষুর তবে বেঁচে আছে! এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায় মানুষটা!

কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশের উপায় নেই লোধাদের। ডাকাতি করতে এসে গুলি খেয়েছে যে ডাকাত, তার পক্ষে সওয়াল করার বিপদ ঢের। সঙ্গে সঙ্গে ডাইরীতে নাম উঠে যাবে তার। টানা-হেঁচড়া করবে পুলিশ। লতি-লাঞ্ছনার একশেষ। কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে কেবল নির্বাক দেখে যেতে হবে সব কিছু। দেখে যেতে হয়। এটাই চিরকালের নিয়ম। অলিখিত বিধি।

আজ কিন্তু বিধি ভাঙল মধু মল্লিক। দু'পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো জমায়েতের সামনে। বললো, 'লোকটা বাঁচিয়া আছে। এক্ষুণি হাসপাতালে লিয়া গেলে বাঁচিয়াবে।'

একটা মৃদু সমর্থক সূচক গুঞ্জন ওঠে। শুধু লোধাদের দিক থেকে নয়, মেট্যাল গাঁয়ের জমায়েতের একাংশও আকারে ইঙ্গিতে সায় দেয়।

সাধারণের প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করে বাণেশ্বর ঘোষ। বিচলিত বোধ করে পলকের তরে। পরমুহূর্তে সামলে উঠে বাঘের ঝাপট নেয় সে।

'থাম হে।' প্রস্তাবটাকে একেবারে ডগায় মুচড়ে দেবার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠে বাণেশ্বর ঘোষ, 'ডাকাতি-রাহাজানির কেস, পড়ধান আইল নি, পুলিশ আইল নি, কে অকে লিয়াবে হাসপাতাল?'

'কিন্তু পুলিশ কখন আইসবে তার ঠিক কি?' খুব বিনীত ভাবে মধু মল্লিক বলে।

'সুভাষ সংঘের ছেইলাদের লিয়া গণেশ মিদ্যা রওনা হয়্যা গেছে। পড়ধানকে খবর দিয়া অরা থানায় যাবে।' বলে চপলাকান্ত।

বাণেশ্বর বলে, 'ভোরের মধ্যে আইসিয়া যাবে পুলিশ। তার আগে আসামীকে ছুঁয়াও যাবে নি। যে ছুঁবে, তার নিজের দায়িত্বে ছুঁবে।'

ভোরের মধ্যে! বিড় বিড় করতে থাকে মধু মল্লিক। ভোর হতে আর

কত বাকি ! কত রাত এখন ! আর কতখানি রাত খুয়ার হলে ভোর হবে ? অতক্ষণ কি প্রাণ থাকবে গোক্ষুর ভক্তার শরীরে !

হিমে ওষে ধরিত্রী তখন বরফের মত শীতল ! তার ওপর প্রবল আক্ষেপে লুটোপুটি খাচ্ছে গোক্ষুর । গ্যাঁজলা উঠছে মুখে । প্রবল শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে । কাঁপুনির চোটে বেঁকে যাচ্ছে সর্ব শরীর । প্রবল মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে চোখের অস্থির মণি জোড়া খুঁজছে বুঝি কাউকে ।

নিষ্পলক দেখছে ওকে মধু মল্লিকের দল । জোড়ায় জোড়ায় চোখের মণি দিয়েই বুঝি বেষ্টন করে রাখতে চায় আহত শরীরখানিকে । যেন ঐ দৃষ্টি-খাঁচা ভেঙে কোনও গতিকে বেরিয়ে যেতে না পারে গোক্ষুরের প্রাণ-পাখিটি । যতক্ষণ না রাত ঘোচে, ভোর হয় ।

রাত বাড়ছে । হিম ঝরছে । হু-হু করে বইছে উত্তুরে হাওয়া । পাতা খসানোর শব্দ । পাতা ঝরছে শীতের রাতে । নিঃসঙ্গ পাতা ঝরছে । সবুজ ঘাসের ওপর ছটফট করছে পোকাটা ।

রাত বাড়ছে । অর্থাৎ রাত কমছে । পাতা ঝরছে । নিষ্পলক ক্ষণ গুণছে মধু মল্লিকের দল । রাত ফুরোলেই হাসপাতালে যাবে গোক্ষুর ভক্তা ।